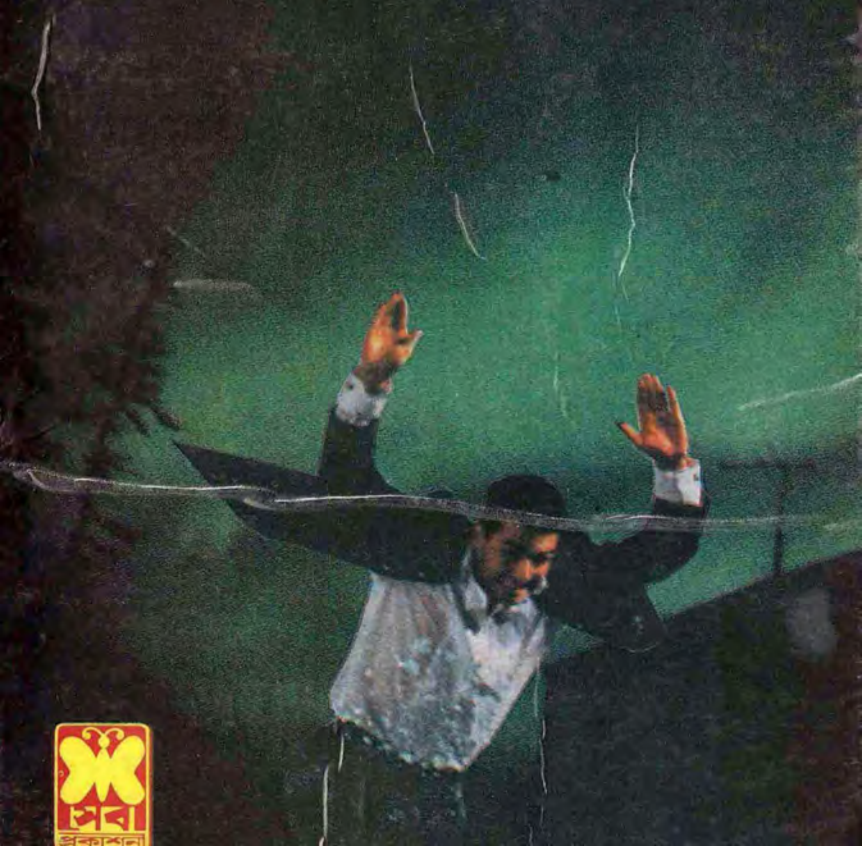
মাসুদ রানা

বিষ নিঃশ্বাস

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

বিষ নিঃশ্বাস-১

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

এক

গ্লাসের সাথে বোতলের মৃদু ঠোকাঠুকি। চাপা গুঞ্জন। হঠাৎ একটু জোরে 'ওহ্ ডিয়ার', 'ফর গডস্ সেক', বা 'যাহ্ দুষ্টু'। চুড়ির টুং টাং। শিফনের কোমল খসখস। রিনিঝিনি হাসি। খুট্ করে লাইটার জ্বালার শব্দ। বয়-বেয়ারাদের দ্রুত পদচারণা। গিটারের সুরের তালে তাল মিলিয়ে টেবিলে আঙুল ঠুকে কে যেন তবলা বাজাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল সে। সামান্য উত্তেজিত গলায় কে যেন কাকে কি বোঝাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে রেস্তোরাঁটা।

সন্ধ্যা লেগেছে মাত্র। বাইরে নিয়ন বাতির আলোয় ঝলমল ঢাকা শহর।

মগবাজার। অভিজাত এক রেস্তোরাঁ। ভেতরের আকৃতি ডিমের মত গোল। দেয়ালে লাল আর হলুদ রঙের নকশা। নকশার ফাঁকে ফাঁকে কাঠের ওপর খোদাই করা নগ্ন নারী-পুরুষের যুগল-মূর্তি।

ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। খুলে গেছে দরজা।

দৃঢ় পায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকল যুবক। দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী, সতর্ক দৃষ্টি। ধীরে ধীরে উঠে এসে কোমরে ঠেকল আস্তিন গুটানো দুই হাত।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে লোকজন। চমকে উঠে স্থির হয়ে যাচ্ছে। চোখ-ইশারায় বা বুড়ো আঙুল একটু বাঁকা করে যুবকের দিকে সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে নিঃশব্দে। প্রায় সবাই চুপ করে গেছে, চাপা গলায় ফিসফাস করছে দু'একজন। কেউ সরাসরি, কেউ আড়চোখে, কেউ কোন এক ফাঁকে চট্ করে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ডিউক। ঢাকার কুখ্যাত এক গুণ্ডা। নতুন মাস্তান। মগবাজার, ফার্মগেট আর মোহাম্মদপুর এলাকার রংবাজ। এই এলাকায় এমন কেউ নেই যে ডিউকের নাম শোনেনি বা ডিউকের নাম শুনে যার বুক কাঁপে না। কেউ জানে না কোত্থেকে হঠাৎ মাস তিনেক আগে উদয় হয়েছে সে, সেই থেকে প্রচণ্ড দাপট দেখিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে সবাইকে। তার আসল নাম কি, কেউ তা জানে না। এলাকার ছোকরা মাস্তানরা তার আধিপত্য মেনে নিয়ে ওর নাম দিয়েছে ডিউক। সেই নামটাই চালু হয়ে গেছে। যারা তাকে ভালভাবে চেনে, তারা তাকে ভয়, ঈর্ষা অথবা অবিশ্বাস করে।

ঈর্ষার কারণ ওর প্রচণ্ড শক্তি। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। মেদহীন সুঠাম শরীর। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু, সটান। কিন্তু যখন হাঁটে, সামান্য একটু ঝুঁকে থাকে সামনের

দিকে, একটু বাঁকা হয়ে থাকে হাত দুটো, যেন আক্রমণ প্রতিহত বা অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে আছে। চেহারা দেখে বয়স বোঝা যায় না, মনে হয় বিশও হতে পারে, আবার আটাশ হওয়াও বিচিত্র নয়।

ভয়ের কারণ ওর দুর্দান্ত সাহস। যত বড় ঝুঁকিই থাক, যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আশ্চর্য বেপরোয়া একটা প্রবণতা রয়েছে ডিউকের মধ্যে। ওর মধ্যে ভয়-ডর বলে কিছু নেই, সেটাই সবার ভয়ের কারণ। শত্রুপক্ষের যে কোন সংখ্যা বা শক্তিকে অকুতোভয়ে চ্যালেঞ্জ করে বসে ও; কারাতে, কুংফু, জুডো, আর দেশীয় ল্যাং মেরে চোখের পলকে ধরাশায়ী করে সবাইকে। পনেরো গজ দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে একজন লোকের মাথার চুল দু'ভাগ বা একটা পেন্সিলকে দু'ফাঁক করতে পারে। নিমেষের মধ্যে এক ঝটকায় পকেট থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে গুলি করতে পারে, লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। ঢাকার নাম-করা গুণ্ডা আর মাস্তানরা প্রথমে ওর অস্তিত্ব এবং দাপট গ্রাহ্যই করেনি। কিন্তু ডিউকের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, যখন পা পড়ল নিজেদের লেজে, সবাই একজোট হয়ে তার পিছু লাগল ওরা। মোহাম্মদপুর, ফার্মগেট আর মগবাজার এলাকায় দারুণ উত্তেজনা চলল কদিন ধরে। ডিউকের সাথে মেলামেশা করতে দেখা গেছে এমন কিছু যুবক নিজেদের এলাকা ছেড়ে কোথাও গেলেই বেদম মারধোর খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে শুরু করল। কিন্তু ডিউকের সন্ধান নেই কোথাও। সবাই ধরে নিল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে সে এলাকা ছেড়ে। দু'দিন পর এক ভোর বেলা সমস্ত উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিল ডিউক। ছোট বড় আঠারো জন গুণ্ডা আর রংবাজ টাইপের ছোকরা ঠিকানাবিহীন চিঠি বা অজ্ঞাতনামার টেলিফোন পেল। প্রতিটি চিঠি এবং টেলিফোন কলের বক্তব্য একই ধরনের, শেষবারের মত সবাইকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, ডিউকের বিরুদ্ধে কেউ যদি একটা আঙুলও তোলে, ঝাড়-বংশসুদ্ধ নিপাত করে দেয়া হবে তাকে।

কিন্তু ওরা বোধহয় এই হুমকি গায়ে মাখত না, যদি না সেই ভোর বেলা সব ক'টা গুণ্ডা আর রংবাজের বাড়িতে একটা করে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হত। একই দিনে, একই সময় শহরের বিশেষ কয়েকটা এলাকার সমস্ত কুখ্যাত গুণ্ডার সুরক্ষিত বাড়িতে এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সবার মনে ত্রাস এবং বিস্ময় সৃষ্টি করল। শুধু তাই নয়, এরপর ডিউকের বিরুদ্ধে আর কেউ একটা আঙুল না তুললেও নামকরা কিছু গুণ্ডাকে রাস্তায় যখন যাকে যেখানে পেল ধরেই কষে ধোলাই দিয়ে দিল সে। অবশেষে সবাই একজোট হলো আবার। এবং একদিন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারা মিলিত হলো ডিউকের সাথে। মৌখিক শান্তিচুক্তি হয়ে গেল ওদের মধ্যে। ঠিক হলো, ডিউকের ব্যাপারে তারা কেউ মাথা ঘামাবে না। বিনিময়ে তারা যদি কোন বিপদে পড়ে ডিউক তাদেরকে সাহায্য করবে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, ওকে একবার দেখলে হয়, রাস্তার উল্টোদিকে সরে যায় তারা। এরা সবাই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দূর থেকে।

অবিশ্বাস করার কারণ ওর নীতি। ঢাকায় এমন লোকের অভাব নেই যারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে, মারধর করে বা বেআইনী পন্থায় নিজেদের স্বার্থ এবং লোভ

চরিতার্থ করতে আগ্রহী। অথচ এসব কাজ করার ঝুঁকি তারা নিজেরা নিতে চায় না। এরাই নগদ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে ডিউককে। যে-কোন প্রস্তাবে রাজী হয় সে, কিন্তু সব সময় একটা শর্ত দেয়— 'অর্ধেক টাকা এখুনি দিতে হবে, বাকিটা কাজ শেষ হলে।' প্রায় সময়ই দেখা যায়, অর্ধেক টাকা হাতে নিয়েই কাজটার কথা বেমালুম ভুলে গেছে ডিউক। কেউ প্রশ্ন তুললে বা তাগাদা দিলে বলে, 'যাও, কোর্টে গিয়ে আমার নামে কেস করো,' কথাটা বলে তাদের মুখের ওপর হাসে সে। কিন্তু কার এমন বুকের পাটা যে ওর বিরুদ্ধে কেস করবে? তাছাড়া, কাজগুলো বে-আইনী, কোর্টে যাবার উপায় থাকে না।

অবিশ্বাসীর সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। ভুক্তভোগীরা তাদের ঠকার কাহিনী স্রেফ চেপে যায়, ভয়ে দু'কান হতে দেয় না। কাজেই নিত্য নতুন প্রস্তাব পায় ডিউক, অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স নেয়, এবং কাজে হাত না দিয়ে সময়টা কাটায় হোটেলে-রেস্তোরাঁ আর বিভিন্ন ক্লাবে। এ ব্যাপারে নীতির কোন বালাই নেই তার।

ধূমকেতুর মত হঠাৎ আগমন তার। গত তিন মাস ধরে চোর, ডাকাত, জুয়াড়ী, গুণ্ডা আর নির্দয় খুনীদের দুনিয়ায় বসবাস করছে সে। দু'হাতে টাকা কামায়, খরচও করে তেমনি। টাকায় যতক্ষণ ফুলে থাকে মানিব্যাগ ততক্ষণ কাজের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে না সে, ফোলাটা কমে এলেই চোখ-কান খুলে দেয় কাজের সন্ধানে। ওর সম্পর্কে হাজারটা গল্প-গুজব ছড়িয়ে আছে ঢাকা শহরে। কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে বলা মুশকিল। কেউ বলে, মস্ত ধনী লোকের একমাত্র সন্তান সে, সঙ্গদোষে বখে গেছে। কেউ বলে, একেবারে সুবোধ, লক্ষ্মী ছেলে ছিল, কিন্তু প্রেমে ছ্যাক্ খেয়ে পাগলা কুকুর হয়ে গেছে।

দৃঢ় পায়ে এগোচ্ছে ডিউক। কারও দিকে তাকানো তার স্বভাব নয়। এক কোণে, প্রায় অন্ধকার একটা টেবিলে গিয়ে বসল। কাঁচ ঘেরা অফিসরুম থেকে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রেস্তোরাঁর ম্যানেজার। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে তার, চিন্তিত দেখাচ্ছে। সাক্ষাৎ যম ঢুকেছে তার রেস্তোরাঁয়, কার ঘাড় মটকাবে কে জানে। তার কানে এসেছে, হাতে কাজ নেই, ডিউকের এখন অভাব যাচ্ছে। কি মনে করে এসেছে আজ কে জানে, হয়তো টাকা ধার চাওয়ার মতলব। ওকে টাকা ধার দিলে ফেরত পাবার আশা ছাড়াই দিতে হবে, আবার না দিলেও বিপদ। রেস্তোরাঁ ম্যানেজারের অনুমান মিথ্যে নয়। টাকার সন্ধানেই এখানে এসেছে আজ ডিউক। আজ প্রায় তিন চার দিন ধরে হাতে কোন কাজ নেই, মানিব্যাগ প্রায় খালি হয়ে এসেছে। একশো টাকার কয়েকটা নোট মাত্র সম্বল এখন। অর্ডার নেবার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। 'একটা লার্জ হুইস্কি,' বলল সে। দরজা দিয়ে একটা মেয়েকে ঢুকতে দেখে ওয়েটারকে ডেকে আবার বলল, 'আর একটা কোক।'

ভিড় ঠেলে সোজা এগিয়ে আসছে মেয়েটা। দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখতে পেয়েছে ডিউককে। খুশির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার মুখ। ওর নাম কানিজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কিন্তু সেটাই ওর একমাত্র পরিচয় নয়। না জেনে

না বুঝে বিরাট ধনী লোকের এক লোফার ছেলেকে বিয়ে করেছিল ও, তিনমাস ওকে নিয়ে ঘর-সংসার করার পর তালাক দিয়ে কেটে পড়েছে সে। একটা কন্যা-সন্তান প্রসব করে কানিজ, তার বয়স এখন চার, একটা বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হচ্ছে সে। সারা দিন ক্লাস আর পড়াশোনা করে কানিজ, আর সন্ধ্যার পর খদ্দের খুঁজে বেড়ায়। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, বাপ-মার আদর পেয়ে মানুষ হয়েছে, কোন শখ-সাধ কখনও অপূর্ণ থাকেনি। ঘর ছেড়ে আসার পরও শখ-সাধ মেটাবার চাহিদা রয়ে গেছে কানিজের। সেজন্যে প্রচুর টাকার দরকার হয়। তাছাড়া, নিজের আর মেয়েটার খরচ চালাবার জন্যে কম টাকা লাগে না। প্রথম দিকে চাকরি-বাকরী করার চেষ্টা করে দেখেছে সে, কিন্তু খাপ খাওয়াতে পারেনি নিজেকে। চাকরি যারা দেয় তারা মনে করে ওর রূপযৌবনের ওপর তাদের অবাধ অধিকার জন্মে গেছে, ওর অনুমতি বা ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে না তারা, দু'দিন যেতে না যেতে হাত বাড়িয়ে দেয় অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে। এই একই অভিজ্ঞতা সব জায়গায় হয়েছে কানিজের। তাই চাকরি করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে সে। তার চেয়ে এই বরং ভাল, স্বাধীন ব্যবসা। সেই যখন দিতেই হবে শরীর, টাকার বিনিময়ে দেয়াই বুদ্ধিমতীর কাজ। অন্তত কানিজ তাই মনে করে।

বছর চব্বিশ বয়স কানিজের। অপূর্ব না হলেও, সুন্দরী বলা যায় তাকে। শরীরের বাঁধনটা ভাল। টাকার খুব দরকার না পড়লে যাকে তাকে খদ্দের হিসেবে নেয় না। আজ খুব অভাবে পড়েই নিজেদের পাড়ার এই রেস্তোরাঁয় খদ্দের ধরার জন্যে এসেছে সে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, ভাবছে সে, দেখা হয়ে গেল ডিউকের সাথে। খদ্দের না হলেও, ওর কাছে টাকা ধার চেয়ে কখনও খালি হাতে ফিরতে হয়নি তাকে।

একই পাড়ায় থাকে ওরা। কিন্তু মাস দুয়েক আগেও ডিউককে যমের মত ভয় করত কানিজ। ওর সামনে পড়ে যাবার ভয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ভাল করে দেখে নিত রাস্তাটা। সচেতনভাবে এড়িয়ে চলছিল বলে ডিউকের সামনে কোনদিন পড়তে হয়নি তাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

কানিজের মেয়ের নাম পপি। বাড়িতে তাকে দেখতে না পেয়ে সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় উঁকি দিল কানিজ, অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। রাস্তার উল্টোদিকে ছোট একটা মণিহারী দোকান, সেই দোকানের সামনে রাস্তার ওপর উবু হয়ে বসে রয়েছে ডিউক, দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে পপিকে। চার বছরের এই কচি মেয়েটা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই কানিজের। তাকে ডিউকের মত একজন কুখ্যাত পাষণ্ডের হাতে দেখতে পেয়ে মুহূর্তে উন্মাদিনীর মত হয়ে উঠল সে। সন্তানের অমঙ্গল কল্পনা করে কাল বৈশাখী ঝড়ের মত ছুটে এল।

মাকে দেখতে পেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল পপি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডিউক। কানিজকে দেখে মৃদু হাসল সে-ও। ইতিমধ্যে রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছে কানিজ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি বলবে, কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

প্লাস্টিকের কাঠির মাথায় আটকানো লজেন্স বায়োনিক উওম্যান চুষছে পপি, দুই হাতের মুঠোয় রয়েছে আরও ডজন খানেক সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান। পপির

মাথায় একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ডিউক। জানতে চাইল, 'আপনার মেয়ে বুঝি? খুব বুদ্ধিমতী। বাড়িতে না রেখে কোন বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো পারেন।' তার শেষ কথাটার মধ্যে শুভানুধ্যায়ীর প্রচ্ছন্ন একটা পরামর্শ ছিল।

'আচ্ছা, তাই দেব,' ভয়ে ভয়ে বলল কানিজ। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নিল মেয়েকে। 'আসি, কেমন?' বলে আর দাঁড়ায়নি সে, এক রকম ছুটেই রাস্তা পেরিয়ে বাড়িতে পালিয়ে এসেছিল।

এরপর রাস্তায় দেখা হলেই হাসিমুখে কথা বলত ডিউক। কানিজ ভেবেছিল, ডিউকের বোধহয় বিনি পয়সার খদ্দের হবার মতলব। দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সে। ওর ওপর ডিউকের নজর পড়লে আর সব খদ্দেররা চম্পট দেবে ভয়ে। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর দেখা গেল কানিজের ওপর কোন লোভ নেই ডিউকের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কানিজ। সেই সাথে বুঝল, তার মেয়ের সাথে দারুণ ভাব এই গুণ্ডা লোকটার, গাঢ় বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। পপিকে সত্যি ভালবাসে ডিউক। নিজেই তাকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সময় পেলে মাঝে মধ্যে দেখেও আসে। এবং গত মাসে কানিজ পপির বেতন দিতে গিয়ে দেখে বেতনটা আগেই দিয়ে গেছে ডিউক। ক্রমশ সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওদের মধ্যে। কানিজ এখন জানে, আর যার সাথে যাই করুক, তার কোন ক্ষতি কখনও করবে না ডিউক। বাজে লোকের মধ্যেও এক আধটা ভাল গুণ থাকে না?—সেই রকম।

'কেমন আছ, ডিউক?' টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল কানিজ, যেন বসতে না বললে চলে যাবে। 'ব্যস্ত নাকি?'

'আরে না,' বলল ডিউক। 'বসো।' একটু ইতস্তত করল ও, তারপর জানতে চাইল, 'পপিকে দেখতে গিয়েছিলে?'

ধীরে ধীরে ডিউকের সামনের চেয়ারটায় বসল কানিজ। ছোট্ট করে বলল, 'না।'

'ব্যবসা মন্দা নাকি?'

লাল হয়ে উঠল কানিজের মুখ। কারও দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে, সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বলল, 'খুব ভাল কোনদিনই ছিল না।'

হুইস্কি আর কোক নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। বিল মিটিয়ে দিল ডিউক। ওয়েটার চলে যেতে জানতে চাইল কানিজ, 'তোমার কি অবস্থা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিউক। 'চলে যাচ্ছে।' মানিব্যাগটা এখনও পকেটে ভরেনি ও। একশো টাকার একটা নোট বের করে কানিজের সামনে টেবিলের ওপর রাখল।

'এটা রাখো, পপিকে কিছু কিনে দিয়ো।'

'কিন্তু, ডিউক, তোমার মানিব্যাগ প্রায় খালি দেখলাম···'

'সব জায়গায় চোখ যায় কেন?' ধমকের সুরে বলল ডিউক, চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে ওর। 'যা বললাম, করবে। বেশি কথা চাই না।'

রেস্তোরাঁর এক কোণে ছোট্ট একটা স্টেজ, সেখানে পিয়ানো বাজাতে শুরু করল একজন। 'শুনছ,' ফিসফিস করে উঠে ডিউকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কানিজ। 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি, ডিউক। সাবধান, কেউ যেন দেখতে

না পায়!' ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল সে, ছোট্ট কি যেন মুঠোয় ভরে নিয়ে বের করে আনল হাতটা। তারপর টেবিলের নিচ দিয়ে বাড়িয়ে দিল ডিউকের দিকে। 'কি এটা?'

কানিজের হাত থেকে জিনিসটা নিল ডিউক। টেবিলটাকে আড়াল করে মুঠো খুলল। জিনিসটা সাদা পাথরের একটা টুকরো, ওপরের দিকটা সমতল। ভুরু কুঁচকে উঠল ডিউকের। তালুর ওপর উল্টো করে নিল সেটাকে। তারপর মুখ তুলে তাকাল কানিজের দিকে। 'তুমি এটা পেলে কোথায়?'

'পেয়েছি···মানে, কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'জিনিসটা কি?' চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল কানিজ। চোখ দুটো প্রত্যাশায় চকচক করছে তার,। 'খুব দামী কিছু?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা একটা জেড পাথর, সম্ভবত একজন ধনুর্বিদের বুড়ো আঙুলের আংটি।'

'কি বললে? একজন ধনুর্বিদের কি?'

'আংটি।' টেবিলটাকে আড়াল করে আরেকবার জিনিসটার দিকে তাকাল ডিউক। 'চীনারা এককালে তৈরি করত এগুলো। এটা বোধহয় নকল। ঠিক জানি না। নকল না হলে অনেক টাকা দাম হবে এটার।'

'কত?' চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কানিজের।

'জানি না। পাঁচ বা দশ হাজার। কি জানি। বেশিও হতে পারে।'

'তুমি ঠিক জানো ধনুর্বিদরা এই ধরনের আংটি ব্যবহার করে?'

'আজকাল ধনুকের ব্যবহার কোথায়?' বলল ডিউক। 'তবে বহু শতাব্দী আগে চীনারা ধনুকের ছিলা টানার জন্যে এটা ব্যবহার করত। নকল না হলে খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে তৈরি হয়েছে এটা।'

হতভম্ব হয়ে গেছে কানিজ, চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে আছে ডিউকের দিকে। 'খ্রীষ্টের জন্মের আগে?'

নিঃশব্দে হাসল ডিউক। 'অত উত্তেজিত হয়ো না। এটা নকল হবার সম্ভাবনাই বেশি। কোথায় পেয়েছ তা কিন্তু এখনও বলোনি।'

'পেয়েছি আমার ঘরে,' বলল কানিজ। 'বিছানার চাদরের নিচে ছিল। কেউ নিশ্চয়ই ফেলে গেছে।'

'ঝামেলা হতে পারে, কানিজ,' বলল ডিউক। 'জিনিসটা যদি আসল হয়, এর মালিক নিশ্চয় এতক্ষণে থানায় ডায়রী করেছে। তুমি কোন বিপদে পড়ো তা আমি চাই না। এটা বরং থানায় জমা দিয়ে এসো।'

ম্লান হয়ে গেল কানিজের চেহারা। বলল, 'যেই এর মালিক হোক, সে তো আর জানে না আমার কাছে আছে এটা।'

'কিন্তু তুমি বিক্রি করার চেষ্টা করলেই খবর পেয়ে যাবে সে।'

টেবিলের তলা দিয়ে আবার হাত বাড়াল কানিজ। তার হাতে আংটিটা তুলে দিল ডিউক।

'যার জিনিস তাকে যদি ফিরিয়ে দিই, সে আমাকে পুরস্কার দেবে বলে মনে করো?'

'দিতে পারে।'

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল কানিজ, তারপর এদিক ওদিক মাথা দোলাল। 'উঁহুঁ, এটা আমি হাতছাড়া করছি না। ওসব ফুর্তিবাজ লোকগুলোকে চেনা আছে আমার। পুরস্কার দেবে না আরও কিছু। দু'দশ টাকা হয়তো দেবে, কিন্তু বিনিময়ে আরেকবার চান্স লাগাবে আমার ওপর।'

বোধহয় তাই, ভাবল ডিউক। কিন্তু সে-কথা বলল না কানিজকে। 'আমার কথা যদি শোনো, থানায় জমা দিয়ে দাও। কেউ যদি খোঁজে, সহজেই এর সন্ধান বের করে ফেলবে।'

'তুমি এটা রাখতে চাও, ডিউক?' হঠাৎ জানতে চাইল কানিজ। 'ভাল খদ্দের পেলে বিক্রি করে আমাকে কিছু টাকা দিয়ো। পাঁচ-দশ হাজার দরকার নেই আমার, পঞ্চাশ একশো টাকা পেলেই আমি খুশি। তবে এ শুধু তোমার জন্যে। আর কেউ কিনতে চাইলে পাঁচশো টাকার কমে বেচব না।'

'আসল জিনিস হলে ওটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা, কিংবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে,' বলল ডিউক। 'না, কানিজ। এসব জিনিস নাড়াচাড়া করা আমার লাইনের মধ্যে পড়ে না। নকল না হলে, ওটা একটা আগুনের টুকরো। আর নকল হলে, ওটা নিয়ে ছুটোছুটি করাই সার, ঘামের দামও উঠবে না। উঁহুঁ।'

হতাশায় ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানিজ। ব্যাগের ভেতর রেখে দিল আংটিটা। তারপর হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে যেতে ডিউকের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'আচ্ছা, রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে দেখাব জিনিসটা? ভাল দাম দিলে...'

'মনে হয় না,' বলল ডিউক। 'লোকটাকে আইনের চাকর বলতে পারো। ওকে দেখালেই পুলিস ডাকবে ও।'

উঠে দাঁড়াল কানিজ। 'ভাগ্যিস তুমি বললে, তা না হলে আমার জানাই হত না যে এটা একটা জেড। এ-ধরনের জিনিস বড় একটা দেখা যায় না, তুমি চিনলে কিভাবে?'

'হয়তো কোন মিউজিয়ামে দেখেছি,' বলল ডিউক। 'শোনো, থানায় জমা দিয়ে তারপর অন্য কোথাও যাও। বাড়ির কথা বলো না, বলবে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছ।'

হেসে উঠল কানিজ। বলল, 'তুমি যে এত ভীতু, তা কিন্তু আমার জানা ছিল না।' সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। 'চলি, ডিউক। আবার দেখা হবে। গুড ঈভনিং।'

'গুড ঈভনিং।'

আর একটু রাত হতে রেস্তোরাঁ থেকে বিদায় নিল ডিউক। ওকে চলে যেতে দেখে মস্ত একটা স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রেস্তোরাঁ ম্যানেজার। যাক বাবা, বাঁচা গেল, ভাবছে সে, টাকা ধার চাইলে না দিয়ে উপায় ছিল না।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কানিজকে আবার দেখতে পেল ডিউক। রাস্তার একধারে, একটা লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে একজন লোকের সাথে কথা বলছে।

ওদের কাছাকাছি যাবার আগেই লোকটাকে সাথে নিয়ে এগোল কানিজ, বাঁক নিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। ওই গলিতেই কানিজের বাড়ি। দূর থেকে কানিজের হাসির শব্দ শুনতে পেল ডিউক। বোধ হয় খুব রসিক একজন খদ্দের বাগিয়েছে। লোকটার পরনে দামী স্যুট, হাতে খয়েরী রঙের একটা চামড়ার ব্যাগ। কিন্তু লোকটার মুখ দেখতে পেল না ডিউক। কানিজও দেখতে পায়নি ডিউককে।

নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ডিউক, তাই লোকটার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না। কিন্তু দিলেই বোধহয় ভাল করত।

দুই

মগবাজার। মেইন রোডের কাছাকাছি একসার গ্যারেজ। গ্যারেজের ওপর দুই কামরার ছোট একটা ফ্ল্যাট। কামরা দুটো অন্ধকার, দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে। জানালাগুলো লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু সেগুলো সচরাচর খোলে না ডিউক। কৌতূহলী মানুষের চোখের আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে ও। আধা-বয়েসী একটা ঠিকে ঝি রোজ একবার করে এসে ঘর-মোছা আর বাসন পেয়ালা ধোয়াধুয়ির কাজগুলো সেরে দিয়ে যায়। ফ্ল্যাটের সামনে লম্বা একটা বারান্দা, পাতলা তারের জাল দিয়ে ঘেরা সেটা। সিঁড়ির দু'পাশে উঁচু পাঁচিল, ওঠা নামার সময় কারও চোখে পড়তে হয় না। সিঁড়ির নিচে অত্যন্ত মজবুত একটা সদর দরজা, বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় সেটায় তালা দিয়ে গেলেও কারও কিছু বলার নেই। আর সব গ্যারেজের ওপরও এই রকম কিছু ফ্ল্যাট আছে, সেগুলো সব অফিস-ঘর হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পর এলাকাটা একেবারে ফাঁকা মুক্তাঙ্গন হয়ে যায়।

পরদিন সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল ডিউকের। লাফ দিয়ে নামল বিছানা থেকে। বাথরুমে ঢুকে গোসল সারল। খালি পেটে পোশাক পরছে। কেন যেন অস্বস্তিবোধ করছে ও, মনটা ভাল নেই। অন্যান্য দিন নিজেই চা নাস্তা তৈরি করে। ধৈর্যে কুলাচ্ছে না আজ। বাইরে কোথাও সেরে নেবে।

টাই-এর নট বাঁধছে, এই সময় সদর দরজায় নক হলো। এই সাত সকালে আবার কে এল! ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ডিউক। সদর দরজা খুলল।

এন.এস.আই-এর ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। রাশভারী চেহারা, বিরাট আকারের গম্ভীর মুখ, কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে লুকিয়ে রয়েছে কৌতুকের ঝিলিক। বরাবর যা হয়ে থাকে, আজও সিভিল ড্রেসে এসেছে ইন্সপেক্টর তোয়াব। 'গুড মর্নিং, ডিউক। আরেকটু দেরি করে এলে তোমাকে পেতাম না, তাই না? ভাগ্যটা ভাল আমার, এ যাত্রা বেঁচে গেল চাকরিটা।'

চেহারার সাথে স্বভাব বা প্রকৃতির কোন মিল নেই তোয়াব খানের। অত্যন্ত রসিক লোক, দেখেই মনে হয় এই মাত্র কোথাও থেকে ছুটি কাটিয়ে এল। ডিউকের

ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে সে। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কুখ্যাত লোকদের ওপর নজর রাখাই তো কাজ ওদের। তবে, আজ পর্যন্ত ডিউকের কোন দুর্বলতা ধরতে পারেনি সে। ডিউকের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন ইয়ত্তা নেই, কিন্তু সেগুলো প্রমাণ করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পুলিস, সি.আই. ডি., স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং এন.এস.আই—সবগুলো লেগে আছে ওর পেছনে, কিন্তু কেউ কোন সুবিধে করতে পারেনি।

ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের সাথে ডিউকের সম্পর্কটা মোটামুটি ভালই বলতে হবে। তোয়াব খান এমন একটা ভাব দেখায়, যেন ডিউকের শুভানুধ্যায়ী হবার খুব ইচ্ছে তার। পঞ্চাশের ওপর বয়স, ডিউকের বয়েসী ছেলেমেয়ের বাবা, বোধহয় সেজন্যেই বিনা পয়সায় কিছু উপদেশও খয়রাত করে। ডিউক এসব পছন্দও করে না, সহ্যও করে না। তোয়াব খানের কথার উত্তর সাধারণত কঠিন ভাষাতেই দিয়ে থাকে ও, আজ কিন্তু সতর্ক হয়ে গেল ডিউক। ইন্সপেক্টরের পেছনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরাও সিভিল ড্রেসে। কিন্তু দেখেই চিনে ফেলেছে ডিউক। একজন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর, আরেকজন কনস্টেবল।

'এই সকালে কি মনে করে?'

'ব্রেকফাস্ট খেয়েছ?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর তোয়াব। 'এক কাপ চা খেতে এলাম তোমার কাছে।'

চিবুক নেড়ে ইন্সপেক্টরের পেছনে দাঁড়ানো পুলিসের লোক দু'জনকে দেখাল ডিউক। 'ওরা কেন?'

'ওরা চা খায় না,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল তোয়াব খান। 'তাছাড়া, আসার পথে ওদেরকে আমি বলেছি, তোমার ঘরে একটা মাত্র চেয়ার, তিনজনের বসার জায়গা হবে না। ওরা নিচে, এখানেই অপেক্ষা করবে।'

অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে, বুঝতে পারছে ডিউক। তোয়াব খানের আজকের আসাটা নিয়মিত দেখা করার মধ্যে পড়ে না। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল ও, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। জুতোর ভারী আওয়াজ পেছনে, ওর সাথে সাথে উঠে আসছে ইন্সপেক্টর।

প্রায় অন্ধকার বৈঠকখানায় আরাম করে বসল ইন্সপেক্টর। খানিক পর কিচেন থেকে দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে এল ডিউক। ইতিমধ্যে দুটো কামরাই সার্চ করা হয়ে গেছে তোয়াব খানের।

'শুনতে পাই, রোজগার নাকি ভালই করছ,' গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল ইন্সপেক্টর। 'এই রকম ছন্ন ছাড়ার মত থাকো কেন?' নতুন নয়, নিত্যকার প্রশ্ন।

পা ঝুলিয়ে টেবিলের ওপর বসল ডিউক। সহজভাবে তাকাল ও। 'চা খেয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন,' বলল। 'আমাকে বেরুতে হবে।'

'জরুরী কোন কাজ আছে বুঝি?' কাপে আরেকটা চুমুক দিল ইন্সপেক্টর। 'দুঃখিত। প্রোগ্রামটা তোমাকে বাতিল করতে হবে।'

'তার মানে?'

'গত রাতে কোথায় ছিলে তুমি, ডিউক?'

একটা সিগারেট ধরাল ডিউক। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কেন? কোথাও কোন ডাকাতি হয়েছে নাকি?'

'না, ডাকাতি নয়,' তোয়াব খান হাসল।

'তাহলে? রেপ?' ঠোঁট বাঁকা করে ডিউকও হাসল একটু।

'তাও নয়,' বলল ইন্সপেক্টর। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কোথায় ছিলে তুমি গত রাতে?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না,' বলল ডিউক। 'কেন?'

তীক্ষ্ণ হলো ইন্সপেক্টরের চোখের দৃষ্টি। 'তুমি সাংহাই রেস্তোরাঁয় যাওনি গতরাতে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গিয়েছিলাম। কেন?'

'ওখানে তোমার সাথে কানিজ ফাতেমা নামে একটা মেয়ের দেখা হয়, চোখের দৃষ্টির মত ইন্সপেক্টরের গলার স্বরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

'হয়।'

'তারপর?'

ঠক্ করে খালি চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ডিউক। 'এসব হেঁয়ালির মানে জানতে পারি? কি হয়েছে কানিজের?'

'তুমি স্বীকার করছ কানিজের সাথে সাংহাইয়ে দেখা হয়েছিল তোমার?'

'এর মধ্যে স্বীকার করার কি আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ডিউক। 'কানিজের সাথে দেখা হওয়াটা অন্যায় নাকি?'

ডিউকের কথা যেন শুনতে পায়নি তোয়াব খান। বলল, 'ঘরে নিয়ে এসেছিলে ওকে?'

ধীরে ধীরে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল ডিউক। নিজের অজান্তেই মুঠো হয়ে গেছে হাত দুটো। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। 'আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?' রূঢ় গলায় বলল ও। 'আমাকে দেখে মনে হয় কানিজকে ঘরে নিয়ে আসব আমি?'

'আহা, চটছ কেন!' পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে দ্রুত বলল ইন্সপেক্টর। 'রাত কাটাবার ইচ্ছে না থাকলেও তো একটা মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসা যায়। এমনি···অন্য কোন কারণে।'

'না, আনিনি,' গম্ভীর ভাবে বলল ডিউক। 'অন্য কোন কারণে মানে?'

'ওর সাথে তো খুব ভাল সম্পর্ক তোমার, তাই না?'

'হ্যাঁ।' ভুরু কুঁচকে উঠল ডিউকের। 'কোন বিপদে পড়েছে কানিজ?'

'বিপদ?' ডিউকের চোখে চোখ রেখে কি যেন খুঁজছে ইন্সপেক্টর। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর আবার বলল, 'না, আর কোন বিপদ নেই তার।' ম্লান হয়ে গেছে তোয়াব খানের চেহারা। এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। একদৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে আছে ডিউক। তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে জানতে চাইল, 'মানে?'

'কানিজ মারা গেছে, ডিউক।'

ঠাণ্ডা একটা মৃদু শিহরণ উঠে গেল ডিউকের শিরদাঁড়া বেয়ে। 'মারা গেছে? কিভাবে?'

থমথমে হয়ে উঠল তোয়াব খানের চেহারা। 'গত রাতে খুন হয়েছে মেয়েটা। সাড়ে ন'টার দিকে।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ডিউক। নিঃশব্দে হাঁটছে ঘরের মধ্যে। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো। ভীষণ আঘাত পেয়েছে ও। কানিজকে ভাল লাগত ওর। অদ্ভুত একটা সরলতা ছিল তার মধ্যে। জীবনে অনেক কষ্ট করেছে বেচারী। অনেক ঠকেছে। কিন্তু কখনও কোন অভিযোগ করেনি। শরীর বেচতে নেমেও লজ্জা, বিবেক, ভদ্রতা, বিসর্জন দেয়নি। বুঝতে পারছে, কানিজের অভাব কষ্ট দেবে ওকে।

'খুনটার সুরাহা করার মত তেমন কোন সূত্র আমাদের হাতে নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল ইন্সপেক্টর। 'এ-ধরনের কেসে সাধারণত তা থাকেও না। আমার মনে হলো, তুমি হয়তো কিছু জানতেও পারো। কার সাথে দেখা হবে না হবে, এ-ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলেছিল নাকি?'

'আটটার দিকে সাংহাই থেকে বেরিয়ে যায় ও,' বলল ডিউক। 'এক ঘণ্টা পর বেরিয়ে আবার দেখতে পাই ওকে আমি। আমাকে দেখেনি ও। ওর সাথে একজন লোক ছিল, তার চেহারাটা মনে নেই।'

'তখন নটা বাজে?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার চেহারা একটুও মনে নেই তোমার?'

'না,' বলল ডিউক। 'যতদূর মনে করতে পারছি, পরনে অ্যাশ কালারের একটা স্যুট ছিল, ব্রাউন রঙের একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল হাতে। আর কিছু মনে করতে পারছি না।'

জুলফির নিচেটা চারটে আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে ইন্সপেক্টর বলল, 'হুঁ।'

ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল ডিউক। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে নিভিয়ে দিল, তারপর নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল। কানিজকে বাদ দিয়ে কানিজের মেয়েটার কথা ভাবছে এখন ও। মেয়েটা একেবারে পানিতে পড়ে গেল। ও জানে, মেয়ের জন্যে একটা পয়সাও রেখে যেতে পারেনি কানিজ। তার মানে, টাকার প্রয়োজন আরও বেড়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেশ কিছু টাকা যোগাড় করতে হবে তাকে।

'এক কথায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড,' নিচু গলায় বলল ইন্সপেক্টর। 'সম্ভবত কোন ম্যানিয়াকের কাজ। এই সব মেয়েরা কিভাবে যে শুধু বিপদ ডেকে আনে, বুঝি না!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডিউক। একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে?'

'লোকটা পাগল, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল ইন্সপেক্টর, 'গলাটা কেটে ফেলেছে। সম্পূর্ণ...'

'থামুন!' চাপা গলায় বলল ডিউক। 'শুনতে চাই না।'

'এই ধরনের মোটিভলেস সেক্স ক্রাইমগুলো সাংঘাতিক ভোগায়।'

কিন্তু এই ধরনের মার্ডার কেসের সাথে এন.এস.আই. সাধারণত নিজেকে জড়ায় না। পুলিস, সি-আই-ডি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ থাকতে তারা কেন নাক গলাচ্ছে এ-ব্যাপারে? কিন্তু প্রশ্নটা না করে অপেক্ষা করাই ভাল বলে স্থির করল ডিউক। জানতে চাইল, 'ঠিক জানেন এর পেছনে কোন মোটিভ নেই?'

'ধরন দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। কলগার্ল খুন ঢাকায় এটাই প্রথম নয়।' হঠাৎ ঝট করে মুখ তুলে তাকাল তোয়াব খান। 'খুনের মোটিভ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো নাকি?'

'চুরি গেছে কিছু?' জানতে চাইল ডিউক। 'কানিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা পাওয়া গেছে?'

'গেছে। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, কিছুই চুরি যায়নি। মনে হচ্ছে, কিছু যেন জানো তুমি?'

'হয়তো কিছুই নয় ব্যাপারটা,' বলল ডিউক। 'গতরাতে জেড পাথরের একটা আংটি দেখিয়েছিল আমাকে ও। ঘরেই নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিল। নিশ্চয় কোন খদ্দের ফেলে যায়। জিনিসটা দামী কিনা জানতে চাইছিল কানিজ।'

'জেড পাথরের আংটি?' ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে তার পিঠ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডিউকের চোখের দিকে। 'কি ধরনের? বর্ণনা দিতে পারবে?'

ইন্সপেক্টরকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেছে ডিউকের। 'সাদা জেড পাথরের তৈরি। আমার যতদূর জানা আছে, ধনুর্বিদেরা ছিলা টানার জন্যে বুড়ো আঙুলে পরত ওগুলো। জিনিসটা নকল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আসল হলে, অনেক দাম হবে ওটার। অরিজিন্যালগুলো চীনারা যীশুর জন্মের দুশো বছর আগে তৈরি করেছিল বলে শুনেছি।'

'আচ্ছা! তাই নাকি?' মাথা নাড়ছে ইন্সপেক্টর। 'ভাল। খুব ভাল। একটা জেড-রিং, তাই না? কানিজ তোমাকে দেখাল। তারপর?'

'তারপর আবার কি? এত হৈ-চৈ করার কি আছে? দেখে মনে হচ্ছে গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেছে আপনার?'

'কাঁটা নয়, ডিউক, গোটা মাছটাই আটকে গেছে গলায়,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তোয়াব খান। 'বলছিলাম কি আমার সাথে কানিজের বাড়িতে একবার যাবে নাকি? আংটিটা খোঁজার ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাইছি আমি।'

আপনাকে সাহায্য করতে বয়েই গেছে আমার, কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ডিউক। কানিজের খুনীকে ধরার ব্যাপারে তারও একটা দায়িত্ব আছে, সেটা এড়িয়ে যেতে চায় না ও। কানিজের বাড়িতে একবার গেলে এমন কিছু চোখে পড়তে পারে ওর যা পুলিসের চোখ এড়িয়ে গেছে। 'আপনাকে খুশি করার জন্যে নয়,' বলল ডিউক। 'নিজের গরজেই যাব আমি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'কিছু না। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। সাথে পুলিস কার আছে, দু'মিনিটও লাগবে না।'

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ইন্সপেক্টর বলল, 'জীবনে কাকতালীয় ঘটনা কতই না ঘটে, তাই না?'

'তা হয়তো ঘটে,' বলল ডিউক। 'তেমন কি ঘটল এখন?'

'কথাটা এমনি হঠাৎ মনে হলো আর কি,' গম্ভীর ভাবে বলল তোয়াব খান।

পুলিস কারে ওঠা পর্যন্ত আর কোন কথা হলো না।

গাড়ি ছুটছে। একটা সিগারেট ধরাল ইন্সপেক্টর। তারপর বলল, 'আংটিটা। ওটা কি বিক্রি করতে চেয়েছিল কানিজ?'

'থানায় জমা দিয়ে দিতে বলেছিলাম। কিন্তু কানিজ রাজী হয়নি। হ্যাঁ, বিক্রি করতে চেয়েছিল।'

সামান্য দূরত্ব, পৌঁছুতে দু'মিনিটও লাগল না। বাঁক নিয়ে গলির ভেতর ঢুকল গাড়ি।

বাড়িটার সামনে পুলিসের আরও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। চার তলায় দু'কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকত কানিজ। 'এতক্ষণে লাশ নিয়ে চলে গেছে ওরা,' বলল ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে ওরা। মোটা মানুষ, হাঁপাচ্ছে। 'কিন্তু শোবার ঘরে ঢোকার উপায় নেই। দু'জন কনস্টেবল বমি করে ফেলেছে।'

চোয়াল দুটো শুধু শক্ত হয়ে উঠল ডিউকের, কথা বলল না।

চার তলার বারান্দায় একজন পুলিস কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে, কপালের কাছে হাত তুলে স্যালুট ঠুকল সে।

'এস. আই. রমিজ এখনও আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল তোয়াব খান।

'আছেন, স্যার।'

'এসো, ভেতরে ঢুকি,' ডিউকের দিকে ফিরে বলল ইন্সপেক্টর। 'এর আগেও তো এখানে তুমি এসেছ, তাই না?'

'কানিজের ফ্ল্যাটে নয়,' বলল ডিউক। ইন্সপেক্টরের বিশাল পিঠ অনুসরণ করে খোলা দরজা দিয়ে একটা ঘরের ভেতর ঢুকল ও। বেশ বড় ঘর। এস.আই. রমিজ এবং দু'জন গোয়েন্দা বাথরূমের দরজা আর জানালার কার্নিসগুলো পরীক্ষা করছে।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ডিউক। বিছানা, পাশের দেয়াল, খাটের মাথা আর কার্পেটে কালো রঙের মোটা স্তর—কানিজের রক্ত।

'মুণ্ডুটা খুব তাড়াতাড়ি আলাদা করেছে, যাতে চিৎকার করার সুযোগ না পায়...'

'থাক, শুনতে চাই না আমি।'

ছোট একটা শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তোয়াব খান। সেটার মাথা থেকে কানিজের হাতব্যাগটা তুলে নিল। উবু হয়ে বসে ব্যাগটা উপুড় করে ধরল। ব্যাগের ভেতর যা কিছু ছিল সব ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। পাউডারের কৌটা, লিপস্টিক, চুলের কাঁটা, ছোট একটা মানিব্যাগ, তাতে একটা একশো আর দুটো পাঁচ টাকার নোট। ব্যাগের ভেতরটা হাতড়ে দেখল তোয়াব খান।

'উঁহুঁ, নেই,' ঘাড় ফিরিয়ে এস.আই. রমিজের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। 'রমিজ, এদিকে শুনে যাও।'

এস. আই. একটু খাটো, ক্রু-কাট, কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। ডিউকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে। তারপর এগিয়ে এসে তোয়াব খানের সামনে দাঁড়াল।

'সাদা পাথরের তৈরি কোন আংটি পেয়েছ?' জানতে চাইল তোয়াব খান।

'সাদা পাথরের আংটি? না।'

'নতুন করে গোটা ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে,' নির্দেশ দিল ইন্সপেক্টর। 'এই কেসে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে ওই আংটির। পাবে বলে মনে করি না, তবু খোঁজার মধ্যে ত্রুটি থাকলে চলবে না।'

এস. আই. সার্চ শুরু করতে যাচ্ছে, ইন্সপেক্টর তোয়াব খান কিচেনের দরজাটা খুলে ধরে ডিউকের দিকে ইশারা করল। নিঃশব্দে এগোল ডিউক। কিচেনে ঢুকল ওরা দু'জন। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ইন্সপেক্টর। ইঙ্গিতে বেতের একটা মোড়া দেখিয়ে বসতে বলল সে ডিউককে। নিজে উবু হয়ে একটা পিঁড়িতে বসল, ডিউকের পায়ের কাছে।

নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করছে ডিউক। ইন্সপেক্টরের ব্যবহার বোধগম্য হচ্ছে না ওর। 'এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক কেন? বাইরে বসে কথা বললে কি হত?'

হাসল তোয়াব খান। 'তোমার সাথে কিছু রহস্যময় কথাবার্তা হবে আমার। আর কাউকে শুনতে দেয়া যায় না।' ডিউকের চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেণ্ড নাটকীয়ভাবে অপেক্ষা করল সে, তারপর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বলো তো, কর্নেল শফি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'কর্নেল শফি?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল ডিউকের। 'তাঁর কথা এখানে ওঠে কেন?'

'ওঠে,' সবজান্তার মত মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর। 'সব পরিষ্কার করে বলা হবে তোমাকে। কিন্তু তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার। তুমি শুধু উত্তর দিয়ে যাও। কর্নেল সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

হেসে ফেলল ডিউক। 'কর্নেল শফি এন.এস.আই-এর চীফ, তাঁর সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনিই বেশি জানেন। শুনেছি, আপনিই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ইন্সপেক্টর। আমাকে এ-প্রশ্ন করার মানে কি?' ইন্সপেক্টর অধৈর্য হয়ে উঠছে দেখে আবার বলল ডিউক, 'ঠিক আছে বলছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সাথে তিন মাস কাজ করেছি আমি, ওই তিন মাসেই তাঁর সম্পর্কে যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। দেশপ্রেমিক, আদর্শ পুরুষ। দেশের স্বার্থটা এত বড় করে দেখেন, তা রক্ষা করার জন্যে নিজের ছেলেকেও অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে তাঁর একটুও বুক কাঁপে না। যুদ্ধের সময় দেখেছি, তাঁর প্রিয় কর্মীদেরকে এমন সব বিপদের মুখে ঠেলে দিতেন, যেখান থেকে ফিরে আসা এক কথায় অসম্ভব। তবে, বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা দিতেন না কাউকে। ঝুঁকি নিতে কেউ যদি ভয় পেত, তাকে তিনি নিজের দল থেকে অন্য দলে সরিয়ে দিতেন। ভীতু কাপুরুষ লোককে তিনি সহ্য করতে পারেন না। অবশ্য আমি তাঁর কৌশলগুলো পছন্দ করি না।

কেন?'

'আর কিছু?'

একটু চিন্তা করল ডিউক। তারপর বলল, 'দেশের জন্যে প্রাণপাত করছে এমন যে-কয়জন মানুষ দেখেছি আমি তাঁদের মধ্যে কর্নেল শফিকেই সবচেয়ে নির্দয় বলে মনে হয়েছে আমার। মিথ্যা কথা বলেন না, কোন ভুল ধারণা দেন না, কিন্তু হৃদয়ে মায়া-মমতা কম। পাষাণ। কেন?'

মাথা নিচু করে নিজের আঙুলের নখগুলো মনোযোগের সাথে লক্ষ করছে ইন্সপেক্টর। 'কর্নেলের সাথে দেখা করতে চাও?' সহজ গলায় জানতে চাইল।

'না, ধন্যবাদ,' সাথে সাথে জবাব দিল ডিউক। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল। 'দেখা করার জন্যে এর আগেও খবর পাঠিয়েছেন কর্নেল। কেন, তা জানি না। জানতে চাইও না। কোন লাভ হবে না, ইন্সপেক্টর। তাঁর সাথে দেখা করতে উৎসাহী নই আমি।'

মুখের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল তোয়াব খানের। 'কর্নেলের জন্যে একটা দুঃসংবাদ, সন্দেহ নেই। ভাল ছেলের অভাব বোধ করছেন তিনি। লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু মনের মত ছেলে পাচ্ছেন না। যাদেরকে তাঁর পছন্দ হয়, তারা আবার তাঁকে পছন্দ করে না। সেজন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম, তাঁকে তোমার পছন্দ হয় কিনা। তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা শুনে মনে হচ্ছিল, কর্নেলের একটা স্বপ্ন বোধ হয় সফল হতে যাচ্ছে। উৎসাহ বোধ না করার কারণটা কি তোমার, আমাকে বলবে? অস্বাভাবিক ভাল বেতন, রোমাঞ্চকর অ্যাসাইনমেন্ট, ফ্রী ট্রাভেল। খারাপটা কোন দিক থেকে?'

'খারাপ, তা তো বলিনি,' বলল ডিউক। 'কারও অধীনে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে, যদি কখনও সে অধিকার ফিরে পাই, আবার নতুন করে শুরু করব। কিংবা, কে জানে, তখন হয়তো মন থাকবে না।'

'নিজেকে এভাবে নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'আর কখনও ও-কথা বলবেন না আমাকে,' কঠিন সুরে বলল ডিউক। 'কারও উপদেশ আমার সহ্য হয় না।'

'বসো, ডিউক,' নরম সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'কর্নেল তোমার সম্পর্কে কতটা ভাল ধারণা পোষণ করেন তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কথায় কথায় সেদিন আমাকে বলছিলেন, এন. এস. আই-এ তোমাকে পেলে খুব ভাল হত। অন্ধের মত বিশ্বাস করেন তোমাকে...'

'আমার এত খারাপ রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ডিউক। 'একজন কুখ্যাত লোকের ওপর এত ভক্তি—লক্ষণ তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না। কর্নেলকে আমি চিনি, ইন্সপেক্টর। বিপজ্জনক কোন কাজ করিয়ে নেবার মতলব, তাই আমাকে এত দরকার তাঁর। উঁহুঁ, তাঁর ফাঁদে পা দিতে রাজী নই আমি।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'কিন্তু এর সাথে কর্নেল শফির সম্পর্ক কি?'

'তুমি দেখছি মানুষের মনের কথা পড়তে পারো,' হাসছে তোয়াব খান।

'ঠিকই ধরেছ, কর্নেল তোমার জন্যে একটা কাজ ঠিক করে রেখেছেন।'

'কি কাজ?'

'অত্যন্ত গোপনীয়, আমাকেও জানানো উচিত বলে মনে করেননি।

'আর আমাকে জানাতে চাইলেও আমি জানতে উৎসাহী নই,' বলল ডিউক। একটা সিগারেট ধরাল ও। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'চললাম।' দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। 'মাই গড!' দ্রুত ডিউকের সামনে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল সে। 'তোমার মতলবটা কি? আমার চাকরি খেতে চাও?'

'মানে?' বিরক্তির সাথে জানতে চাইল ডিউক।

'আমার সব কথা শেষ হয়নি এখনও,' বলল তোয়াব খান। 'তাছাড়া, কর্নেলের নির্দেশ, তোমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

'নির্দেশ?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল ডিউক, 'আমি যদি না যাই?'

'যাবে না কেন?' সামান্য একটু হাঁপাচ্ছে ইন্সপেক্টর। 'আমার সব কথা শোনার পর তুমি নিজেই যেতে রাজী হবে।' দম নিল সে। তারপর আবার বলল, 'শোনো তাহলে। কানিজের ওই আংটির ব্যাপারেই তোমার সাথে দেখা করতে চান কর্নেল। এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। তিনিই সব কথা বলবেন। মনে আছে, একটু আগে বলছিলাম, জীবনে কাকতালীয় ঘটনা কতই না ঘটে? এই কথা ভেবেই বলছিলাম। চলো, ডিউক। কর্নেল তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'উঁহুঁ,' বলল ডিউক, 'তাঁর কাজের ধরন আমার পছন্দ নয়। তাঁর নিজেরই তো অনেক লোক রয়েছে, আমার ওপর নজর পড়ার কারণ কি? কই, আমি তাঁর কোন ক্ষতি করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'জেদ ধরো না, ডিউক। এটা একটা মার্ডার কেস। সহযোগিতার মনোভাব দেখানো উচিত তোমার।'

'মার্ডার কেস। এর মধ্যে এ.এস.আই. কেন নাক গলাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কাজটা নিয়ম ছাড়া হয়ে যাচ্ছে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'এ থেকেই বুঝতে পারছ, নিশ্চয় নাক গলাবার জোরাল কোন কারণ আছে, তাই না?'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ডিউক। যেন মনস্থির করতে পারছে না।

'তুমি চাও না যে-লোক কানিজের ওই অবস্থা করেছে সে ধরা পড়ুক, তার উপযুক্ত শাস্তি হোক?' মৃদু গলায় বলল তোয়াব খান। 'তোমার সাহায্য পেলে লোকটাকে ধরতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কানিজকে তুমি সাহায্য করতে, তাই না? সে খুন হওয়ায় তোমার রাগ হচ্ছে না? শুনেছি, কানিজের মেয়েটাকে তুমিই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছ...'

ইন্সপেক্টরকে ঠেলে এগিয়ে গেল ডিউক দরজার দিকে। মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। দরজা খুলছে। বলল, 'চলুন।'

গাড়িতে উঠে আপন মনে হাসছে ইন্সপেক্টর তোয়াব।

ভুরু কুঁচকে একবার তাকাল শুধু ডিউক। কোন মন্তব্য করল না।

'কর্নেলকে আমি বলেছিলাম ওয়ারেন্টের কোন দরকার হবে না। তুমি এমনিতেই তাঁর সাথে দেখা করতে রাজী হবে।'

'ওয়ারেন্ট?' অবাক হয়ে গেল ডিউক।

ডিউকের সামনে একটা হাত পাতল ইন্সপেক্টর। 'সোনার সিগারেট কেসটা ফিরিয়ে দাও, ডিউক। তোমার ট্রাউজারের ডান পকেটে আছে।'

নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর পকেটে হাত ভরল ডিউক। ইন্সপেক্টর ঠাট্টা করছে না, সত্যি একটা সিগারেট কেস রয়েছে ওর পকেটে। সেটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখছে ও। গায়ে খোদাই করা রয়েছে কর্নেল শফির নাম। মুখ তুলে তাকাল ও। 'সেই পুরানো, নোংরা কৌশল। এখন বুঝতে পারছেন, কেন বলেছি, তাঁর কাজের ধরন আমার পছন্দ নয়?'

হাসছে ইন্সপেক্টর।

'তার মানে,' বলল ডিউক, 'তাঁর কথায় না নাচলে মাস খানেক জেলের ঘানি টানতে হত আমাকে, তাই না?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমার সাথে দেখা করতে চান কর্নেল,' বলল তোয়াব খান। 'তুমি জেদ ধরে বসে থাকলে···একমাস নয়, তোমাকে ছ'মাস জেলের ঘানি টানাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি।' হাসিটা আরও বড় হলো তার। 'অবশ্য তুমি সহযোগিতা করতে রাজী হলেই জেল থেকে আবার বের করে আনার কষ্টটুকুও আনন্দের সাথে স্বীকার করতেন।'

তিন

ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স। হেডকোয়ার্টার। চীফ কর্নেল (অবসর প্রাপ্ত) শফিকুর রহমানের চেম্বার।

ডিউককে নিয়ে আউটার রুমে ঢুকল ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। সামনে টাইপরাইটার নিয়ে বসে রয়েছে একটা মেয়ে। দেখেই চিনতে পারল ডিউক, চোখ ফিরিয়ে নিল সাথে সাথে। এমন কুৎসিত চেহারার মেয়ে জীবনে খুব কমই দেখেছে ও। মুক্তিযুদ্ধের সময় কর্নেলের ডান হাত ছিল মেয়েটা। এতগুলো বছর কেটে গেছে, কিন্তু বয়স বা চেহারা একটুও বদলায়নি। নাকটা ছোট আর চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, চোখ দুটো কুতকুঁতে, মাথার চুল উৎকট রকম কোঁকড়া আর ছোট। কাজের মেয়ে, মেকআপ ব্যবহারের সময় পায় না। পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু কথা বলে সময় নষ্ট করল না। মাথা নেড়ে শুধু দেখিয়ে দিল ভারী পর্দা ঝুলানো দরজাটা। ঝড়ের বেগে টাইপ করে চলেছে তো চলেছেই।

কর্নেল শফির জন্যে এর চেয়ে আদর্শ মেয়ে আর হতে পারে না। দেখতে যাই হোক, এর গুণের কোন ঘাটতি নেই। মেয়েটার উপস্থিত বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা নাকি বিস্ময়কর। এত বছর ধরে কর্নেল শফির পার্সোন্যাল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছে, এ থেকেই তার যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক গুণী না হলে

কাছে পিঠে কাউকে ঘেঁষতে দেন না কর্নেল।

দরজার পর্দা সরিয়ে এগোল ইন্সপেক্টর। তার পিছু পিছু চেম্বারের ভেতর ঢুকল ডিউক।

ওদের দিকে পেছন ফিরে দেয়াল-জোড়া জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল শফি। পায়ের শব্দে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন একটা লম্বা পাইপ। হাতে নিলেন সেটা। ডিউকের আপাদমস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলেন। 'হ্যালো, রানা! তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি।' দরাজ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে একটা চেয়ার দেখালেন রানাকে। 'বসো। অনেক দিন পর দেখা, তাই না? কেমন আছ তুমি?'

রানা? অবাক হয়ে গেল ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। হু ইজ রানা!

পাইপটা আবার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন কর্নেল। হাত দুটো পেছনে রেখে সটান দাঁড়িয়ে আছেন। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা। কানের দু'পাশে পাক ধরেছে চুলে। ক্লিনশেভ। চোখে স্টীল রিমের চশমা। বয়স হলেও, চেহারা আর দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে পরিষ্কার ফুটে রয়েছে সামরিক দৃঢ়তা আর কাঠিন্য। একজন সৈনিকের চেহারা।

'কেমন আছি তা আপনার অজানা নেই,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আপনি কেমন আছেন, কর্নেল?'

'খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি, এইটুকু বলতে পারি তোমাকে,' মৃদু হাসিটা এখনও লেগে আছে মুখে। 'দুঃখিত, তোমাকে আমি বিশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাল একটা। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। অস্বস্তিবোধ করছে ও। যতটুকু শুনেছে, কাজের লোকের অভাব দেখা দিয়েছে কর্নেলের। এই বয়সে তিনি নিজেও নাকি ঝুঁকি নিয়ে অনেক কাজে হাত দেন।

'কি ভাবছ, রানা?' এগিয়ে এসে ডেস্কের পেছনে দাঁড়ালেন কর্নেল। একদৃষ্টিতে এখনও তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'ভাবছি, আপনার রুচি আগের মতই আছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আপনার পার্সোন্যাল সেক্রেটারির কথা বলছি। আর একটু সুন্দরী মেয়ে যদি পেতেন...'

রানাকে বাধা দিয়ে কর্নেল প্রশ্ন করলেন, 'অন্য মেয়ে চাইব কেন? ও তো একটা প্রতিভা।'

'প্রসঙ্গটা ভুলে যান,' বলল রানা। 'ওকে হয়তো আপনি দেখতেই পান না। সে যাক, আপনি বরং ইন্সপেক্টরের দিকে একটু খেয়াল দিন। খবরটা শোনাবার জন্যে মরে যাচ্ছে বেচারা।'

রানার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। কর্নেল তার দিকে তাকাতেই কোন ভূমিকা না করে বলতে শুরু করল সে, 'মেয়েটাকে চেনে

ডিউক…' কানিজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্রুত আউড়ে গেল সে। তারপর বলল, 'গতরাতে তার সাথে দেখা হয়েছিল ওর। ওকে সাদা জেড পাথরের একটা আংটি দেখিয়েছিল। সম্ভবত কোন খদ্দের ফেলে যায় কানিজের ঘরে।'

'সাদা জেড পাথরের আংটি?' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন কর্নেল।

'একজন ধনুর্বিদ তার বুড়ো আঙুলে পরে,' বলল রানা। 'অনেকবার বিদেশে গেছেন আপনি, কোন মিউজিয়ামে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তো অনেকগুলো আছে। তবে কানিজের কাছে যেটা ছিল সেটা বোধহয় আসল নয়।'

নিঃশব্দে, রানার চোখে চোখ রেখে ওয়েস্টকোটের পকেটে একটা হাত ভরলেন কর্নেল। ছোট্ট একটা জিনিস বের করে ছুঁড়ে দিলেন ডেস্কের ওপর। রানার সামনে এসে থামল সেটা। 'এটার মত?' জানতে চাইলেন তিনি।

সাদা পাথরের আংটিটা ডেস্কের ওপর থেকে তুলে নিল রানা। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল। তারপর মুখ তুলে তাকাল কর্নেলের দিকে। 'হ্যাঁ। এটাই কি কানিজের কাছে ছিল? দেখে তো একই রকম লাগছে।'

এদিক ওদিক মাথা দোলালেন কর্নেল। 'না, এটা সেটা নয়। এই রকম রিং অনেকগুলো আছে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। ভেতরের দিকে তাকাও, দেখবে ওটার নাম্বার বারো। কানিজের আংটির ভেতরটা দেখেছিলে তুমি? ওটাতেও এনগ্রেভ করা কোন নাম্বার ছিল?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। আংটিটা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। আংটির ভেতর দিকে ১ এবং ২ লেখা রয়েছে, পাথরের গায়ে গভীরভাবে খোদাই করা।

'লক্ষ করিনি,' বলল ও।

ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'সেটা পাওয়া যায়নি, তাই না?'

'এস. আই. রমিজ সার্চ করছে এখনও,' বলল তোয়াব খান।

'কিন্তু পাবে না,' অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললেন কর্নেল। 'ওটা না পেয়ে কানিজকে খুন করেনি ওরা।'

'ডিউক লোকটাকে দেখেছে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু চেহারাটা মনে করতে পারছে না।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন কর্নেল। 'অসম্ভব! যদি দেখে থাকে, চেহারাটা নিশ্চয়ই মনে আছে ওর। কি, রানা? তোমার ফটোগ্রাফিক চোখের বারোটা বেজে গেছে, প্লীজ, এ-কথা আমাকে যেন শুনতে না হয়।'

মৃদু হাসল রানা। 'চোখ আমার ঠিকই আছে, কর্নেল। ধন্যবাদ। আসলে লোকটার চেহারা আমি দেখতে পাইনি।'

'হুঁ।'

এগিয়ে এসে ডেস্কের ওপর আংটিটা রাখল রানা। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'কথা শেষ হয়ে থাকলে আমি বিদায় হই। আপনার তো আবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

মস্ত শরীর নিয়ে হঠাৎ তাড়াহুড়োর সাথে দরজার দিকে এগোল ইন্সপেক্টর

তোয়াব খান। 'আমাকে তো আর আপনার দরকার নেই, স্যার। আমি গেলাম।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল তোয়াব খান। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা।

'যাবে তো বটেই,' রানাকে বললেন কর্নেল। রিভলভিং চেয়ারে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি। শিরদাঁড়াটা খাড়া করে রেখেছেন। 'তার আগে আরও দুটো কথা বলে নিই। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

দাঁড়িয়েই থাকল রানা। 'আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ, আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'তোমার টাকার দরকার, তাই না, রানা?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'তার মানে?'

'তোমার সম্পর্কে সব খবর রাখছি আমি, রানা। এক-ধারসে যে ভাবে লোক ঠকাচ্ছ, বোঝা যায়, টাকা ছাড়া আর কিছু দরকার নেই তোমার। মাত্র তিন মাসে একজন লোক এই পরিমাণ কুখ্যাতি কিনতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। ঢাকা শহরে ডিউক বলতেই ঠগ, জোচ্চোর, জুয়াড়ী, লম্পট, হাইজ্যাকার, ডাকাত এমন কি খুনী পর্যন্ত বোঝায়। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না, তোমার মত একটা গুণী ছেলের এতটা অধঃপতন কিভাবে সম্ভব?'

'ইন্সপেক্টরদের রিপোর্টের সব কথা বিশ্বাস করবেন না,' বলল রানা। 'তিলকে তাল করাই ওদের স্বভাব।'

'ওদের রিপোর্ট ছাড়া অন্য সূত্র থেকেও খবর পাই আমি, রানা,' বললেন কর্নেল। 'কি বললে? তিলকে তাল করে? তার মানে অভিযোগটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছ না তুমি। গুড। সত্যবাদিতা একটা দুর্লভ গুণ। যাই হোক, তোমাকে যে-কথাটা বলতে চাই আমি—রানা এজেন্সী বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে তুমি যে আচরণ করছ তা লক্ষ্য করে দুঃখ পেয়েছি আমি। স্বীকার করি তোমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু যার ওপর তোমার হাত নেই সেটাকে মেনে নেয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? অন্যের ওপর রাগ করে নিজের ক্ষতি করা, এ কোন্ দেশী কথা? এত কথা বলছি শুধু একটা কারণে, তোমার ভেতর দেশপ্রেম আর প্রতিভা দুটো একসাথে দেখেছিলাম আমি, যা সাধারণত দেখা যায় না। যুদ্ধের পর থেকে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তবু তোমার কথা ভেবে, তোমার রানা এজেন্সীর কথা ভেবে গর্ব অনুভব করতাম আমি। আমার পরিচিত মহলে তোমার কথা প্রায়ই উঠত, আমিই তুলতাম। এতদিন ওদেরকে আমি বড় মুখ করে বলে এসেছি, ওই একটা ছেলে, মাসুদ রানা, ওর মত আর দশটা ছেলে যদি থাকত, দেশের চেহারাই বদলে যেত।' রাগে লাল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। 'এখনকার অবস্থাটা কি তা জানো? এখনও তোমার কথা ওঠে। এখন ওরা তোলে। লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে। তোমার কীর্তি-কলাপের কথা জানতে কারও তো আর বাকি নেই!'

হো হো করে হেসে উঠল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকার পর চোখ নামালেন কর্নেল,

পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন। রানা আর হাসছে না লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন, 'খুব মজা লাগছে, না?'

'অস্বীকার করব না,' বলল রানা। 'লাগছে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। কেউ যদি বেফাঁস কিছু বলে, তাকে তো হাস্যাস্পদ হতেই হবে। আজেবাজে কথা বলেই ভুল করেছেন আপনি।'

'আজেবাজে কথা আমি বলিনি,' পাইপে টান দিয়ে বললেন কর্নেল শফি। 'তোমার ওপর এখনও বিশ্বাস রাখি আমি। কোন স্বার্থ আছে বলে তোমার প্রশংসা করছি তা ভেব না। সে যাক। যতটুকু বুঝতে পারছি, আমার উপদেশ তোমাকে স্পর্শ করছে না। তাতে আমি দুঃখিত নই। আমি জানি, আসল সোনা কখনও নষ্ট হয় না। তুমি নিজেই একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আমি তাহলে এখন যেতে পারি?'

'তার মানে টাকার দরকার নেই তোমার?' ভুরু কুঁচকে উঠল কর্নেলের। 'অবশ্য, খুব বেশি টাকা নয়, এই ধরো, বিশ।'

'বিশ?' ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে রানাকে।

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল। 'বিশ। তার বেশি দেয়া সম্ভব নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা, 'পরিষ্কার করে বলুন।'

নিচু গলায় বললেন কর্নেল, 'হাজার।

ঢোক গিলল রানা। 'বিশ হাজার?'

'হ্যাঁ। সমস্ত খরচ আমাদের। কাজটা সামান্য, কিন্তু ঝুঁকি আছে। তুমি বলেই এত টাকা দেয়া হবে, কেননা এই কাজটার জন্যে তোমাকেই আমাদের দরকার।' চিন্তা করার জন্যে একটু সময় দিলেন তিনি, তারপর জানতে চাইলেন, 'কি ঠিক করলে, রানা?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'তবে বিশ হাজার টাকা…ওটা আমার দরকার।'

'গুড,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। 'কিন্তু তোমার শর্ত—এখন অর্ধেক, বাকিটা কাজ শেষ হলে—এতে রাজী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। টাকা তুমি কাজ শেষ হলে পাবে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, বলল, 'কাজটা কি তা আগে জানতে হবে আমাকে। কাজটা যদি পছন্দ না হয়, বিশ লক্ষ টাকা পেলেও ওতে আমি হাত দেব না। আর যদি পছন্দ হয়, ভেবে দেখতে হবে বিশ হাজার টাকা কম হয়ে যায় কিনা। আর টাকা আমি যাই নিই, আমার শর্তেই পেমেন্ট করতে হবে আপনাকে। অর্ধেক এখন, বাকিটা কাজ শেষ হলে। রাজী থাকলে কাজের কথা পাড়তে পারেন, তা না হলে আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না।'

গম্ভীর হলেন কর্নেল শফি। বললেন, 'এক সময় তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা ছিল, কিন্তু গত তিন মাসে যে দুর্নাম কিনেছ, তাতে টাকা-কড়ি দিয়ে তোমাকে কতটা বিশ্বাস করা যায় ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'খাঁটি সোনা নাকি কখনও নষ্ট হয় না?' মুচকি হাসছে রানা।

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'টাকার লোভ দেখিয়ে তোমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে চাইছি, ব্যাপারটা তা নয়, রানা,' নিচু গলায় বললেন তিনি, 'জানি, টাকা ছাড়া তুমি উৎসাহ বোধ করবে না। কিন্তু কাজটা করার জন্যে দেশপ্রেম দরকার। তোমার মধ্যে তা আমি দেখেছি, সেজন্যেই তোমাকে নিয়ে এত টানাহ্যাঁচড়া করছি।'

'এত বেশি বাজে কথা বলছেন আপনি, কর্নেল, আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'খাঁটি দেশপ্রেমিকের কোনও অভাব নেই আপনার প্রতিষ্ঠানে। আমাকে বেছে নেবার অন্য কোন কারণ আছে আপনার। সেটা কি, আমি জানতে চাই।'

হেসে ফেললেন কর্নেল শফি। 'ঠিক ধরেছ। কাজটা করার জন্যে এমন একজন লোক দরকার আমার যার সম্মান বা মর্যাদা বলে কিছু নেই। যাকে সবাই টাকার ভুখা, জোচ্চোর, ঠকবাজ, নীতিহীন হিসেবে চেনে। এসব ব্যাপারে তোমার মত কুখ্যাতি আর কারও নেই। সেজন্যেই তোমাকে দরকার আমার, রানা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি সিরিয়াস, তাই না?'

'অফকোর্স আই অ্যাম সিরিয়াস,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল। 'তোমার কুখ্যাতিটাই কাভার হিসেবে কাজ করবে—ওরা কেউ তোমাকে সন্দেহই করতে পারবে না। তোমার মত একজন লোক পেলে লুফে নেবে ওরা। তাছাড়া, এ-ধরনের কাজ করতে তোমার ভালও লাগবে। ঝুঁকি নিতে ভালবাসে, এমন লোকের কাজ এটা। একবার যদি ভেতরে ঢুকতে পারো, প্রচুর ক্ষমতা পাবে তুমি হাতে। হলপ করে বলছি না, তবে সম্ভবত প্রচুর ফুর্তির সুযোগও ফাও হিসেবে পেয়ে যাবে তুমি। নিখরচায়। সবটা শুনতে চাও?'

ধীরে ধীরে চেয়ারটায় আবার বসল রানা। ইঙ্গিতে ডেস্ক-ক্লকটা দেখিয়ে বলল, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবার সময় কিন্তু পেরিয়ে যাচ্ছে আপনার।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ভেতর থেকে সেটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে বসলেন আবার রিভলভিং চেয়ারটায়। 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা, রানা,' বললেন তিনি। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলেন পাইপে, কিন্তু ধোঁয়া বেরুল না দেখে নামিয়ে একপাশে রেখে দিলেন সেটাকে। 'সব কথা শোনার সাথে সাথে তোমার গুরুত্বও সাংঘাতিক বেড়ে যাবে।'

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'এমনিতেও নিজের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ নই আমি। সে যাক। আপনি শুরু করুন। আমি কিন্তু কোন কথা দিচ্ছি না। তবে শুনতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

'সংক্ষেপে সারছি আমি,' বললেন কর্নেল। রানার চোখে চোখ রাখলেন তিনি, তারপর শুরু করলেন, 'দেশে একটা বৈরী সংগঠনের খোঁজ পাওয়া গেছে। এখনই যথেষ্ট শক্তিশালী তারা, দিনে দিনে তা আরও বাড়ছে। ওদের উদ্দেশ্য যত রকম ভাবে পারা যায় এদেশের ক্ষতি করা। স্যাবোটাজই ওদের প্রধান অস্ত্র। এই যে

মিল-কারখানা থেকে যন্ত্রাংশ চুরি, পাট গুদামে আগুন, ঘন ঘন বিদ্যুৎবিভ্রাট, খাদ্য বস্তুর কৃত্রিম সংকট, অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানীর হিড়িক, চোরাচালানের ব্যাপক প্রসার, প্রতিটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঘাপলা—এসবের পেছনে রয়েছে ওই সংগঠনের সক্রিয় অবদান।'

শুনছে রানা, কিন্তু প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না।

'কিছু বলতে চাও?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

'এ-ধরনের কথা আগেও শোনা গেছে,' বলল রানা। 'কিন্তু খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখা গেছে, সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই। দেশে বেআইনী কাজ হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশটা। এমন কি স্যাবোটাজের সংখ্যাও কম নয়—কিন্তু এসবের জন্যে দায়ী দুর্নীতিপরায়ণ কিছু ব্যবসায়ী। টাকার প্রতি তাদের লোভই দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। এদের কোন সংগঠন নেই। অন্তত আমার জানা মতে নেই।'

'তোমার জানার মধ্যে কোন ভুল নেই,' বললেন কর্নেল। 'দেশীয় ব্যবসায়ীরা ব্যক্তি-স্বার্থে যা খুশি তাই করছে, দেশের দুর্দশার জন্যে সেটাও একটা কারণ। আমি কিন্তু তাদের কথা বলছি না।' পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে আগুন ধরালেন তিনি। 'আমি যে সংগঠনের কথা তোমাকে বলছি সেটার পেছনে রয়েছে বিদেশী ব্যবসায়ীরা।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'বাংলাদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের গোপন সংগঠন?'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল।

'উদ্দেশ্য?'

'নিজেদের পণ্যের বাজার হিসেবে বাংলাদেশকে তৈরি করা,' বললেন কর্নেল। 'আমাদের মিল কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে সেটা সম্ভব। অসম বাণিজ্য চুক্তি করা গেলে সেটা সম্ভব। কিন্তু এসব যদি একের পর এক ঘটতেই থাকে, এসবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে। তাই এরা জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেবার জন্যে রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টির ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।'

'বিদেশী ব্যবসায়ী বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছেন আপনি?'

'সিঙ্গাপুর, ভারত, থাইল্যাণ্ড, হংকং, তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান এবং কিছু ইউরোপীয় অসৎ ব্যবসায়ী একজোট হয়ে এ সংগঠনের খরচ চালাচ্ছে। নিজেদের কিছু বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে তারা, কিন্তু সংগঠনের নেতা এবং বেশির ভাগ কর্মী এদেশীয়, কোন একটা চরম দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য। দলের বাইরে থেকেও লোক সংগ্রহ করছে এরা। এদের উদ্দেশ্য আলাদা, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, কিন্তু গোপন আন্দোলন পরিচালনার মত ফাণ্ড নেই। ওদিকে বিদেশী ব্যবসায়ীরা স্রেফ বাজার চায়, চোরা চালানের সুযোগ চায়; এবং তাদের বিরাট ফাণ্ড আছে। দু'দলের উদ্দেশ্য আলাদা হলেও, একসাথে কাজ করছে ওরা। তাতে দু'দলেরই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে। কিন্তু সংগঠনের নেতাটির পরিচয় উদ্ধার করতে পারছি না

আমরা। যতদূর জানা গেছে, সে-ই বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। টাকা এবং নির্দেশ সব তার মাধ্যমে বিলি করে তারা। প্রচুর টাকা। এই টাকার জোরে অকস্মাৎ কোন নোটিশ ছাড়াই ধর্মঘট ডাকা হচ্ছে মিল-কারখানাগুলোয়। সবচেয়ে নিরাপদ গুদামগুলোয় আগুন ধরানো হচ্ছে।'

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছে রানা।

'আরও একটা ঘটনার কথা বলছি,' বললেন কর্নেল। 'মনে আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সেক্রেটারি দুর্ঘটনাবশত গুলি খেয়ে মারা গেলেন কদিন আগে? আসলে ওটা দুর্ঘটনা ছিল না। আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, কাজটা ওই সংগঠনের। বিদেশী কয়েকটা রাষ্ট্রের সাথে অসম বাণিজ্য চুক্তি করার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন তিনি, সেজন্যেই তাঁকে মরতে হয়েছে।'

কথা বলছে না রানা। চেহারায় আশ্চর্য একটা শান্ত ভাব ফুটে উঠেছে শুধু।

'এই ধরনের অনেক ঘটনার কথা জানাতে পারি তোমাকে আমি,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু তার কোন দরকার নেই। শুধু একটা কথা জেনে রাখো, সংগঠনটা পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের এই নয় কোটি লোকের দেশটাকে নিজেদের বাজার তৈরি করার জন্যে যা কিছু করার দরকার বলে মনে করছে ওরা, সবই করছে। এভাবে চলতে দেয়া হলে দেউলিয়া হয়ে যাবে দেশটা, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে আমাদের। যা কিছু করার এখনই করতে হবে, রানা। সময় বয়ে গেলে তখন আর কিছু করার থাকবে না। প্রতিদিন শক্তি বাড়ছে ওদের। আরও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। হাতে সময় কম, চুনোপুঁটিদেরকে ধরে কোন লাভ হবে না। আমরা হোতাটাকে ধরতে চাই।'

'কিন্তু এর মধ্যে আমি কিভাবে আসছি বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'সংগঠনের নেতাকে আমি খুঁজে বের করব, আপনি নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে তা আশা করেন না?'

'নিশ্চয়ই আশা করি, একশোবার আশা করি,' জোর দিয়ে বললেন কর্নেল। 'তোমার কাছ থেকে আশা করব না তো কার কাছ থেকে আশা করব? আমার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব তাকে খুঁজে বের করা।'

'কারণ…?'

'কারণ, এই সংগঠনের নেতা ঠিক তোমার মত লোক খুঁজছে। যার দেশপ্রেম নেই, নীতির বালাই নেই, টাকা ছাড়া চোখে আর কিছু দেখে না, সরকারের প্রতি যার প্রচণ্ড রাগ আছে—তাকেই দরকার ওদের। স্যাবোটাজের ব্যাপারে তুমি একজন বিশেষজ্ঞ। তোমার যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে। তুমি প্রাক্তন সৈনিক। দেশময় তোমার কুখ্যাতি রয়েছে। তোমাকে ওরা লুফে নেবে, রানা।'

'কই, আমি তো এখনও কোন প্রস্তাব পাইনি,' বলল রানা।

'তার কারণ ওদের সাথে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা করোনি তুমি,' বললেন কর্নেল। 'ওদের একজন লোককে ধরেছি আমরা। সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার স্টেশনটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে সে। ওর কাছ

থেকে জানা গেছে, সংগঠনের প্রতিটি সদস্য এই রকম একটা আংটি পরে, পরস্পরকে যাতে চিনতে সুবিধে হয়। আরও জানা গেছে, মতিঝিলের ট্যুরিস্টস ক্লাবে ওরা মিলিত হয়, সভা-টভা করে। মিলিত হবার আরও অনেক জায়গা আছে ওদের, এই একটার কথাই জানা গেছে। লোকটা সাংঘাতিক শক্ত, অনেক কষ্টে কয়েকটা মাত্র তথ্য আদায় করা গেছে। দ্বিতীয়বার জেরা করার সুযোগ পাওয়া যায়নি, তার আগেই সে তার সেলে আত্মহত্যা করেছে।'

'আমাকে কি করতে হবে তাহলে?' বলল রানা। 'ট্যুরিস্টস ক্লাবে গিয়ে দেখব কিছু ঘটে কিনা?'

'হ্যাঁ। ক্লাবটা চেনো তুমি?'

'একজন রিটায়ার্ড মেজর···মেজর আতিক ট্যুরিস্টস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা, 'এটা একটা কমার্শিয়াল ক্লাব, বিশেষভাবে বিদেশী ট্যুরিস্টদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। তবে স্থানীয় সদস্যও আছে। মেজর আতিকের সাথে পরিচয় আছে আমার। সে এর সাথে জড়িত বলে মনে করেন আপনি?'

'হতে পারে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এখনও কোন অভিযোগ পাইনি আমরা। আমরা শুধু জানি, এই ক্লাবে সংগঠনের লোকেরা মাঝেমধ্যে মিলিত হয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে।' পাইপে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন কর্নেল। তারপর সরাসরি তাকালেন রানার দিকে। 'কাজটা করছ তুমি?'

'এর মধ্যে করার কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' বলল রানা। 'তবে ট্যুরিস্টস ক্লাবে আজ রাতেই যাব আমি। কিন্তু তারপর আমার আর কিছু করার নেই, তাই না? ওরা যদি খেলায়, আমি খেলব। কিন্তু ওরা যদি কোন প্রস্তাব না দেয় আমাকে? সেক্ষেত্রে এর মধ্যে নেই আমি। ঠিক আছে?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে।'

'মনে রাখবেন, আমি কিন্তু কোন কথা দিচ্ছি না। যেচে পড়ে কোন বিপদে নাক গলাবার ইচ্ছে আমার নেই।'

কর্নেল হাসলেন। 'তোমার মুখ থেকে এই প্রথম একটা মিথ্যে কথা শুনলাম আমি, রানা,' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চোখে। 'আমার যতদূর জানা আছে, বিপদ খুঁজে বেড়ানোটাই তোমার স্বভাব।'

'মানুষের স্বভাব বদলায়।'

'বদলায় নাকি?' মৃদু হাসলেন কর্নেল। 'সবার বেলায় নয়। সে যাক। এখন থেকে আমার সাথে কোনরকম যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না তুমি। চিঠি, টেলিফোন, লোক মারফত—কোন ভাবেই না। ট্যুরিস্টস ক্লাবে তুমি গেলেই তোমার ওপর নজর রাখতে শুরু করবে ওরা। ওদেরকে ছোট করে দেখো না, রানা। ছ'মাস ধরে কাজ করছে সংগঠনটা, এর মধ্যে মাত্র একটা ভুল করেছে ওরা। সুতরাং সাবধান।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খুব বেশি আশাবাদী হয়ে উঠছেন আপনি, কর্নেল,' বলল ও। 'ওরা হয়তো আমাকে লক্ষই করবে না। তবু, কিছু যদি ঘটেই, আপনাকে তা

আমি জানাব কিভাবে?'

'আমার লোক তোমার সাথে যোগাযোগ করবে,' বললেন কর্নেল। 'সে ব্যাপারে চিন্তা করো না তুমি। পাসওয়ার্ডটা ঠিক করে ফেলা দরকার—কি হতে পারে বলো তো?'

একটু চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, ' "কিছু টাকা চাই আমার" কেমন হয়?' হাসল রানা। 'কথাটা কানে গেলেই প্রেরণা বোধ করব আমি।'

'গুড।'

'নট সো গুড,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা বাকি থেকে যাচ্ছে যে!'

'কি কথা?'

'কিছু টাকা চাই আমার।'

হো হো করে হেসে উঠলেন কর্নেল শফিকুর রহমান। তারপর ড্রয়ার থেকে বের করলেন একটা চেক বই। জানতে চাইলেন, 'তোমার নিজের নামে, নাকি রানা এজেন্সীর নামে?'

'আমার নামে,' বলল রানা। গম্ভীর। 'রানা এজেন্সী বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই আর।'

চার

সেদিনেরই ঘটনা। রাত ন'টা।

গ্যারেজ থেকে খুদে ফিয়াটটা বের করে মতিঝিলের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। ট্যুরিস্টস ক্লাবে যাচ্ছে ও। এর আগে এক বন্ধুর সাথে একবার মাত্র গেছে ওখানে। মেইন রোড থেকে প্রায় একশো গজ দূরে আট ফুট উঁচু একটা পাঁচিলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবটা। মনে পড়ছে, ভেতরে ঢোকার সময় সামান্য একটু ঝামেলা হয়েছিল সেবার। সদস্য নয় এমন লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করে থাকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সদস্য যদি নাম করা বা প্রভাবশালী কেউ হয় তবেই সাথে করে গেস্ট নিয়ে আসার অনুমতি দেয়া হয় তাকে।

ওর কথা মনে আছে তো মেজর আতিকের? আপন মনে হাসল রানা। ওর কথা মনে না থাকলেও, খসরুর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তার। সেটাই যথেষ্ট।

মেজর আতিকের সাথে শেষবার দেখা হয়েছে রানার বছর তিনেক আগে। ঢাকাতেই। একটা চায়নিজ রেস্তোরাঁয় বসে মদ খাচ্ছিল মেজর, সাথে লাবণ্যহীন রুক্ষ চেহারার এক ঢ্যাঙা যুবক ছিল—খসরু। চাপা কণ্ঠে তাকে গালমন্দ করছিল মেজর। ছেলেটাও তার সম্মান রেখে কথা বলছিল না। পাশের টেবিলেই বসে ছিল রানা, তাই ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। ঝগড়ার এক পর্যায়ে চটাস করে একটা চড় মেরে বসে মেজর খসরুর গালে। খসরুও কাউকে পরোয়া করার পাত্র নয়, সে-ও সাথে সাথে একটা ছুরি বের করে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল মেজরের ওপর। রানা

বাধা দিল বলে সে-যাত্রা একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল মেজর আতিক।

এরপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চলে যায় মেজর। বুদ্ধি করে খসরুকে আটকে রাখে রানা, তাকে মদ কিনে খাওয়ায়। চড় খাওয়ার অপমানটা তখনও ভুলতে পারেনি খসরু, রাগে সারা শরীরে আগুন জ্বলছিল তার। রানা তাকে কয়েকটা সহানুভূতির কথা বলে সেই আগুনটা আরও উসকে দিল। কিছু গোপন না করে মেজর আতিক সম্পর্কে যত খারাপ কথা জানা ছিল তার, গল গল করে সব ঢেলে দিল রানার কানে। সামরিক বাহিনী থেকে কেন বহিষ্কার করা হয়েছে মেজরকে, কেন তার প্রথম স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, এই রকম আরও অনেক তথ্য জানা হয়ে গেল রানার। তথ্যগুলো কাজে লাগবে, এতদিন সে-কথা ভাবেনি রানা। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে, মেজর আতিককে কোণঠাসা করে কিছু সুবিধে আদায় করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয় তার জন্যে।

সামনে নিয়ন বাতির টকটকে লাল আভা। বাঁক নিল ফিয়াট। সামনে দেখা যাচ্ছে বিরাট গেট। গেটের মাথায় নিয়ন সাইনের প্যাঁচানো অক্ষর দিয়ে লেখা—ট্যুরিস্টস ক্লাব। গেটটা খোলা, কিন্তু পথরোধ করে ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড। গেটের পাশেই গাড়ি পার্ক করার জায়গা, সেখানে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল রানা। গেট ছেড়ে এগিয়ে এসেছে ইউনিফর্ম পরা গার্ড। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট ঠুকল সে। 'গুড ঈভনিং,' সসম্ভ্রমে বলল সে। 'আপনি ক্লাবের একজন মেম্বার, স্যার?'

'গুড ঈভনিং,' হাসিমুখে বলল রানা। ঠোঁটে একটা ফিলটারটিপ্‌ড্ সিগারেট গুঁজে নিয়ে লাইটার জ্বেলে আগুন ধরাল তাতে। 'না, সদস্য নই। মেজর আতিক আছেন? তাঁর সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

ভুরু জোড়া কপালে উঠে গেল গার্ডের। 'জ্বী? দুঃখিত, স্যার। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া মেজর আতিক কারও সাথে দেখা করেন না।'

'আচ্ছা!' বলল রানা। 'তুমি ছাড়া আর কে আছে যার সাথে কথা বলতে পারি আমি?'

'কি ব্যাপার?' ঠাণ্ডা, রূঢ় একটা কণ্ঠস্বর। রানার পিছন থেকে।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘকায় এক যুবক। পরনে অত্যন্ত দামী ঈভনিং স্যুট, বাটন-হোলে টকটকে লাল একটা গোলাপ ফুল। কংক্রিটের সরু রাস্তাটা দিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কাঁধটা চারকোনা, গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামী, ক্লিনশেভ। চেহারায় আশ্চর্য একটা কাঠিন্য লক্ষ করার মত। চোখের মণি দুটো কালো আর স্থির।

'কে আপনি?' জানতে চাইল রানা। মুখে ওর সবচেয়ে দুর্লভ মধুর হাসি।

'আমি জিয়া, এই ক্লাবের ফ্লোর ম্যানেজার। আপনার সমস্যাটা কি বলুন আমাকে।'

'সমস্যা?' আবার হাসল রানা। 'কোন সমস্যা নেই। মেজর আতিকের সাথে দেখা করতে চাই আমি।

'মেজর আপনাকে চেনেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যস্ত মানুষ, আমার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মেজর,' বলল ও। 'অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই কিনা। আমার নাম মাসুদ রানা। যদি চিনতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই, তা নাহলে মেজরকে খসরুর নাম বলবেন। বলবেন, খসরুর ব্যাপারেই তাঁর সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মুখের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে ফ্লোর ম্যানেজার জিয়ার। 'খসরু? খসরু কে?'

'মেজর আতিক তাকে ভালভাবে চেনেন।'

ছোট্ট একটা ইঙ্গিত করল জিয়া, সাথে সাথে সরে গেল গার্ড। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিয়া, কালো চোখের মণি দুটো রানার চোখ ভেদ করে দৃষ্টিটা ব্রেনে পাঠাবার চেষ্টা করছে। তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল, 'উদ্দেশ্য কি আপনার?'

'আর কোন উদ্দেশ্য নেই। মেজর আতিকের সাথে দেখা করতে চাই।'

'খসরুর কথা বলছেন, কে সে?'

'মেজরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন,' বলল রানা। 'তিনি যদি মনে করেন আপনাকে জানানো চলে...'

প্রচণ্ড রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠল জিয়ার, কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু হঠাৎ চরকির মত আধপাক ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। 'আসুন আমার সাথে,' কর্কশ গলায় বলল সে।

গেটের ভেতর ঢুকছে রানা, আরেকটা স্যালুট জুটল ওর কপালে। কংক্রিটের চওড়া রাস্তার দু'পাশে ফুলের লম্বা বাগিচা। খানিকদূর এগিয়ে বাঁক নিতেই চোখে পড়ল ফ্লাড-লাইটের আলোয় ঝলমল করছে একটা সুইমিং পুল। কয়েকজন পুরুষ, সাথে কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে সাঁতার কাটছে। একপাশে লোহার সিঁড়ির মাথায় কয়েকটা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, সেগুলো তারের জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে কালো আর হলুদ রঙের বাথটাব দেখা যাচ্ছে। তারের জালের ভেতর ক্ষীণ একটু নড়াচড়াও লক্ষ্য করল রানা। ব্যক্তিগত যৌন-লালসা চরিতার্থ করার সুযোগও রয়েছে এখানে। বিশেষ করে বিদেশী মেহমানদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে এই ক্লাব, তাই এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামায় না কেউ।

গোটা ক্লাবটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া। লম্বা একতলা ভবনটা লাল আর হালকা নীল নিয়ন বাতির আলোয় ভাসছে।

দরজা ঠেলে একটা বার-রুমে ঢুকল জিয়া। দেশী-বিদেশী যুবক-যুবতীরা উঁচু টুলে বসে আছে, চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। চোখে কৌতূহল নিয়ে কেউ কেউ তাকাল রানার দিকে, মুখ টিপে মৃদু হাসল দুটো মেয়ে জিয়াকে দেখে। উত্তরে ঝট্ ঝট্ করে দু'বার মাথা ঝাঁকিয়ে বার-এর শেষ মাথায় চলে এল সে। রানাকে পিছনে নিয়ে একটা অফিস কামরায় ঢুকল।

'অপেক্ষা করুন এখানে,' রানাকে বলল সে। অফিস কামরার আরেকটা দরজা খুলে পাশের কামরায় চলে গেল। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল, কিন্তু তার আগেই কামরার খানিকটা দেখে নিয়েছে রানা। ওটাও একটা অফিসরুম, আকারে

একটু বড়।

ডেস্কের কিনারায় নিতম্ব ঠেকিয়ে কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রানা। একটা সিগারেট ধরাল। চোখ দুটো দেয়ালে নিবদ্ধ, কিন্তু তাকিয়ে আছে যেন বহু দূরে। কান দুটো সজাগ। কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও।

পাঁচ মিনিট পর দরজা খুলে বেরিয়ে এল জিয়া। বুড়ো আঙুল বাঁকা করে ঘাড়ের ওপর দিয়ে খোলা দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে যেতে পারেন আপনি, মি. রানা।' কথাটা বলে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ধীর পায়ে এগোল রানা। ভারী সিল্কের পর্দা সরিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল। কামরাটা রুচিসম্মত, সৌখিনভাবে সাজানো। প্রকাণ্ড একটা ডেস্কের পেছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছে মেজর আতিক। তার পিছনে দেয়াল-জোড়া জানালা। তিন বছর আগে দেখা চেহারাটা অনেক বদলে গেছে, কিন্তু চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে মেজর। ব্যাকব্রাশ করা চুলের কিনারায় পাক ধরেছে। সৈনিকের দৃঢ়তা উবে গেছে চেহারা থেকে। পঞ্চাশের মত বয়স। চোখে হালকা সবুজ গ্লাসের চশমা। এক জুলফি থেকে আরেক জুলফি পর্যন্ত ফিতের মত সেঁটে রয়েছে কালো দাড়ি।

'আপনি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন?' মর্মর মূর্তির মত স্থির হয়ে রয়েছে মেজর। চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। গলার আওয়াজটা খাদে নামানো, শোনা যায় কি যায় না।

'এখানে তো শুধু আপনাকেই চিনি, আর কার সাথে দেখা করতে চাইব, বলুন?' হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। 'আমি আপনার ক্লাবের সদস্য হতে চাই।'

'সেজন্যে আমার সাথে দেখা না করলেও চলত আপনার,' বলল মেজর, হাত বাড়াল কলিংবেলের বোতামটার দিকে। 'ব্যবসার ওদিকটা দেখাশোনা করে জিয়া।'

'কাউকে ডাকবেন না,' মৃদু হেসে বলল রানা। চেয়ারে বসে হেলান দিল। 'আমি আপনার সাথে ডিল করতে চাই। কারণ, এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। আপনাদের ফর্মালিটি জানা আছে আমার—তাছাড়া, ক্লাবের সদস্য হতে চাইলে পাঁচ হাজার টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ এই ক্লাবের সদস্য না হলেও চলছে না আমার।'

রানার চোখে চোখ রেখে কলিংবেলের বোতামের কাছ থেকে ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিল মেজর। 'তাই নাকি? ফর্মালিটি মানবেন না, টাকা নেই, অথচ ট্যুরিস্টস ক্লাবের সদস্য হতে চান?'

'হ্যাঁ,' সহাস্যে বলল রানা। 'টাকার ব্যাপারে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই, মেজর। ওটা আপনিই দিয়ে দেবেন। সাথে করে নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোথাও পেলাম না খসরুকে। তাকে আনলে সে আমার হয়ে সুপারিশ করত।' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল রানার চোখে। 'খসরুকে মনে আছে আপনার?

শেষবার আপনার সাথে যেবার দেখা হলো আমার, খসরু আপনাকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল। মনে পড়ে?'

স্থির হয়ে বসে আছে মেজর। চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। 'ও, এই তাহলে পরিস্থিতি। শুনেছি, ডিউক নামে বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছেন আপনি। সবাই বলে, আপনি নাকি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন। নীতির কোন বালাই নেই। নির্দয়। কথা দিয়ে কথা রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। সব তাহলে সত্যি?'

'সত্যি,' হাসল রানা। 'কিন্তু ওসব আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন না, প্লীজ। নিজের সম্পর্কে খারাপ কথা কার ভাল লাগে, বলুন?'

'ট্যুরিস্টস ক্লাবে কেন ঢুকতে চান আপনি?'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল রানা। তারপর হাত বাড়িয়ে মেজর আতিকের বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসের প্যাকেটটা টেনে আনল নিজের দিকে। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনাদের ক্লাবে কেন ঢুকতে চাই···অনুমান করতে পারছেন না? আমাকে যারা কাজ দেয়, বা দিতে চায় তারা আর আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তাতে আমার পকেটের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। তাই নতুন এলাকায় নতুন ধান্ধার খোঁজে আছি আমি। ট্যুরিস্টস ক্লাবে যত ধনী লোকেরা অলস সময় কাটায়, এখানে যে আমি সুবিধে করতে পারব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিকার ধরার এমন আদর্শ জায়গাটা আরও আগে যে কেন আমার চোখে পড়েনি সেটাই আশ্চর্য। এবার বুঝতে পারছেন?'

'পারছি,' ডেস্কের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা মারছে মেজর। আঙুলগুলো ছোট ছোট, নখগুলো নিখুঁত ভাবে কাটা। 'আমার ক্লায়েন্টদের সর্বনাশ করতে চান আপনি। আপনার ধারণা, এতে আপনাকে আমি সাহায্য করব?'

'সাহায্য করবেন কিনা তা আমি কিভাবে জানব?' বলল রানা। 'তবে সাহায্য করলে আমি খুশি হব, আপনারও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া হবে।' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। 'খোলাখুলি কথা বলা যাক, কেমন? খসরু কি রকম ছেলে সে তো আপনার জানাই আছে। রেগে গেলে হুঁশ থাকে না ওর। চড় মেরে সেদিন ওকে আপনি সাংঘাতিক খেপিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার সম্পর্কে দুনিয়ার যত খারাপ কথা আছে সব আমাকে বলে দিয়েছে। তবে, ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে গিয়ে জানতে পারলাম, একটাও মিথ্যে কথা বলেনি সে। সে যাই হোক, আপনার খারাপ রেকর্ড সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ নেই। কারও নামে কলঙ্ক লেপন আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনি যদি আমার দিকটা না দেখেন, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সামরিক বাহিনী থেকে কেন আপনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে তা যদি জানাজানি হয়ে যায়, এত বড় ক্লাবের প্রেসিডেন্টের এমন লোভনীয় পদ, এমন জমজমাট ব্যবসা আপনাকে বোধ হয় হারাতেই হবে। তা আমি পারতপক্ষে চাই না। চাইব কি চাইব না তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আপনার ওপর।'

হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল মেজর আতিক। সামান্য, প্রায়

ধরা যায় না, কাঁপছে সেটা। সিগারেট ধরিয়ে সোনালী লাইটারটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। চেহারায় একটা অসুস্থ ভাব ফুটে উঠেছে তার। বলল, 'ব্ল্যাকমেইল, তাই না? আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'ব্ল্যাকমেইল ছাড়া কোন্ কাজটা হয় আজকাল, বলুন?'

'আর আপনাকে যদি এই ক্লাবের সদস্য করে নেয়া হয়?'

'স্বভাবতই খসরু কি বলেছে না বলেছে সব আমি ভুলে যাব। বিশ্বাস করুন, মেজর, আপনি আমার হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমার তালে যে তাল মেলায় তার আমি কোন ক্ষতি করি না। আপনাকে অসন্তুষ্ট করে আপনারই জঙ্গলে শিকার করার এমন একটা সুযোগ হাত ছাড়া করব, তেমন বান্দা আমি নই।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' অনেক কষ্টে রাগ চেপে রেখে বলল মেজর। এক ঝট্‌কায় টান দিয়ে খুলে ফেলল দেরাজটা, একটা কার্ড বের করে দ্রুত কি যেন লিখতে শুরু করল সেটার ওপর। 'এই নিন,' লেখা শেষ করে টোকা মেরে ডেস্কের ওপর দিয়ে কার্ডটা পাঠিয়ে দিল রানার দিকে। 'কিন্তু, মি. রানা, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ক্লাবের কোন সদস্য যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনরকম অভিযোগ করে, তখন আর আপনার পক্ষ নিয়ে কিছু করার থাকবে না আমার। একটা কমিটি আছে, অভিযোগ নিয়ে তারাই মাথা ঘামায়। বেচাল চললে তারা আপনার পাছায় লাথি মেরে বের করে দেবে।'

হাসল রানা। 'কিস্যু চিন্তা করবেন না। আমার বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করবে না। আমার কৌশল সম্পর্কে আপনার জানা নেই—একেবারে নিশ্চিদ্র, ফুলপ্রুফ।'

চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে মেজর আতিক। গম্ভীর গলায় বলল, 'শুনে খুশি হলাম।'

মেজরের কথা শেষ হতেই দরজা খুলে গেল, কে এল দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল রানা।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর একটা ছবি যেন। মেয়েটাকে দেখেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার। সাদা সিল্কের সালোয়ার, আঁটসাঁট সাদা সিল্কের কামিজ, গলায় জড়ানো রয়েছে কালো ওড়না। নিচে নেমে এল রানার দৃষ্টি। দুধের মত সাদা জুতো জোড়া চকচক করছে। দৃষ্টিটা আবার মুখে ওঠার পথে একবার বুকের কাছে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটা। দুই চোখে কৌতুক মেশানো দৃষ্টি। রানার মুখ থেকে সরে গিয়ে স্থির হলো মেজর আতিকের মুখের ওপর।

'দুঃখিত,' বলল সে। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি একা আছেন…'

'আসুন, মিস আফরোজা,' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল মেজর। 'আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

চট্ করে আরেকবার রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। তার চোখের ভাব-ভাষা দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার, ওকে দেখে মেয়েটা আকৃষ্ট হয়েছে। উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা। ওর চোখে চোখ রেখে মৃদু একটু হাসল আফরোজা।

উত্তরে রানাও হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক।

মেয়েটার গলায় একটা সোনার চেইন ঝুলছে, চেইনের সাথে লকেটের মত ঝুলছে সাদা জেড পাথরের তৈরি ধনুর্বিদের বুড়ো আঙুলের সেই আংটি।

পাঁচ

'আর কিছু তো জানার নেই আপনার, তাই না?' নরম গলায় প্রশ্ন করল মেজর আতিক। 'ক্লাবের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জিয়াই আপনাকে সব জানিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ,' ডেস্ক থেকে কার্ডটা তুলে নিয়ে বলল রানা। সেটা পকেটে রাখার সময় আরেকবার তাকাল মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা যেন ঠিক এই সুযোগটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, রানা তাকাতেই উপযাচক হয়ে জানতে চাইল, 'আপনি বুঝি এই ক্লাবের নতুন মেম্বার?' চোখে একরাশ কৌতূহল, মুখে হাসি, কণ্ঠস্বরে মার্জিত আভিজাত্যের সুর।

'এইমাত্র নাম লেখালাম,' বলল রানা। 'আশা করি ভুল করিনি?'

'না। এত ভাল ক্লাব আর আছে নাকি!' অকারণ আনন্দে ডগমগ করছে আফরোজা। 'সদস্যরা সবাই খুব ভদ্র।' চোখে প্রত্যাশা নিয়ে মেজর আতিকের দিকে তাকাল সে। আশা করছে, রানার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে মেজর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ খুলল মেজর, 'মি. মাসুদ রানা—মিস আফরোজা খানম।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' অনেক কষ্টে আফরোজার গলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখছে রানা। 'ভদ্র মেম্বারদের মধ্যে আপনিও কি একজন?'

'জী,' ছোট্ট করে উত্তর দিল আফরোজা। 'জানতে চাওয়ার বিশেষ কোন কারণ আছে কি?'

'আছে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমি আশা করছিলাম কেউ আমাকে ক্লাবটা ঘুরিয়ে দেখাবে। কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার সাথে কেউ আছেন, সুতরাং বৃথা আশা কুহকিনী...'

রিনিঝিনি হাসির সাথে সারা শরীরটা দোল খেল আফরোজার। নাচের সুললিত ভঙ্গিতে জায়গা বদল করে দু'পা সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'হাতে আমার এখনও খানিক সময় আছে, আপনি চাইলে ক্লাবটা অনায়াসে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনতে পারি আপনাকে। আমার ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি, সময় জ্ঞান কোনকালেই ছিল না ওর...'

'এক্সকিউজ মি,' তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলে উঠল মেজর আতিক। 'মিস আফরোজা, আপনি কি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন?'

'দুঃখিত,' বলল আফরোজা। 'হ্যাঁ। একটা চেক ক্যাশ করতে চেয়েছিলাম।' ব্যাগ খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ রাখল সে ডেস্কের ওপর।

'বাইরে অপেক্ষা করছি আমি,' বলল রানা। দরজার দিকে এগোচ্ছে ও। দরজা

খুলে বেরিয়ে যাবার আগে ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল, মেজর আতিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দরজার দিকে পিছন ফিরে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। মেজরের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল রানা। তারপর মিষ্টি মধুর হেসে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

এক মিনিটের মাথায় আউটার রুমে এসে রানার সাথে মিলিত হলো মেয়েটা।

'চক্কর শুরু করার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে কেমন হয়?' জানতে চাইল রানা।

একটু ইতস্তত করে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে রাজী হয়ে গেল মেয়েটা। আউটার রুমের দরজা খুলে ধরে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। তারপর মেয়েটার পিছু পিছু বার-এ ঢুকল। লক্ষ্য করল, হাঁটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে আফরোজার। অনেকদিনের চর্চার ফল। সবাই নিতম্বে অমন ঢেউ তুলতে পারে না। কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল ওরা।

তারপর প্রশ্নটা করল রানা, 'আপনার হাঁটা তো বড় সুন্দর!'

মুখের চেহারা সামান্য একটু লালচে হলো আফরোজার। 'একসময় মডেলিঙের এক-আধটু কাজ করেছিলাম কিনা,' মৃদু গলায় বলল সে। 'কিন্তু আমার ভাই ওসব পছন্দ করে না বলে ছেড়ে দিয়েছি।' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সে। 'হাঁটার সেই অভ্যাসটা রয়েই গেছে।'

'এখন তাহলে কিছু করেন না? বেকার?'

'এই বছরটাই আছি ইউনিভার্সিটিতে,' হাসল আফরোজা, 'তারপর বেকার হয়ে যাব। তবে আমার ভাই চিন্তা করতে নিষেধ করেছে। ওর ফার্মে একটা চাকরি নাকি ঠিক করাই আছে আমার জন্যে।'

'ছোট, না বড়?'

'আমার ভাই? পঁয়ত্রিশ মিনিটের বড়। বেটার ট্রাভেলস-এর নাম শুনেছেন?' মাথা ঝাঁকিয়ে কাঁধের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল আফরোজা। 'ও ওটার ডিরেক্টর।'

'ট্রাভেল এজেন্সী। যতদূর মনে পড়ছে, ফার্মগেট এলাকায় কোথাও দেখেছি বেটার ট্রাভেলসের সাইনবোর্ড।'

'হ্যাঁ, ফার্মগেটেই।'

বারম্যান এল অর্ডার নেবার জন্যে। নিজের জন্যে হুইস্কি বলল রানা, তারপর তাকাল আফরোজার দিকে।

'আমার জন্যে কোক,' বলল আফরোজা। বারম্যান চলে যেতে চট্ করে আশপাশটা দেখে নিয়ে মুচকি একটু হেসে রানাকে বলল, 'চুরি করে এক-আধটু ড্রিঙ্ক মাঝে মধ্যে করি, কিন্তু ফখরুল যদি জানতে পারে, তাহলে আর রক্ষা নেই।'

হেসে ফেলল রানা। 'খুব বুঝি ভয় করেন ওকে?'

'এমনিতে খুব সরল, মাটির মানুষ,' বড় ভাইয়ের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আফরোজা। 'কিন্তু কোন অন্যায় সহ্য করতে পারে না। বড় ভাই হলে কি হবে, আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের বড়, তাকে কি আর বড় বলে!

খুব ভালবাসে আমাকে।'

হুইস্কি আর কোক নিয়ে ফিরে এল বারম্যান। একটা সিগারেট ধরাল রানা। ট্যুরিস্টস ক্লাবে ঢুকেই বৈরী সংগঠনের একজন সদস্যার দেখা পাওয়ায় খুশি হয়ে ওঠার কথা ওর, কিন্তু তা হয়নি রানা। ঘটনাটা বড় তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। সন্দেহজনক। গোটা ব্যাপারটা সাজানো বলে মনে হচ্ছে। কর্নেল শফির কথা মনে পড়ে গেল ওর। তিনি বলেছেন গত ছয়মাসে একটা মাত্র ভুল করেছে এরা, সুতরাং সাবধান। কিন্তু ও যে এখানে আসছে তা এরা জানল কিভাবে? এর জন্যে গবেষণা করার দরকার হলো না, সহজেই অনুমান করতে পারল রানা ব্যাপারটা। এরা হয়তো কানিজের বাড়ির ওপর নজর রাখছিল, ওখানেই এন.এস.আই. ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের সাথে দেখেছে তাকে, অনুসরণ করে এন.এস.আই. হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত গিয়ে থাকতে পারে। তার মানে, এটা একটা ফাঁদ।

'প্রথম সাক্ষাতে নিজের কথা সবই তো বলে ফেললাম আপনাকে,' কাঁধে স্তূপ হয়ে থাকা চুলগুলো আবার মাথা ঝাঁকিয়ে নামিয়ে দিয়ে বলল আফরোজা, 'এবার আপনি কিছু বলুন। কি করেন আপনি?'

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'আমি একজন শিকারী।'

'তাই?' কৌতুক মেশানো বিস্ময়ে চিকচিক করছে আফরোজার চোখের মণি দুটো। 'আপনি শিকারী? কি শিকার করেন আপনি, মি. রানা?'

'অনেক জিনিসই শিকার করি। তার মধ্যে প্রধান তিনটে—লাভ, রোমাঞ্চ আর আনন্দ।'

'লাভ? রোমাঞ্চ? আনন্দ?' হেসে উঠল আফরোজা। 'কিন্তু এসব জিনিস শিকার করা কি সহজ কথা? পান কিছু?'

হাসছে রানা। 'প্রচুর,' বলল ও। 'তবে শিকার পাবার জন্যে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। আর আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলেই চারদিক থেকে স্রোতের মত আসতে থাকে টাকা। যখন দেখি টাকার আর দরকার নেই আপাতত, তখন নিজেকে ছুটি অনুমোদন করি। এই এখন যেমন, ছুটিতে আছি, কোন ব্যস্ততা নেই। সামনে সুন্দরী এক মেয়েকে নিয়ে গলা ভেজাচ্ছি, এরই নাম আনন্দ।'

'তাহলে রোমাঞ্চ কাকে বলেন?'

'অনেক বিপজ্জনক কাজ আছে, যা সবাই করতে পারে না,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার জন্যে কোন কাজই বিপজ্জনক নয়। যে-কোন ঝুঁকি নিয়ে যে-কোন কাজ করতে পারি আমি। এবং করে মজা পাই, রোমাঞ্চ অনুভব করি।'

হাসছে আফরোজা। একবারও রানার মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'আপনাকে কেন যেন আশ্চর্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে আমার। মাত্র দু'মিনিটের পরিচয়ে এত সহজ হতে পারে না কেউ, সেটাই বোধহয় কারণ। কিংবা, আপনার কথাগুলো নতুন ধরনের, তাই।' চোখের সামনে বাঁ হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখল সে। খেদ প্রকাশের সুরে বলল, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ফখরুল। আজ আমাদের জন্মদিন। একসাথে ডিনার খাব বলে কথা দিয়েছি।'

'অদ্ভুত!' চেয়ারে হেলান দিল রানা। আফরোজার গায়ের চামড়া লক্ষ্য করছে। মুক্তোর মত একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে যেন শরীর থেকে। 'এই রকম একটা উৎসবের জন্যে বোনকে বেছে নিয়েছে ভাই, এমন সাধারণত দেখা যায় না। আপনার ভাইয়ের বান্ধবীরা কোথায়? নাকি তেমন কেউ নেই?'

'ফখরুলকে আপনি চেনেন না,' বলল আফরোজা। 'অত্যন্ত সিরিয়াস টাইপের ছেলে। সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মেয়েদের পেছনে ঘোরার মত সময় পায় না। কোথাও যদি যাবার ইচ্ছে হয়, আমি ছাড়া ওর কোন গতি নেই।'

'আর তোমার ব্যাপারটা বোধ হয় এই রকম...' সম্পর্কটাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্যে হঠাৎ করেই সম্বোধন বদলে ফেলল রানা, লক্ষ্য করল খুশিতে চিকচিক করে উঠল আফরোজার চোখ দুটো। '...ভাইয়ের মত অতটা সিরিয়াস নও তুমি, যথেষ্ট বয়-ফ্রেণ্ড আছে তোমার, যদিও ভাইকে তুমি ভালবাস তবু তার সঙ্গ সব সময় তোমার ভাল লাগে না।'

'ঠিক তাই,' হেসে ফেলে বলল আফরোজা। 'চরিত্র বিশ্লেষণে আপনার জুড়ি মেলা ভার।'

'কিন্তু যদি মনে করো মেয়েদেরকে আনন্দ দেবার ব্যাপারেও আমার জুড়ি নেই, তাহলে কিন্তু মস্ত ভুল করবে তুমি,' সাবধান করে দেবার সুরে বলল রানা। 'একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা আমার সঙ্গ পেলে ধন্য হয়ে যেত, কারণ তখন আমি ওদের মন-মর্জি বুঝতে চেষ্টা করতাম; কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি করি, জীবনটা সাংঘাতিক ছোট, এই ফুরিয়ে গেল বলে। তাই কারও মন বোঝার জন্যে সময় নষ্ট করি না আজকাল। যাকে ভাল লাগে তাকে কথাটা সাথে সাথে জানিয়ে দিই। সে যদি ব্যাপারটা সহজ ভাবে না নেয়, তার আশা ছেড়ে দিয়ে আরেক দিকে চলে যাই আমি।' আফরোজার ঘন কালো চোখের মণির দিকে সরাসরি তাকিয়ে আবার বলল রানা, 'তোমাকে আমার সাংঘাতিক ভাল লেগে গেছে।'

'আমার ধারণাই ঠিক,' হাসছে আফরোজা। 'আপনি একটা আশ্চর্য মানুষ!'

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি রানা, বলল, 'তোমার ভাইটিকে এড়িয়ে যেতে পারো না আজ?'

'অসম্ভব। আজ আমাদের জন্মদিন।'

'হুঁ, তা ঠিক।' ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল রানা। 'তার মানে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আমার। কিন্তু এর পর আবার যখন দেখা হবে আমাদের, তোমার মুড তখন কেমন থাকবে কে জানে! মেয়েরা সাধারণত ভীষণ অস্থিরমতি হয়ে থাকে।'

'আপনার বোধহয় মনে হচ্ছে আজ আমি খুব মুডে আছি?'

'মনে হচ্ছে মানে? আমি জানি।'

'তাই নাকি?' এই প্রথম ভুরু কুঁচকে তাকাল আফরোজা। হাসি নেই মুখে। 'কিভাবে জানলেন?'

'তোমার চোখে খুশি চিকচিক করে উঠতে দেখে,' সাথে সাথে উত্তর দিল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'আবার কবে দেখা হচ্ছে আমাদের?'

একটু চিন্তা করল আফরোজা। দু'বার মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'নাকি চাও না যে আর দেখা হোক?'

'না, না—তা নয়!' দ্রুত বলল আফরোজা, তারপর আবার কি যেন চিন্তা করল। বলল, 'রোববারে।'

'রোববার তো এখনও অনেক দূরে। তার আগে হয় না?'

'মাত্র তিনদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই আপনার, মি. রানা?' আবার হাসছে আফরোজা।

'আমাকে "তুমি" আর "রানা" বলো। শেষ পর্যন্ত আমরা যদি অবৈধ মেলামেশা করার ব্যাপারে একমত হই, সম্পর্কটা আগে থাকতেই স্বাভাবিক করে আনা দরকার।'

'আপনার কথা শুনে গা ছমছম করছে আমার।'

'এক্সকিউজ মি,' বলল রানা। 'আমি কি ভুল দেখলাম?'

'কি?'

'মনে হলো তুমি ঢোক গিললে?'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল আফরোজার। আবার ঢোক গিলল সে। বলল, 'না, ভুল দেখেননি।'

'গুড,' বলল রানা। মুখ টিপে হাসছে। 'গা ছম ছম করছে, তারমানে ভয় লাগছে তোমার, কিন্তু ঢোক গিলছ দেখে সেই সাথে এও বুঝতে পারছি, রোমাঞ্চও অনুভব করছ তুমি। লক্ষণটা ভাল। আমরা দু'জনেই খুব মজা করব। তাহলে রোববারে, কেমন? কোথায়, কখন?'

'মহম্মদপুর, তাজমহল রোডে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে,' বলল আফরোজা। 'টপ ফ্লোরে। নাম্বারটা লিখে নিন।'

ফ্ল্যাট বাড়ির নাম্বারটা টুকে নিল রানা।

'সন্ধ্যা সাতটায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করব আমি,' বলল আফরোজা। 'ওখান থেকে কোথাও গিয়ে ডিনার খাওয়া যাবে।'

'তুমি একা থাকবে তো?'

'আমার মন-মর্জি বোঝবার কোন চেষ্টাই আপনি করবেন না, সেটাই কি ধরে নেব আমি?'

'নিজের নিয়ম কখনও ভাঙি না আমি,' বলল রানা। 'তুমি একা থাকবে তো?'

রহস্যময় হাসি হাসছে আফরোজা। 'মুড যদি ভাল থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক। এসব ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ একটু থেকেই যায়।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে এসে বিল নিয়ে গেল বারম্যান।

'পরিচয় হবার পর থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা, তাই না?' মুচকি হেসে বলল ও। 'তুমি কি সবার ফাঁদেই এত সহজে পা দাও?'

'কে কার ফাঁদে পা দিচ্ছে তা আপনি বুঝলেন কিভাবে?' হাসছে আফরোজা।
'তাই তো!' কৃত্রিম দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ ফুটল রানার। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। এতক্ষণে সরাসরি তাকাল আফরোজার গলার দিকে। সাদা জেড রিংটা দেখছে। ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তার ছাপ মুছে গেছে চেহারা থেকে। 'আরে, কি ওটা?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল ও। 'কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে! ধনুর্বিদের বুড়ো আঙুলের আংটি না এটা? চীনাদের তৈরি। এ-জিনিস তুমি কোথায় পেলে?' তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী চোখে আফরোজাকে লক্ষ্য করছে রানা।
'আপনি দেখছি সাংঘাতিক চালাক। সব ব্যাপারেই খবর রাখেন, তাই না? ঠিক ধরেছেন, এটা একজন ধনুর্বিদের বুড়ো আঙুলের আংটিই বটে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কিভাবে?' অকপট বিস্ময় ফুটে উঠল আফরোজার চোখে।
'বিদেশী কোন মিউজিয়ামে দেখেছি হয়তো,' বলল রানা। কথাটা শুনে আফরোজা যদি নিরাশ হয়েও থাকে, মুখ দেখে তা বোঝা গেল না। 'এটা কি জেনুইন? আমাকে একবার দেখতে দেবে?'
'নিন, দেখুন,' চেইনসহ রিংটা গলা থেকে খুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল আফরোজা। 'কয়েক জেনারেশন ধরে আমাদের পরিবারে রয়েছে এটা।'
হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিতে যাবে রানা, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে একটা হাত এগিয়ে এসে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল সেটা। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।
'আরে, ফখরুল তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আফরোজা। 'তোমাকে আমি দেখতেই পাইনি। কখন এসেছ?' চোখ নামিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'এর কথাই বলছিলাম আপনাকে, আমার ভাই ফখরুল আনসারী।' ভাইয়ের দিকে তাকাল আবার। 'ফখরুল, ইনি মি. মাসুদ রানা, আমাদের ক্লাবের নতুন সদস্য।' তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল সে। 'মি. রানা বলছেন, তিনি একজন শিকারী।'

আফরোজার পুরুষ সংস্করণ বলা যেতে পারে ফখরুলকে। মুখের কাটিংয়ে কোন পার্থক্য নেই। গায়ের রংটাও এক। বোনের মত চোখের মণি দুটো মিশমিশে কালো। গড়নটা একহারা, শরীরে মেদ নেই। ঠোঁট জোড়া পাতলা, চোখ দুটো স্বচ্ছ। চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট। তবে একটা একগুঁয়ে ভাবও দৃষ্টি এড়াল না রানার। একজন মেজাজী পরিকল্পনাবিদের চেহারা। অথবা একজন ফ্যানাটিকের।
'শিকারী?' ঘুরে রানার সামনে, বোনের পাশে চলে এল ফখরুল। 'কি শিকার করেন আপনি, মি. রানা?' দু'চোখে কৌতূহল। 'ওহো, তার আগে জিজ্ঞেস করা উচিত, আপনাদের দলে ভিড়তে পারি আমি, মি. রানা?' কথা বলার ফাঁকে জেড রিংটা নিজের পকেটে ভরে রাখল সে।
'অবশ্যই,' বলল রানা। 'আপনার জন্যে কি আনাব বলুন? হুইস্কি?' ফখরুল মাথা কাত করল দেখে ইঙ্গিতে বারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুইস্কি আনতে বলল রানা। তারপর আবার ফখরুলের দিকে তাকাল। 'আফরোজা বলছিল, আজ আপনাদের জন্মদিন।'
মাথা ঝাঁকাল ফখরুল। বোনের পাশে একটা চেয়ারে বসল সে। 'কি শিকার

করেন তা তো আপনি বললেন না?'

'যেখানে টাকা সেখানেই আমি,' বলেই হাসল রানা। 'সংক্ষেপে, আমি একজন টাকা শিকারী। যে-কোন কাজ যে-কেউ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে, যদি টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে আমাকে। এরই মধ্যে বিশেষ একটা ক্ষেত্রে যথেষ্ট নাম কিনেছি আমি, কাজ নিয়ে লোকজন আমার কাছে আসতে শুরু করেছে।'

'নাম কিনেছেন?' ফখরুলকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'কি ধরনের নাম কিনেছেন, মি. রানা?'

'নাম কিনেছি বললে ভুল বলা হয়, বলা উচিত কুখ্যাতি অর্জন করেছি।'

'আচ্ছা! তাই নাকি? এবং এই কুখ্যাতি নিয়ে আপনি গর্ব অনুভব করেন?'

'কি অনুভব করি সেটা বড় কথা নয়,' বলল রানা। 'এই কুখ্যাতির বদৌলতে দেদার কাজ পাচ্ছি হাতে, সেই সাথে টাকা। বলতে পারেন কুখ্যাতিটাই আমার পুঁজি।'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার! কিছু মনে করবেন না, ভীষণ কৌতূহল বোধ করছি আমি। এই কুখ্যাতি আপনি কিভাবে অর্জন করলেন, বলবেন কি?'

'এত খবর জেনে তোমার দরকার কি?' বাধা দিয়ে বলল আফরোজা। ভুরু কুঁচকে উঠেছে তার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ফখরুলের আগ্রহটাকে ভাল চোখে দেখছে না সে। 'ব্যাপারটা কি, ফখরুল? এইমাত্র পরিচয় তোমার সাথে, মি. রানাকে জেরা না করলেই কি নয়?'

হেসে উঠল রানা। 'আমি কিন্তু কিছুই মনে করছি না। নিজের পাবলিসিটি করার একটা সুযোগ পাচ্ছি, আমার জন্যে সেটাও লাভ।'

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল ফখরুল, ইঙ্গিতে চুপ করে থাকতে বলল বোনকে। তারপর রানার দিকে ফিরল। বলল, 'তাহলে বলুন, মি. রানা। আমি আপনার সম্পর্কে জানতে চাই।'

'লোকে বলে, ঝুঁকি নিতে ভালবাসি আমি, নীতির কোন বালাই নেই আমার, সুযোগ পেলে সরকারকে একহাত দেখিয়ে দিতেও ছাড়ব না।' এখন আর হাসছে না রানা। গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। 'ওদের এই সব অভিযোগ আমি অস্বীকার করি না। হ্যাঁ, সরকারের বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা আছে। এটা একটা ওপেন সিক্রেট, তাই গোপন করে রাখার কোন চেষ্টা করি না।'

'সরকারের ওপর আপনি খেপে আছেন—কারণ?'

'আমার নাম মাসুদ রানা, নামটা শুনেও কিছু বুঝতে পারছেন না?' জানতে চাইল রানা।

'আরে, তাই তো! তার মানে আপনি রানা এজেন্সীর ডিরেক্টর?'

'ছিলাম। এখন একজন কুখ্যাত গুণ্ডা। ডিউক।'

'মাই গড!' বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেল ফখরুলের। 'ডিউক আর রানা, আপনারা তাহলে একই ব্যক্তি?'

নিঃশব্দে উপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

'রানা এজেন্সী বন্ধ হয়ে গেল কেন?' দ্রুত জানতে চাইল ফখরুল।

'জানি না,' অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে রানাকে। 'প্লীজ, এ-ব্যাপারে আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। তার কারণ, এ-ব্যাপারে সবাই যা জানে আমি তার চেয়ে বেশি কিছু জানি না। খবরের কাগজে সরকারী নির্দেশটা ছাপা হয়েছিল, নিশ্চয়ই পড়েছেন, তাই না? আমিও ওই খবরটা পড়ে জানতে পারি, হঠাৎ রাতারাতি আমার ব্যবসাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেক চেষ্টা-তদ্বির করেছি, অনেক হোমরা-চোমরাদের বাড়িতে গিয়ে তোষামোদ করেছি, ফল অষ্টরম্ভা।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ফখরুল। বলল, 'কিন্তু এ অন্যায়! সরকার কোন কারণ ছাড়াই একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এভাবে বন্ধ করে দিতে পারে না।'

'কারণ নেই তা কে বলল? পুলিস যেখানে ব্যর্থ হয়, রানা এজেন্সী সেখানে সফল হয়—এটা কারণ নয়? স্রেফ বুদ্ধির জোরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাচ্ছি আমি, এটা কারণ নয়? সরকারী অফিসারদের দুর্নীতি প্রকাশ করে দিচ্ছি, এটা কারণ নয়?'

'বুঝেছি! তার মানে আপনি ঈর্ষা আর প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন।' সবজান্তার মত মাথা নাড়ল ফখরুল।

একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'আপনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি, মি. রানা,' বলল ফখরুল। 'আপনার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা হয় না। কিন্তু আরেক দিক থেকে বিচার করতে গেলে, এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। আমাদের সমাজটা তো এভাবেই চলছে। এর একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। আপনি কি মনে করেন?'

'সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় নামতে আমি রাজী নই,' বলল রানা। 'অত ধৈর্য নেই আমার। সে ইচ্ছেও নেই। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। তবে, আমার প্রতিশোধ নেবার ধরনটা আলাদা। খুব তাড়াতাড়ি অনেক টাকা কামাতে চাই আমি। এবং যত বেশি সম্ভব ক্ষতি করতে চাই। তা করার ক্ষমতাও আমার আছে।'

'আই সি!' রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল ফখরুল। তারপর মানিব্যাগ বের করে খুলল সেটা। ভেতর থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'এটা আমার ব্যবসার ঠিকানা। সময় করে একদিন যোগাযোগ করুন। আমার বিশ্বাস, পরস্পরের কাজে লাগতে পারব আমরা।'

কপালে ভুরু তুলল রানা। 'তাই? কিভাবে?'

'সেটা আলোচনা করতে হবে,' উজ্জ্বল একমুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ফখরুলের চেহারা। 'এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি আপনাকে, সময়টা আপনার নষ্ট হবে না। প্রায়ই আমার হাতে এমন কিছু কাজ থাকে, যেগুলো করার জন্যে আপনার মত লোক দরকার হয় আমার।'

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বলল রানা। 'আমি যে ধরনের কাজ করি তার সাথে ট্রাভেল এজেন্সীর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলে তো মনে হয় না।'

'তবু আপনার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, আমার সাথে আলোচনা করলে আপনি লাভবান হবেন।'

'কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,' হাসিমুখে বলল রানা, 'সাধারণ

কাজ আমি করি না। যে কাজ করতে আর সবাই ভয় পায়, আমি সেই কাজের ব্যাপারে আগ্রহী। ওই সব কাজেই অঢেল টাকা কামানো যায়।'

'এমন কি সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। তারপর ভিজিটিং কার্ডটা হাতে নিয়ে ওয়েস্টকোটের পকেটে ভরে রাখল। চেহারায় একটা ঢিলেঢালা, নিরুৎসাহ ভাব ফুটে উঠেছে ওর।

'এক মিনিটের জন্যে মাফ করতে হবে আমাকে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফখরুল। 'হেড-ওয়েটারের সাথে একটা কথা আছে।' বোনের দিকে তাকাল সে। 'তুমি রেডি, আফরোজা?'

'তুমি যাও, আমি এই এলাম বলে,' বলল আফরোজা।

রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ফখরুল। 'আপনার সাথে আলাপ করার জন্যে আমি কিন্তু অপেক্ষা করব। আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'সময় হলেই দেখা করব আমি।' কথা রাখার ইচ্ছে না থাকলে মানুষ যে সুরে কথা বলে রানাও সেই সুরে বলল কথাটা।

চলে গেল ফখরুল। সাথে সাথে রাগে প্রায় ফেটে পড়ল আফরোজা। 'ইউ ফুল! ফখরুলের সাথে নিজেকে জড়ানো কোন মতেই উচিত হবে না আপনার। ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। প্লীজ, কোন প্রশ্ন করবেন না। কিন্তু দোহাই আপনার,' আফরোজার চোখেমুখে আকুল আবেদন ফুটে উঠল, 'আপনি ওর সাথে দেখা করবেন না। ওর কাছে পর্যন্ত ঘেঁষবেন না আপনি।'

অবাক হবার ভান করে তাকিয়ে আছে রানা। 'কিন্তু কেন? তোমার ভাই আমার উপকার করতে চাইছে, এতে তো তোমার খুশি হবার কথা।'

'আপনি কি সত্যি এত বোকা? ও আপনাকে ব্যবহার করতে চাইছে, তাও বুঝতে পারছেন না?' রাগে লাল হয়ে উঠেছে আফরোজার চেহারা। 'আমার জানাশোনা লোকজনকে ব্যবহার করবে ও, এ আমি হতে দিতে পারি না। অসম্ভব!'

আফরোজার হাতে ধীরে ধীরে কয়েকটা চাপড় মারল রানা। 'চিন্তা করো না, আফরোজা। আজ পর্যন্ত আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ আমাকে ব্যবহার করতে পারেনি। সে চেষ্টা যে করেছে, পস্তাতে হয়েছে তাকে।' একটা সিগারেট ধরাল ও। 'এবার আমাকে যেতে হয়। রোববারের কথা মনে আছে তো?'

'প্লীজ, ওর অফিসে আপনি যাবেন না,' বলল আফরোজা। এখন শুধু রাগ নয়, সেই সাথে তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

'যাব না। যাবার কোন ইচ্ছেই নেই আমার,' বলল রানা। হাসছে ও। 'আর শোনো, তুমি কিন্তু কড়া পাহারা দিয়ে রেখো তোমার মুডটাকে। রোববার পর্যন্ত ওটা যেন বিগড়ে না যায়। ভাল কথা, একটা কথা এর আগে কেউ তোমাকে বলেছে কি?'

'কি কথা?' ভুরু কুঁচকে উঠল আফরোজার।

'তুমি সুন্দরী।'

'তুমি বাজে, শয়তান লোক,' বলে আর দাঁড়াল না আফরোজা। ঘুরে দাঁড়িয়ে

হন হন করে চলে গেল।

গুন গুন করতে করতে ট্যুরিস্টস ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্রথম রাতেই যথেষ্ট কাজ হাসিল করা গেছে।

গাড়িতে উঠছে রানা, এই সময় পার্কিং এরিয়ার শেষ প্রান্তে আরেকটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল না ও, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। ধীরে ধীরে ক্লাবের চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ড্যাশবোর্ড ক্লকের কাঁটার দিকে তাকাল রানা। দশটা পঁয়তাল্লিশ। বাঁক নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল ও। স্পীড বাড়িয়ে দিল এবার।

ফাঁকা, প্রায় নির্জন রাস্তা। পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পীডে বায়তুল মোকাররমকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। সামনে তোপখানা, বাঁক নিতে হবে, স্পীড কমিয়ে আনল বেশ একটু। পিছনে দুটো হলুদ হেডলাইট। ফিয়াটের দেখাদেখি পিছনের গাড়ির ড্রাইভারও স্পীড কমাচ্ছে। বাঁক নিয়ে মালিবাগের দিকে যাচ্ছে রানা। ভিউমিররে চোখ। পিছনের গাড়িটা বাঁক নিচ্ছে। দু'জন লোক বসে রয়েছে, দেখতে পেল ও। কর্নেল শফি বলেছিলেন, ওরা তোমাকে অনুসরণ করবে। সময় নষ্ট না করে ঠিক তাই করছে ওরা। গাড়িটাকে খসাবার কোন চেষ্টাই করছে না ও। সম্ভবত ওর আস্তানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায় ওরা। জানতে চায়, আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই ওর আছে কিনা। ফ্ল্যাটটা দেখে যাবে, যাক। সে-ও চায় ওরা জানুক কোথায় তাকে পাওয়া যাবে।

গলির ভেতর ঢুকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ফিয়াট। পিছনের গাড়িটা এখনও বাঁক নেয়নি, তবে ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। গেটটা খোলাই থাকে সব সময়, গাড়ি নিয়ে সোজা উঠনে ঢুকে পড়ল ও। গ্যারেজের সামনে ব্রেক কষে থামল।

উঠনটা বেশ বড়। খানিকটা জায়গা নিয়ে বাগান করা হয়েছে, এদিক সেদিক দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা পেয়ারা, আম, আর নারকেল গাছ। পাশের একটা অফিস বিল্ডিং-এর গেটের মাথা থেকে খানিকটা আলো এসে পড়েছে উঠনে, তাতে অন্ধকার দূর হয়নি, আরও বরং ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে বেশিরভাগ জায়গা। গাড়ি থেকে নামল রানা। দ্বিতীয় গাড়িটার কোন সাড়া শব্দ নেই। সম্ভবত গলির মুখে সেটাকে রেখে পায়ে হেঁটে আসছে ওরা।

এদিকটায় আলো নেই। গ্যারেজের সামনে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কোনও শব্দ নেই। পকেট থেকে গ্যারেজের চাবি বের করে তালায় ঢোকাতে যাবে, এই সময় চোখের কোণে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া ধরা পড়ল। হাত দশেক দূরে বাগানটা, সেদিক থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে।

আলোটার ওপর এসে দাঁড়াল সে। মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। কালচে সবুজ কাপড়ে ঢাকা একটা শরীর। মূর্তিটা আরও একটু এগিয়ে এল। মুখের নিচে, গলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আলোয়। একটা মেয়ে। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ।

'হ্যালো, ডারলিং?' আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনে প্রায় চমকে উঠল রানা। 'দুষ্টু একটা মেয়ে চাও?'

বেশ লম্বা মেয়েটা। শরীরের বাঁধনটা অস্বাভাবিক ভাল। মুখে আলো পড়েনি, কিন্তু আলোর আভায় যতটুকু দেখা যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার, পুরু মেকআপের আড়ালে মুখের আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে।

পোষা কুকুর আদর পাবার আশায় এগিয়ে এলে প্রভু যেমন নিঃশব্দে হাসে, রানাও তেমনি হাসল একটু। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল একটা, খুলে গেল সেটা। মেয়েটার দিকে তাকাল আরেকবার। 'না, চাই না,' মৃদু গলায় বলল ও। 'এত জায়গা থাকতে এখানে কি করতে এসেছ?'

মৃদু একটু কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'তোমার মত স্বাস্থ্যবান, নিঃসঙ্গ ছেলের খোঁজে,' বলল সে। আরও এগিয়ে আসছে। কিন্তু অতি সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেল আলোটাকে, ফলে মুখে না পড়ে আলোটা পড়ল কাঁধে, কাঁধ থেকে নেমে গেল পিছন দিকে। মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছে রানা। সেন্ট মেখেছে মেয়েটা। বেশ ভালই লাগছে গন্ধটা। 'এসো না একটু মজা করা যাক, ডারলিং? খুব বেশি কিছু দিতে হবে না। পঞ্চাশ। সন্তুষ্ট না হলে পয়সা ফেরত।'

গ্যারেজের দরজা খুলে ফেলেছে রানা। 'আজ নয়। খামোকা সময় নষ্ট করছ তুমি,' বলল রানা। গাড়িতে উঠে বসল ও।

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে গাড়ি নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ল সে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে বেরিয়ে এল আবার। তালাটা বন্ধ করার সময় ঘাড় ফিরিয়ে গেটের দিকে তাকাল একবার। রাস্তাটা অন্ধকার। কি যেন নড়ে উঠল গেটের পাশে। আবার এগিয়ে আসছে মেয়েটা।

'ভেব না আজেবাজে জিনিস,' বলল সে। 'এ একেবারে খাঁটি সোনা। হাতের লক্ষ্মী ঠেলে দিতে নেই। ঠিক আছে, না হয় পরীক্ষা করে দেখো, পছন্দ না হলে চড় মেরে বিদায় করে দিয়ো। কি?' একটু বিরতি নিল মেয়েটা, তারপর বলল, 'এত কথা বলছি, কারণ—কিছু টাকা চাই আমার।'

হেসে উঠল রানা। ফিসফিস করে বলল, 'মাই গড! কর্নেলের কি মাথা খারাপ হয়েছে?' তারপর আবার হাসল ও, এবার আরেকটু জোরে। 'সব মেয়েই তো এই কথা বলে। কিছু টাকা চাই আমার। টাকা থাকলে তবে তো দেব?' এক পা এগোল ও, তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে মেয়েটা। ধ্বক করে উঠল বুক। 'সর্বনাশ! রূপা!'

'কি?' চোখ দুটো নাচছে রূপার। 'করবে পরীক্ষা?'

'পঞ্চাশ নয়,' বলল রানা। 'পছন্দ হলে তিরিশ। আর পছন্দ না হলে কষে এক চড়। রাজী?'

'তিরিশ? বড় কম হয়ে যায়,' ম্লান স্বরে বলল রূপা। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। রাজী।'

'দাঁড়াও, ঘরে নিয়ে যাবার আগে এখানেই তোমাকে আমি দেখে নিতে চাই,' এগিয়ে এসে রূপার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'সাবধান! দু'জন লোক দেখেছে আমাদেরকে।'

'এখানে কি? ঘরে চলো, আলোতে…'

এবার দুটো হাত ব্যবহার করছে রানা। এক ঢিলে দুই পাখি মারছে ও।

অনুসরণকারীদেরকে দেখাচ্ছে সস্তা একটা কলগার্লের সাথে দরাদরি করছে, আর লোহার মত কঠিন চরিত্রের দেমাকী মেয়ে রূপাকে চুমো খাচ্ছে। এ সুযোগ আর কখনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে বুকের মধ্যে টেনে আনল রানা। তারপর মুখ নামিয়ে চুমো খেল। একবার, তারপর আরেকবার।

আলিঙ্গনের ভেতর কোমল শরীরটা মোচড় খাচ্ছে রূপার। সুযোগটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না বুঝতে পেরে ছেড়ে দিল তাকে রানা। 'জিনিস তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'তুমিই জিতলে। এসো তাহলে।' রূপার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল ও। তারপর চাপা গলায় জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কি? সব জানাজানি হয়ে গেছে নাকি?'

'কিছুই জানাজানি হয়নি,' রূপাও চাপা গলায় উত্তর দিল। 'কর্নেল শফি আমার মামা...'

'সে কি!'

'অনেক দেন-দরবার করে একটা চাকরি নিয়েছি...প্রায় মাসখানেক আগে।'

'কিন্তু তোমাকে তিনি এই রকম একটা...।'

'এখন উনি আমার মামা নন, বস্। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, এতে আমার কোন হাত ছিল না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সিঁড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সেটা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তারের জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দায়। পকেট থেকে চাবি বের করে ঘরের তালা খুলল ও। ভেতরে ঢুকে আলোর সুইচ অন করে বলল, 'এসো।'

ধীর পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রূপা। কপালে চিন্তার রেখা। অন্যদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'শোনো।' তারপর তাকাল রানার দিকে।

দ্রুত এগিয়ে এসে রূপার সামনে দাঁড়াল রানা। 'কি ব্যাপার, রূপা?' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল রূপার একটা হাতে। কিভাবে কি হলো কিছুই বুঝতে পারল না রানা। কান ফাটানো চটাস করে একটা আওয়াজ হলো, সাথে সাথে চোখে অন্ধকার দেখল ও। একটা হাত উঠে গেছে গালের একপাশে। চোখে পানি এসে গেছে ওর।

'এটা তোমার অতি চালাকির শাস্তি,' ফিস ফিস করে বলল রূপা। 'পেশাগত দুর্বলতার সুযোগ আর কখনও নিতে চেষ্টা করো না। মনে থাকবে?'

শার্টের আস্তিনে চোখ মুছছে রানা। এখনও হুহু করে জ্বালা করছে গালটা। নিঃশব্দে উপর-নিচে মাথা নাড়ল ও। পর মুহূর্তে উদ্বেগ ফুটে উঠল চেহারায়। 'কিন্তু চড়ের শব্দ শুনে ওরা কি ভাবছে বলো তো?'

'ভাবছে, হয় তুমি একটা স্যাডিস্ট ক্যারেক্টার, না হয় ভাবছে আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি,' চাপা গলায় বলল রূপা।

'তাহলে তো এখন তোমার চলে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি যাচ্ছি না, কারণ, এখনও আমি হাল ছাড়িনি। ওরা ধরে নেবে আমি তোমার মন গলাবার চেষ্টা করছি আর তুমি আমাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচো। আমার কথা বুঝতে পারছ? আমি হাজার অনুরোধ করলেও তুমি আমাকে পছন্দ করবে না। তার মানে, তোমার চালাকির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।'

মুখে এখনও হাত বুলাচ্ছে রানা, তাই দেখে ম্লান একটু হাসল রূপা। 'বুঝতে পারিনি, শাস্তিটা খুব জোরে হয়ে গেছে। সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'আমি অন্য কথা ভাবছি,' মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলল রানা। মুচকি একটু হাসল ও।

'কি কথা?'

'আমাকে এভাবে খেপিয়ে দেয়া কি তোমার উচিত হলো?'

'তার মানে?'

'ধরো, আমি যদি প্রতিশোধ নিই?' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'এখন যদি রেপ করি তোমাকে? বাইরে দু'জন লোক রয়েছে, ভুলে যেয়ো না। ওদের কাছে তোমার পরিচয় তুমি একটা কলগার্ল। সেই পরিচয়েই স্টিক করতে হবে তোমাকে, তাই না? গায়ের জোরেও তুমি আমার সাথে পারবে না। সুতরাং প্রতিশোধ নিতে বাধা কোথায় আমার?'

মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল রূপার চেহারা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়!'

'ভয় পেয়ো না,' হেসে উঠল রানা। 'তেমন কোন ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু এখন যেটা স্বাভাবিক সেটাই করা উচিত আমাদের।'

কোন্‌টা স্বাভাবিক?'

'কাপড় চোপড় খুলে বিছানায় যাওয়া।' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল রানা।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রূপা। দরজার দিকে এগোচ্ছে।

'কি হলো?' আঁতকে উঠল রানা।

উত্তর দিল না রূপা। দরজার কাছে, সুইচবোর্ডের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কাপড়-চোপড় খুলে বিছানায় যাওয়ার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়া,' কথা শেষ করেই হাত তুলে আলোর সুইচটা অফ করে দিল সে। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই দ্রুত এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল। 'আমরা কি করছি না করছি তা ওরা উঁকি দিলেও দেখতে পাবে না।' রানাকে ঠেলতে ঠেলতে বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'বিছানাতেই যাচ্ছি আমরা, তবে শুতে নয়। বসে বসে কাজের কথা হবে।'

রানার হাঁটুর পিছনটা খাটের কিনারায় ধাক্কা খেল, বসে পড়ল ও। ওর পাশে বসল রূপাও। 'দয়া করে হাত দুটোকে শাসনে রেখো,' সাবধান করে দিয়ে আবার বলল রূপা। 'আর রেপ করার কথা যা বলছিলে, ওসব একেবারে ভুলে যাও। মনে

রেখো, অন্ধকারে তোমার আমার দু'জনের শক্তিই সমান। একই ট্রেনিং পেয়েছি আমরা। আমরা যদি লড়তে শুরু করি, ফলাফল কি হবে তা তোমার ভাল করেই জানা আছে।'

'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান,' মন্তব্য করল রানা।

'ঠিক তাই,' অন্ধকারে হাসল রূপা। 'এবার বলো, কত দূর এগিয়েছ?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে অনেক দূর এগোবার কথা ছিল আমার? এই তো সবে হাতে নিলাম কাজটা, এখুনি কি?'

'কোন সুবিধে করতে পারোনি বুঝি? বেশ তো, মুখ ফুটে সে কথাটা বললেই তো পারো। আমাকে আবার গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে কিনা।'

'ফেরার সময় সাবধান,' বলল রানা। 'ক্লাব থেকে অনুসরণ করে দু'জন লোক এসেছে, বাইরে ঘুর ঘুর করছে ওরা।'

'কাকরাইলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি আমি,' বলল রূপা। 'সব দিক ভেবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাকে অনুসরণ করলে ওরা আবিষ্কার করবে আমাকে দেখে যা মনে হয়েছে আমি ঠিক তাই। আজ রাত বারোটার পর একটা ছেলে ওখানে আমার কাছে আসবে। তোমার কাছ থেকে যা শুনব, তাকে বললেই সে গিয়ে সব জানিয়ে দেবে মামা...কর্নেলকে।'

'গুড,' বলল রানা। 'অন্তত এ-ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা আছে আমার কর্নেলের ওপর। কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা তিনি জানেন।'

'এত রকম সতর্কতা অবলম্বনের পরও কর্নেলকে খুব উদ্বিগ্ন দেখলাম,' বলল রূপা। 'তার কারণও আছে। একদল ফ্যানাটিকের সাথে একজোট হয়েছে দুনিয়ার সেরা ক'জন ধনী কুকুর। ভয়ঙ্কর একটা শক্তি। আজ রাতে কি ঘটল ওখানে?'

'ঘটেছে অনেক কিছু,' বলল রানা। 'মেজর আতিকের কিছু দুর্বলতার কথা জানা ছিল আমার, সেই সুযোগ নিয়ে ক্লাবের সদস্য হয়েছি। মেম্বারশিপ কার্ডটা পূরণ করছে মেজর, এই সময় একটা মেয়ে ঢুকল কামরায়। তার গলায় সোনার একটা চেইন, তার সাথে লকেটের বদলে রয়েছে সাদা জেড পাথরের একটা আংটি। নাম, আফরোজা খানম। ইউনিভার্সিটির শেষ পর্বের ছাত্রী, ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে পড়ছে। কিছুদিন মডেলিঙের কাজও নাকি করেছিল। মহম্মদপুর তাজমহল রোডে একটা ফ্ল্যাট আছে। নাম্বারটা লিখে নেবে?'

'বলো, মনে থাকবে আমার,' বলল রূপা।

আফরোজার ফ্ল্যাট নাম্বারটা বলল রানা। 'মেজর আতিকের ইচ্ছে ছিল না মেয়েটার সাথে আমার পরিচয় হোক, কিন্তু মেয়েটা কৌশলে পরিচয় করিয়ে দিতে বাধ্য করে তাকে। এরপর অনেকক্ষণ একসাথে ছিলাম আমরা। লোভনীয় অনেক আভাস দিয়েছে আমাকে ও। মূডটা খুব ভাল ছিল। আবার আমাদের দেখা হচ্ছে,' অন্ধকারে হাসছে রানা। 'রোববারে। সন্ধ্যা সাতটায়। ওর ফ্ল্যাটে।'

'তার মানে টোপ গিলেছে ওরা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রূপা।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের বড় একটা ভাই আছে ওর। ফখরুল আনসারী। বেটার-ট্রাভেলস এর ডিরেক্টর। ফার্মগেটের

কোথাও। পরিচয় হতে না হতেই তার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে। তার অফিসে যেতে বলেছে, প্রস্তাবটার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে। ফখরুল চলে যেতেই আফরোজা আমাকে বোকা ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে শুরু করে। আমি ওর ভাইয়ের সাথে নিজেকে জড়াব না, এ-ধরনের একটা কথা আদায় করার চেষ্টা করে আমার কাছ থেকে। ওরা দু'জনে একসাথে কাজ করছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারিনি। আংটির কথাটা জিজ্ঞেস করলাম ওকে, বলল, ওটা নাকি ওদের কাছে বংশ পরম্পরায় আছে। যাই হোক, আমার ধারণা, গোটা ব্যাপারটা সুন্দরভাবে সাজানো একটা ফাঁদ। কিন্তু একটা কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি—ট্যুরিস্টস ক্লাবে আমি যাচ্ছি তা ওরা আগে থেকে জানল কিভাবে? আমার জন্যে তৈরি হয়ে ছিল ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক হতে পারে, কানিজের বাড়িটার ওপর নজর রাখছিল ওরা, আমাকে ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের সাথে ঢুকতে বা বেরিয়ে আসতে দেখেছে। তার মানে, এদের ব্যাপারে খুব বেশি দূর এগোতে পারব না আমি।'

'হয়তো তাই, ইন্সপেক্টরের সাথেই দেখেছে তোমাকে,' বলল রূপা। 'তারপর ফ্লোর ম্যানেজার জিয়া তোমাকে দেখেই ফখরুলকে খবর দেয়, ফখরুল তার বোনকে পাঠায় তোমার সাথে পরিচিত হবার জন্যে।'

'তা যদি হয়,' বলল রানা। 'জিয়াও এর সাথে জড়িত।'

'আমি মেজর আতিকের কথা ভাবছি। সে-ও কি এর সাথে জড়িত?'

শ্রাগ করল রানা। 'জানি না। হতে পারে, কিন্তু আবার মনে হচ্ছে, মেজরের নার্ভ কি অতটা শক্ত? যাই হোক, আফরোজা আর ফখরুলের ব্যাকগ্রাউণ্ড খুঁজে বের করতে বলবে তুমি কর্নেলকে। আরও আছে। বেটার-ট্রাভেলস, মেজর আতিক আর জিয়া সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিতে হবে।'

'তোমার পরবর্তী কাজ কি হবে?'

'এই মুহূর্তে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ।'

'তোমার দিকে হাত বাড়ানো,' অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসছে রানা।

'চড়টা জোরে মারা হয়ে গেছে মনে করে দুঃখ হচ্ছিল আমার,' বলল রূপা। 'এখন দেখছি, তা নয়, আরও জোরে মারা উচিত ছিল। কাজের কথার মাঝখানে ফের যদি...'

'রোববার পর্যন্ত আমার কোন কাজ নেই,' বলল রানা। 'সেদিন কি ঘটে তার ওপর নির্ভর করছে সব। চালে ভুল করতে আমি রাজী নই, ফখরুলের সাথে তাই দেখা করছি না। ওকে আমি বোঝাতে চাই, আমার সার্ভিস পাওয়া সহজ নয়।'

'হ্যাঁ,' গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল রানা, খাট থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছে রূপা। তারপর জ্বলে উঠল আলো, 'তোমার সাথে আবার আমার দেখা হচ্ছে মঙ্গলবারে। এর মধ্যে জরুরী কিছু জানাবার থাকলে, ফোন করবে।' একটা কাগজে খস খস করে নাম্বারটা লিখল সে। 'ওরা তোমার লাইন ট্যাপ করতে পারে, কাজেই ফোনে সোজা এখানে আসতে বলে দেবে আমাকে। কাকরাইল এখান

থেকে খুব বেশি দূরে নয়, সাথে সাথে চলে আসতে পারব আমি।' ঘুরে দাঁড়াল রূপা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

রূপার পিছু পিছু সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এল রানা। নিচু গলায় বলল, 'নিচে নেমে তোমাকে হয়তো চুমো খেতে হবে আমার। চড় মারার জন্যে তুমি কি আবার ওপরে উঠে আসবে?'

'কেউ আমার সাথে চালাকি করছে না, আমিও কাউকে চড় মারছি না,' সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে নামতে বলল রূপা।

'কিন্তু, রূপা, ওদেরকে বিশ্বাস করানো দরকার...'

'অন্ধকার ঘর দেখেই যা বিশ্বাস করার করে নিয়েছে ওরা,' বলল রূপা। তারপর গলায় জোর টেনে বলল, 'আবার দেখা হবে, ডারলিং। এরপর কিন্তু একশো করে দিতে হবে আমাকে।'

ছয়

ক্লাব থেকে যারা অনুসরণ করেছিল তারা আর পিছু ছাড়ছে না রানার। যেখানেই যাচ্ছে ও, এক জোড়া ছায়ার মত সেখানেই দেখা যাচ্ছে ওদেরকে। ঝানু, অত্যন্ত দক্ষ লোক এরা। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিন দু'জনের কাউকে দেখতে পায়নি রানা। দেখতে না পেলেও, পরিষ্কার অনুভব করছে, ছায়ার মত সারাক্ষণ পিছু লেগে আছে ওরা। দ্বিতীয় দিন পলকের জন্যে মাত্র একবার দেখেছে ওদেরকে।

প্রথম লোকটা বেঁটে। গায়ের রঙ বাদামী। ঘাড়টা ষাঁড়ের মত। চ্যাপ্টা মুখ। অপর লোকটা লম্বা, একহারা, গর্তে ঢোকা চোখ দুটো চকচকে। মুখটা সরু, ছুঁচোর মত। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। সব সময় সিগারেট আছে হাতে, আর প্রতি মুহূর্তে ছাই ঝাড়ছে।

ওদের নাম রেখেছে রানা—শিম্পাঞ্জী আর হনুমান।

দেখেই বুঝে নিয়েছে সে, বিপজ্জনক লোক এরা। জাত-খুনে। ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে দু'জনের স্নায়ু। শিম্পাঞ্জী, বেঁটেটা, অবিরাম চোখ পিট পিট করছে আর শরীর মোচড়াচ্ছে। আর হনুমান তার লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে উরু মাপছে, বিরতি না দিয়ে কিলবিল করছে আঙুলগুলো। ক্রেপ সোলের জুতো পরে আছে ওরা, বিড়ালের মত নিঃশব্দে হাঁটে। চোখগুলো যেন কাঁচের দু'জোড়া টুকরো—ঠাণ্ডা, অমানবিক।

ওদের কথা ভাবলে অস্বস্তি বোধ করে রানা। এ-ধরনের লোককে খুব বেশি সুযোগ দিতে নেই, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মাটির ওপর থেকে হটিয়ে দিতে হয়। তা নাহলে ওরাই তোমাকে খতম করে দেবে। সামনে শিকার থাকলে এরা ধৈর্য ধরতে পারে না। কিন্তু এখনও এমন কিছু ঘটেনি, তাই হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ওর। বাধ্য হয়েই শিম্পাঞ্জী আর হনুমানকে সুযোগ দিয়ে রাখতে হচ্ছে। হবেও। যতই সতর্কতা অবলম্বন করুক, সে যে এখন ওদের হাতের

খেলনা, পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। যদি চায়, অনায়াসে ওরা মেরে ফেলতে পারে ওকে। এবং ও মারা গেলে কর্নেল শফির কিছুই এসে যাবে না। কে জানে, কর্নেল হয়তো ওকে খরচের খাতায় টুকে রেখেছেন। কর্মীদের প্রতি ব্যক্তিগত দুর্বলতা নেই তাঁর। তাঁর কাছে দেশের স্বার্থটা সবার আগে। মনে পড়ে, কর্নেল একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, 'আরেকজন এজেন্ট সব সময় যোগাড় করতে পারবে তুমি। কিন্তু আরেকটা বাংলাদেশ যোগাড় করতে পারবে না।'

ওর ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের একটা তিন তলা ফ্ল্যাটে আস্তানা গেড়েছে ওরা দুজন। কে জানে কিভাবে দখল করেছে ফ্ল্যাটটা। দুদিন আগেও একজন বুক-বাইণ্ডারের কারখানা ছিল ওটা। এখন বাড়িটার সামনে ছোট একটা বোর্ড ঝুলছে, তাতে পেন্সিল দিয়ে লেখা, বুক বাইণ্ডারের কারখানা অমুক নম্বর বাড়িতে উঠে গেছে। গত দু'দিন থেকে দেখা যাচ্ছে ওই তিন তলার ফ্ল্যাটের তারের জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় চব্বিশ ঘন্টা ঘুর ঘুর করছে শিম্পাঞ্জী আর হনুমান।

ওখান থেকে অনায়াসে রানার ওপর নজর রাখছে ওরা। রানা এখন বুঝতে পারে, রূপাকে কলগার্ল হিসেবে কাজে নামিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন কর্নেল শফি। হপ্তায় একবার করে রূপার আসা-যাওয়া শিম্পাঞ্জী আর হনুমানের মনে কোনরকম সন্দেহের সৃষ্টি করবে না। রানার কাছ থেকে এই ধরনের আচরণই আশা করছে ওরা।

রূপার সাথে দেখা হবার পরদিন, সন্ধ্যার সময়, রানা আবিষ্কার করল ওর টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওর ফ্ল্যাটে ঢোকার জন্যেও চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক আগেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে কেউ যাতে ওর ফ্যাটে ঢুকতে না পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে রানা। প্রতিটি জানালায় চার ইঞ্চি পরপর লোহার বার রয়েছে। দরজা না ভেঙে কারও পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। বাছাই করা বিদেশী তালা, মাস্টার-কী দিয়েও খোলা যাবে না।

ওরা হয়তো ফ্ল্যাটে মাইক্রোফোন রোপণ করার চেষ্টা করবে। ভেতরে কেউ ঢুকতে পারেনি জানা সত্ত্বেও সাবধানের মার নেই ভেবে গোটা ফ্ল্যাটটা সার্চ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সিটিংরুমের ভেন্টিলেটার থেকে সার্চ শুরু করল ও, ওখানেই পেয়ে গেল মাইক্রোফোনটা। জিনিসটা ছোট, কিন্তু হাইলি সেনসিটিভ। রাতে কোন এক সময় নিশ্চয়ই ওদের কেউ ছাদে উঠেছিল, তারই কীর্তি এটা। মাইক্রোফোনটা ছুঁলো না রানা, একটা রেইনকোট দিয়ে শুধু ঢেকে দিল ভেন্টিলেটারটা।

পরবর্তী তিন দিন মন্থর গতিতে কেটে গেল। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই সারাক্ষণ পিছনে আছে দুজন, এটাই যা অস্বস্তিকর। কিন্তু এমন একটা ভাব সব সময় বজায় রাখল রানা, যেন ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা নেই তার। স্বাভাবিক দৈনন্দিন রুটিন নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে ও। রেস্তোরাঁয় বসে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের সাথে আড্ডা মারছে, দুপুরের পর বেরুচ্ছে কাজের সন্ধানে, আর বিকেলে কোন ক্লাবে গিয়ে বসছে মদ খাবার জন্যে। তারপর মাঝরাত কাবার করে দিয়ে ফিরে

আসছে নিজের ফ্ল্যাটে। এইভাবে দিন ক'টা কেটে গেল। তারপর এল রোববার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রানা।

রোববার সন্ধ্যা। দাড়ি কামিয়ে শাওয়ার নিল রানা। নতুন তৈরি করা সাফারী স্যুটটা পরে দাঁড়াল ছয় ফুট লম্বা আয়নার সামনে। চমৎকার ফিট করেছে স্যুটটা। একটু উঁচু হয়ে আছে কাঁধ দুটো। পোশাকের বাইরে থেকেও টের পাওয়া যায় মেদহীন পেশীর অস্তিত্ব। ক্লিনশেভ মুখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বুক ভরা দুর্জয় সাহস। মৃদু একটু হাসল সে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ও। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের জানালাগুলো অন্ধকার। সন্দেহ নেই, একজন অন্তত আছে ওখানে। নোংরা জালের ভেতর থেকে নজর রাখছে তার ওপর।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল রানা। ঠোঁটে সিগারেট, ড্রাইভ করছে এক হাতে। হোটেল ইন্টারকনের কাছে এসে শিম্পাঞ্জীকে দেখতে পেল ও। ডান পা-টা ফুটপাথে রেখে একটা মোটর সাইকেলের ওপর বসে আছে। তাকে পাশ কাটিয়ে এল ফিয়াট। সাথে সাথে পিছনে স্টার্ট নেবার শব্দ পেল রানা।

মহম্মদপুর। তাজমহল রোড। ঠিক সাতটা বাজে। ঠিকানা মিলিয়ে একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গেটটা খোলা, সামনেই দেখা যাচ্ছে চওড়া সিঁড়ি। স্টার্ট বন্ধ করে নিচে নামল ও। একটা সিগারেট ধরাল, এই ফাঁকে দেখে নিল, পঞ্চাশ গজ দূরে মোটর সাইকেল থামিয়ে সিগারেট ফুঁকছে শিম্পাঞ্জী।

গেট পেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল রানা। পিছন ফিরে একবার তাকাল গাড়িটার দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ির ধাপগুলো ঝকঝক করছে, কোথাও একটু ময়লা নেই। টপ ফ্লোরে উঠে এসে বুক ভরে বাতাস নিল ও। আপেল-গ্রীন রঙের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। দরজার গায়ে চকচকে পিতলের হাতল আর লেটার বক্সের কার্নিস দেখা যাচ্ছে। কলিংবেলের বোতামে একবার চাপ দিয়ে নামিয়ে নিল হাতটা।

প্রায় সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। সামনে উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফখরুল আনসারী। মনের ভাবটা গোপন না করে ভুরু জোড়া কুঁচকে তুলল রানা।

'ভেরি গুড! আসুন, আসুন মি. রানা।' চেহারায় জ্বলজ্বল করছে আগ্রহ, রানার একটা হাত চেপে ধরল ফখরুল। 'একেই বলে ভাগ্য! আপনার সাথে আবার দেখা হবে বলে আশা করছিলাম আমি। আছেন কেমন?'

ছোট একটা হলঘরে ঢুকল রানা। জানাল, ভাল আছি। কিন্তু চেহারায় বিরক্তি এবং নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে। 'আফরোজা নেই এখানে?' হঠাৎ জানতে চাইল ও।

'নেই মানে? অবশ্যই আছে।' তাড়াতাড়ি বলল ফখরুল। 'গোসল করছে।'

জোর করে চেহারায় উৎসাহ আর খুশির ভাব ফুটিয়ে রেখেছে ফখরুল, সেটা লক্ষ্য করে স্নায়ুতে টান অনুভব করছে রানা।

রানা চুপ করে আছে দেখে আবার কথা বলতে শুরু করল ফখরুল, 'দুঃখিত, মি. রানা। আমরা গল্প করায় এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে ঘড়ির কাঁটার দিকে

নজরই পড়েনি। আসুন, আসুন। আপনাকে একটা মার্টিনি তৈরি করে দিই।'

ফখরুলের পিছু পিছু বড় একটা সিটিংরুমে এল রানা। অত্যন্ত সৌখিনভাবে সাজানো কামরাটা। দেয়ালগুলো মখমলের ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। জানালার কার্নিসে দাঁড়ানো নকশা-কাটা কাঁচের ফুলদানীতে তাজা গোলাপ। সোফা ছাড়াও চারদিকে আরও নানা ধরনের চেয়ার সাজানো রয়েছে। লাল চামড়া দিয়ে মোড়া সব। মেঝেতে বোখারা কার্পেট, রঙটা পুরানো ওয়াইনের মত, চক চক করছে।

কার্পেটের ওপর পা দুটো লম্বা করে দিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসে আছে এক বিদেশী লোক। চকচকে পিতলের মত গায়ের রঙ, নাকটা চ্যাপ্টা। সম্ভবত থাই। চীনা হওয়াও বিচিত্র নয়। বসার ভঙ্গিটা প্রচণ্ড প্রতাপশালী চীন সম্রাটদের মত। গম্ভীর, থমথম করছে মুখ। রানা অনুমান করল, এটাই ওর মুখের স্বাভাবিক ভাব। বয়স হবে পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। সরু চোখ জোড়ায় সতর্ক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নাকের নিচে বাঁকানো গোঁফ। দেখেই বোঝা যায় বদমেজাজী, শুধু হুকুম করতেই অভ্যস্ত। চেহারার মধ্যে মঙ্গোলিয়ান নির্দয়তার ছাপ সুস্পষ্ট।

'ইনি মাসুদ রানা,' বলল ফখরুল। 'মি. রানা, আমার ফার্মের চেয়ারম্যানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনার—মি. শ্যেন কাপালা।'

পা দুটো টেনে নিয়ে শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নিল শ্যেন কাপালা, তারপর মাত্র এক ঝটকায় সটান দাঁড়িয়ে পড়ল রানার সামনে। তার বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। লক্ষ্য করল, শ্যেন কাপালা হাসছে, কিন্তু তা একটুও স্পর্শ করেনি তার চোখ দুটোকে।

'হাউ ডু ইউ ডু, মি. রানা,' বলল শ্যেন কাপালা। 'আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি।'

সতর্ক হয়ে গেল রানা। এ এক ভয়ঙ্কর লোক। চোখ, চেহারা, হাসি, কণ্ঠস্বর—সবগুলো প্রকটভাবে জানিয়ে দিচ্ছে সাত ঘাটের পানি খাওয়া ঝানু একটা শয়তানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও। মরণ না ঘনালে কেউ একে বিশ্বাস করবে না। বলা যায় না, এই লোকটাই হয়তো সংগঠনের নেতা। বয়স যাই হোক, গায়ে বাঘের মত শক্তি রাখে। দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে সিংহের রাজসিক ব্যক্তিত্ব ফুটে রয়েছে। এর সামনে ফখরুলকে তুচ্ছ একটা পোকা বলে মনে হচ্ছে রানার।

'আশা করি নিশ্চয়ই খারাপ কিছু শোনেননি,' বলল রানা। দাঁত বের করল। 'আপনি হয়তো জানেন না, কিছু লোক আমার সম্পর্কে খামোকা কুৎসিত গুজব রটিয়ে বেড়ায়।'

'কিন্তু আপনার সম্পর্কে যে কুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে, সেটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না,' হাত নেড়ে সামনের সোফাটা দেখাল রানাকে শ্যেন কাপালা। 'আপনার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। আপনার সাথে কথা বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি আমি।'

মার্টিনি নিয়ে ফিরে এল ফখরুল।

'কাজ-কারবার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে এখানে আমি আসিনি,' বলল

রানা। 'আমার ধারণা ছিল, এখানে এসে আমি দেখব, আমার সাথে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে আফরোজা।'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফখরুলের মুখ। 'অবশ্যই, মি. রানা। তৈরি হচ্ছে আফরোজা, বেশিক্ষণ লাগবে না ওর। এইটুকু সময়, যতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করছি···' ওয়াল কুকের দিকে তাকাল সে। 'আমাদেরও সময় নেই হাতে, বিশ মিনিট পর একটা ডিনার পার্টিতে হাজিরা দিতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ধীরে ধীরে বসল সোফায়। ফখরুলের বাড়ানো হাত থেকে মার্টিনির গ্লাসটা নিয়ে ছোট একটা চুমুক দিল ও।

'ফখরুল আমাকে বলছিল, ও আপনাকে আমাদের অফিসে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে,' বলল শ্যেন কাপালা। তার জন্যে ফখরুল মার্টিনি নিয়ে আসছে দেখে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল সে। 'ও বোধ হয় কাজের একটা প্রস্তাবও দিয়েছে আপনাকে, তাই না?'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে। 'প্রস্তাব দিয়েছিলেন? হতে পারে। অনেক লোকই প্রস্তাব দেয়, সবার কথা মনে রাখা যায় না। তাছাড়া, মনে রেখে লাভও নেই। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, প্রস্তাবগুলো আমার জন্যে গ্রহণযোগ্য নয়।'

'কিন্তু অফিসে তো এলেন না,' বলল শ্যেন কাপালা। 'আমি খুব আশা করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সাথে পরিচিত হবার জন্যে অদ্ভুত একটা তাগাদা অনুভব করছিলাম।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানা। শ্যেন কাপালার চোখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিল ও। 'আমি খুব ব্যস্ত মানুষ, মি. কাপালা।'

'জানি, তা আমরা জানি, মি. রানা,' কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ তিক্ততা প্রকাশ পেল শ্যেন কাপালার। 'কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি কিছু করছেন না বলেই জানি আমরা।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এখন আমি ছুটি উপভোগ করছি।'

'কিন্তু শুধু বাতাস খেয়ে কেউ আমরা বেঁচে থাকতে পারি না,' পিছিয়ে গিয়ে আরাম কেদারার হাতলের ওপর বসল শ্যেন কাপালা। হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখল। 'ছোট্ট একটা কাজ আছে, যেটা না করলেই নয়। ভাবছিলাম, এ-ব্যাপারে আপনার কোন উৎসাহ আছে কিনা।'

'নির্ভর করে কাজটার ধরন আর পারিশ্রমিকের ওপর,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রথমেই আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমি শুধু অল্প কাজ আর বেশি টাকার ব্যাপারেই আগ্রহী।'

রানার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে শ্যেন কাপালা। গম্ভীর, থমথমে চেহারা। রানার অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন। 'আজকাল সবার মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে কেউ কেউ এত বেশি যোগ্য যে তাদের এই দাবি মেটানোও হয়। তাদের মধ্যে আপনি একজন, সন্দেহ নেই। মাত্র এক ঘণ্টার একটা কাজ, পারিশ্রমিক দশ হাজার টাকা।'

ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা। তারপর বলল, 'শুনতে তো ভালই

লাগছে। কাজটা কি?'

'খুবই সংক্ষেপে বলছি, মি. রানা। তার আগে বলে রাখা ভাল, কাজটা আমার নয়, আমার এক মক্কেলের। আমার মক্কেলরা সবাই আমার বন্ধু, ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রায়ই তারা আমার সাহায্য নেয়। বন্ধুদের উপকার করতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। জানি না কেন, বন্ধুরা সবাই আমাকে সাংঘাতিক বিশ্বাস করে। এমন হতে পারে, আমি বিদেশী বলে তারা তাদের গোপন কথা আমাকে বলতে কুণ্ঠা বা ভীতি বোধ করে না। আপনাকে যে ভদ্রলোকের কথা বলছি, তিনিও আমার একজন বন্ধু। ভদ্রলোক এক মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন। মানে, মেয়েটা তাকে বিপদে ফেলেছে।'

'ব্ল্যাকমেইল?'

চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল শ্যেন কাপালার। 'ওয়াণ্ডারফুল! আপনার ইনটিউশন-এর তুলনা হয় না।' প্রশংসা করছে, কিন্তু চেহারায় কটমটে একটা ভাব ফুটে উঠেছে। 'সন্দেহ নেই, আমার বন্ধুটি বোকা। কিন্তু অসুবিধে হলো, সে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। দেশের লোক তাকে চেনে। মেয়েটার কাছে তার লেখা বেশ কয়েকটা চিঠি আছে, সাধারণ্যে সেগুলো যদি প্রকাশ পায়, বেচারার মান-সম্মান একেবারে ধুলোয় লুটাবে। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না তার।'

জিভের ডগা বের করে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল রানা। 'ভদ্রলোক পুলিসের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন?'

'তাতে অনেক অসুবিধে,' হেসে উঠল শ্যেন কাপালা। 'পুলিস তো আর সন্ন্যাসী নয়, তারা চিঠিগুলোর ভাঁজ খুলে ফেললে কে তাদেরকে বাধা দেবে? না, আমার বন্ধু পুলিসের সাহায্য নিতে রাজী নন। তিনি আমাকে ধরেছেন, আমি যেন যেভাবে হোক তাঁর চিঠিগুলো মেয়েটার কাছ থেকে উদ্ধার করে আনার ব্যবস্থা করে দিই। কাজটা পানির মত সহজ। এখন বলুন, আপনি আমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারেন কিনা?'

ফখরুল শ্যেন কাপালার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ। সজাগ। রানার সাথে চোখাচোখি হতেই অপ্রতিভ ভাবে হাসল।

সামান্য কাজ, ভাবছে রানা, এর জন্যে আমাকে কেন টানাটানি করছে এরা? শিম্পাঞ্জী বা হনুমানই তো পারে। একটা ঘরে ঢুকে কয়েকটা চিঠি চুরি করে নিয়ে আসা—এর জন্যে দশ হাজার টাকা কেন খরচ করতে চাইছে? আমি কেন? 'খোলাখুলি কথা বলা যাক,' বলল ও। হাতের খালি গ্লাসটা তেপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল ধীরে ধীরে। 'আপনাকে আমি চিনি না। ঝপ্ করে আকাশ থেকে আমার সামনে পড়েই একটা কাজ সাধছেন আমাকে। কিন্তু আপনার যে একজন মক্কেল আছে তা আমি জানব কিভাবে? কিভাবে জানব, এই চিঠিগুলো আপনি মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে ব্যবহার করবেন না? আমার দৃষ্টি ভঙ্গিটা বুঝতে পারছেন তো? কিছু রেখে-ঢেকে কথা বলছি না আমি। কাজটা করব কিনা তা আমি পরে বিবেচনা করে দেখব। তার আগে আপনাকে আমার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

চিঠিগুলো আপনার স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে আমাকে দিয়ে আনাতে চাইছেন কিনা, তা আমি বুঝব কিভাবে?'

'আপনি এ-ধরনের খুঁতখুঁতে মানুষ তা আমার জানা ছিল না,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল শ্যেন কাপালা। 'তবে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারছি আমি। আপনার সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাবার জন্য একটা কাজই করতে পারি আমি। তা হলো, চিঠিগুলো আপনি আমার হাতে তুলে দেবার সাথে সাথে ওগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলব।'

কাজটায় হাত দিতে সায় দিচ্ছে না মন। ইতস্তত করছে রানা। আবার এ-কথাও ভাবছে, সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কাজ দেবার আগে এটা একটা পরীক্ষাও হতে পারে। সম্ভবত তাই। সুতরাং এ-কাজের গুরুত্ব কম নয়। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলে ওরা হয়তো তার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। আর কর্নেল শফির কানে কথাটা গেলে গালমন্দ করে ভূত ভাগিয়ে ছাড়বে। সিদ্ধান্তটা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই নিল ও।

শ্রাগ করল। বলল, 'বেশ। তা যদি করেন, আমি রাজি।'

নিঃশব্দ উত্তেজনায় শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ ফখরুল, রানার কথা শেষ হতেই ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাত বাড়াল রানার খালি গ্লাসটার দিকে। 'খুশির খবর। এই উপলক্ষে আসুন আমরা সবাই গলা ভেজাই।' আনন্দে আটখানা দেখাচ্ছে তাকে। 'শ্যেনকে আমি বলেছিলাম, আপনি রাজী হবেন। এই কাজের জন্যে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত লোক।'

'কাল রাতে সম্ভব?' জানতে চাইল শ্যেন। 'মেয়েটা অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে, জানি আমি। একা বসবাস করে সে। কাল রাতে হলে কোনরকম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না আপনাকে।'

'বেশ, কাল রাতেই। বাড়িটা কোথায়?'

'তা এখনও আমি জানি না। সমস্ত খবর আর ফ্ল্যাটের একটা ম্যাপ কাল বিকেলের মধ্যে যোগাড় করে ফেলব আমি। ফখরুল আপনার সাথে যোগাযোগ করবে, ও-ই নিয়ে যাবে আপনাকে মেয়েটার ফ্ল্যাটে। যতদূর জানি, মেয়েটার দরজায় একটা ইয়েল লক আছে—অসুবিধে হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। বলল, 'কিন্তু কাজে হাত দেবার আগে জায়গাটা একবার দেখতে চাই আমি।'

চেহারায় উগ্র একটা ভাব ফুটে উঠল শ্যেনের। 'না। তা সম্ভব নয়। আমি বড়জোর আপনাকে একটা ডিটেল ম্যাপ যোগাড় করে দিতে পারি, তার বেশি কিছু না। কি করবেন চিন্তা করে দেখুন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'চিন্তা করার সব রাস্তাই তো বন্ধ করে দিলেন। ঠিক আছে, ম্যাপ হলেই চলবে।'

'কথা তাহলে পাকা হয়ে গেল?' রানার হাতে আর একটা মার্টিনির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল ফখরুল। 'একটু তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে, সেজন্যে কিছু মনে করবেন না, মি. রানা, প্লীজ। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আমাদের। আফরোজা

এই এল বলে। কয়েক সেকেণ্ড একা থাকতে খারাপ লাগবে না তো?'

'বেঁচেবর্তে থাকব, এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি,' বলল রানা।

আরাম কেদারার হাতল থেকে উঠে দাঁড়াল শ্যেন। 'ফখরুল সম্ভবত আপনার ঠিকানা জানে না, তাই না?'

হাসল রানা। 'তাই তো! কিভাবে জানবে?' ঠিকানাটা বলল রানা। একটা এনভেলাপের পিছনে লিখে নিল সেটা ফখরুল।

'কাল রাত দশটার সময় আপনাকে গাড়িতে তুলে নেব আমি,' হাসছে ফখরুল। 'চিঠিগুলো নিয়ে আপনি বেরিয়ে এলে আপনাকে নিয়ে শ্যেনের বাড়িতে যাব আমরা।'

'ওখানে চিঠিগুলো আপনার সামনে পুড়িয়ে ফেলব আমি,' বলল শ্যেন। 'সেই সাথে আপনার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেব। ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল রানা।

'আর মনে রাখবেন, মি. রানা, ছোট্ট এই কাজটায় আপনি যদি সফল হন, এখন থেকে আপনার হাতে একের পর এক ইন্টারেস্টিং কাজ শুধু আসতেই থাকবে। সেগুলোয় এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাবেন আপনি।' রানার হাতটা ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিল সে।

নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'আমি কখনও ব্যর্থ হই না।'

'চমৎকার! আশা করছি আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা মধুর হবে,' কিন্তু শ্যেনের দুই চোখে অবহেলার দৃষ্টি।

'কাল রাতে আপনার সাথে দেখা করছি আমি,' আবার বলল ফখরুল, যেন রানা ভুলে যাবে বলে সন্দেহ করছে। 'আর, হ্যাঁ, প্লীজ, এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেন না।'

'আপনার বোনকেও না?'

ফখরুলের মুখের হাসিটা স্থির হয়ে গেল। 'ইফ ইউ প্লীজ।

কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না কেউ, তারপর ওরা দু'জনেই হাসল, হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে শ্যেন কাপালা আর ফখরুল। শিম্পাঞ্জীকে পাশ কাটিয়ে গেল ওরা। দু'জনের কেউই তার দিকে তাকাল না। বেঁটে, পেশীবহুল শিম্পাঞ্জীর দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। শ্যেন আর ফখরুল বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এরপর শিম্পাঞ্জীও তার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে উল্টোদিকের রাস্তা ধরে চলে গেল।

দেখেশুনে বোঝা যাচ্ছে আফরোজার হাতে ওকে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বোধ করছে ওরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ও। সেটা খুলে উঁকি দিল হলঘরে। কেউ নেই। বাড়ি খালি নয় তো? শালারা তাকে ফাঁদে আটকে রেখে

গেল নাকি! আফরোজার সাড়াশব্দ নেই কেন? সামনের দরজার ডান দিকে ছোট একটা প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছে ও। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা। সেটার ওপর চোখ রেখে গলা চড়িয়ে ডাক দিল, 'আর কতক্ষণ লাগবে তোমার, আফরোজা?'

'রানা, তুমি?'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা, তারপর খুলে গেল দরজাটা। লাল একটা সায়া দিয়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে আফরোজা। 'হ্যালো,' বলল সে। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। রশি এঁটে বাঁধা থাকলেও সায়াটা একহাত দিয়ে বুকের কাছে মুঠো করে ধরে আছে, অপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে রানার দিকে। 'কখন এসেছ? নিশ্চয়ই ফখরুল দরজা খুলে দিয়েছে? আমাকে খবর দেয়নি কেন! তাহলে আরও তাড়াতাড়ি করতাম।'

আফরোজার হাতটা ধরে আর ছাড়ল না রানা। 'এখানে এসেছি আধঘণ্টার ওপর। ওরা বলল, তুমি গোসল করছ।'

'হ্যাঁ,' হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল আফরোজা, কিন্তু রানা সেটা আরও শক্ত করে ধরল। 'সাংঘাতিক শক্তি তোমার গায়ে। আজ তোমাকে কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে।'

'কোন বাধা মানব না, এটা তার লক্ষণ,' বলল রানা। কাছে টানল আফরোজাকে। একটা হাত পিছলে নেমে গিয়ে স্থির হলো তার কোমরে। 'তোমার মূডের খবর কি?'

'সুবিধের নয়,' বলল আফরোজা। মুক্ত হাতটা রানার বুকে রাখল, তারপর ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল ওকে। 'প্লীজ, জংলীর মত আচরণ করো না। জংলীপনা আমার ভাল লাগে না।' হাসছে সে।

'আগেই বলেছিলাম, মেয়েরা অস্থিরমতি,' আফরোজাকে ছেড়ে দিল রানা। 'মনে হচ্ছে, গোলমাল করবে তুমি?'

'কি যা তা বলছ? তোমার কথা আমি বুঝতেই পারছি না। শোনো, পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না আমার। লক্ষ্মী ছেলের মত সিটিংরুমে গিয়ে বসো। কথা দিচ্ছি দেরি করব না।'

'একা থাকতে ভাল লাগে না আমার।' আফরোজা বাধা দেবার আগেই দ্রুত এগোল রানা। শেষ মাথার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'তুমি কাপড় পরবে, আমি দেখব। একা বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল সেটা।' চৌকাঠ পেরিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। বেশ বড় কামরা। অত্যন্ত দামী আসবাব পত্র দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজানো। 'বাহ্, চমৎকার! আরাম-আয়েশের কি সুন্দর আয়োজন! এরই নাম বোধহয় বিলাসিতা।'

এগিয়ে গিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়াল রানা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল সেটা। এখানে গা এলিয়ে দিলে মনে হয় মেঘের ওপর শুয়ে আছি, তাই না? তুমি যে এত সুন্দরী, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।'

দুপদাপ পা ফেলে কামরার ভেতর ঢুকল আফরোজা। 'একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?' বাঁকা চোখে চাইল সে। 'কোন পুরুষ মানুষ আমার বেডরুমে ঢুকতে পারে না। বেরিয়ে যাও, রানা।'

আফরোজার দিকে পিছন ফিরল রানা। এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। লোশন, ক্রীম, পারফিউমের বোতলগুলো নাড়াচাড়া করছে। 'রাগ করেছ মনে হচ্ছে?' শান্তভাবে বলল ও। একটা বোতল তুলে নিয়ে ছিপি খুলে ফেলল সেটার, বোতলের মুখটা নাকের কাছে নিয়ে এসে শ্বাস টেনে ঘ্রাণ নিল। 'হুম্‌ম্‌, ভারি সুন্দর!' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আফরোজার দিকে। তার চেহারায় কপট রাগের ভাবটা দেখেও না দেখার ভান করল। 'কিন্তু তুমি যদি কখনও আমার বাড়িতে যাও, এবং আমার বেডরুমে ঢোকো, মাইরি বলছি, সাংঘাতিক খুশি হব আমি।' ছিপি এঁটে দিয়ে বোতলটা রেখে দিল ও। আফরোজার চোখে চোখ রেখে আবার বলল, 'শ্যেনের কথা বলছি, অদ্ভুত এক চিড়িয়া, তাই না? নিশ্চয়ই খুব ভাল করে চেনো তুমি ওকে?'

'নাম মাত্র পরিচয় আছে। আমার নয়, ফখরুলের বন্ধু ও।' দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠেছে আফরোজার। 'এবার দয়া করে আমার কথায় কান দাও। যা বলছি, শোনো। যাও, পাশের ঘরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল রানা। 'কেন শুধু শুধু চেঁচামেচি করছ? বুঝতে পারছ না, এখানে থাকতে ভাল লাগছে আমার? ভেবেছিলাম তোমাকে কোন ক্লাবে বা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব। কিন্তু এখন আর তা ভাবছি না।'

'কোথায় যাব তাহলে আমরা?'

'কোথাও না। এখানেই থাকব।'

'অসম্ভব! পাগল হলে নাকি তুমি? জানি, আমারই দোষ। সেদিন রাতে আমিই তোমার সাহস বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি···তাছাড়া, সেই মুহূর্তে ভীষণ একা লাগছিল নিজেকে···যাই হোক, বোকার মত এমন কিছু করব না আমরা, যার দরুন পরে পস্তাতে হয়। ক্লাবে বা রেস্তোরাঁতেই যাব আমরা।'

'কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো?' বলল রানা। 'সেদিন রাতে অস্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়েছিলে তুমি। তুমি নিজেই স্বীকার করছ, ইচ্ছে করে আমার সাহস বাড়িয়েছিলে। কিন্তু তার পিছনে একটা কারণ ছিল, সেটা স্বীকার করছ না। কারণটা কি বলব? তুমি চেয়েছিলে আমি এখানে আসি, আর তোমার ভাই ফখরুল এবং তার বন্ধু আমাকে একটা নোংরা কাজ করার প্রস্তাব দিক। কি, ঠিক তাই চাওনি তুমি? আমি যাতে এখানে আসি তার জন্যে তুমি একটা টোপ ফেলেছিলে টোপটা কি? ভালবাসায় ভরপুর একটা সন্ধ্যা।' হো হো করে হেসে উঠল রানা।

আফরোজার নাকের দু'পাশে কেউ যেন লাল রঙের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে। দুই চোখে ঝড়ের পূর্বাভাস। 'মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ বাজে কথা। তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

হাসল রানা। 'কিছুই বুঝতে পারছ না? ওরা তাহলে তোমাকে বলেনি?

ব্যাপারটা গোপন রাখারই কথা, কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ফখরুল তোমার কানে কানে কথাটা বলেছে। এই মাত্র ওরা আমাকে প্রস্তাব দিয়ে গেল, কয়েকটা অশ্লীল চিঠি উদ্ধার করে দিলে নগদ দশ হাজার টাকা দেবে।'

'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না! এবার শোনো, রানা, এভাবে এগোলে তিক্ততাই বাড়বে শুধু। দয়া করে তুমি চলে যাও। তোমার সাথে আজ রাতে কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

'যাচ্ছ না সে তো আমি জানি,' বলল রানা। 'খানিক আগে আমিই তো বললাম সে-কথা।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আফরোজার একটা কব্জি খপ্ করে ধরে ফেলল ও। 'এসো, বসো আমার পাশে।'

'না!' নিজেকে মুক্ত করার জন্যে হাতটা মোচড়াতে শুরু করল আফরোজা। কিন্তু রানার সাথে গায়ের জোরে পারবে কেন। মাঝারি গোছের একটা হ্যাচ্কা টানে তাকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল রানা।

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল আফরোজা। 'তোমার দোহাই লাগে, ছাড়ো!'

'আমার কোন দোষ নেই। এটা তোমার পাওনা।' হালকা সুরে কথা বলছে রানা। 'সত্যি যদি আপত্তি থাকত তোমার, এই পোশাকে আমার সামনে বেরোতে না। লোভ দেখাতে গিয়ে এখন নিজের বিপদ ডেকে এনেছ নিজেই।'

'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' ধস্তাধস্তি করছে আফরোজা। খালি হাতটা দিয়ে কিল তুলল, কিন্তু মাঝপথে সেটাকে ঠেকিয়ে দিল রানা। এক হাত দিয়ে এখন তার দুটো কব্জি ধরে আছে ও।

'কি ঘটতে যাচ্ছে তা তো বুঝতেই পারছ। কি করবে এখন তুমি?' জানতে চাইল রানা। 'তোমার চেয়ে গায়ের জোর আমার বেশি, নীতিরও কোন বালাই নেই। যতদূর বুঝতে পারছি, সাংঘাতিক মজা পাচ্ছ তুমি একটা রেপিং সীন তৈরি করে।'

'ব্যথা লাগছে আমার, ছাড়ো!' প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হয়েছে আফরোজার। 'এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে, রানা। ভাল চাও তো এখুনি আমাকে ছেড়ে দাও।' উঠে দাঁড়াল।

হাসছে রানা। 'আমি ছাড়তে চাইলেই কি তুমি ছেড়ে দেবে? উঁহুঁ! তোমার চোখ বলছে—খবরদার, ছেড়ো না!' মৃদু গলায়, নরম সুরে কথা বলছে রানা, 'লোভনীয় আভাস দিয়ে ডেকেছ আমাকে তুমি, তোমার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে না নিয়ে ছাড়বে না।' আফরোজার হাত ছেড়ে দিয়ে কোমরসহ তলপেটটাকে আলিঙ্গন করল রানা, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে তাল সামলাতে পারল না আফরোজা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানার ওপর। সায়ার রশিটা দুই বগলের নিচে এখনও এঁটে রয়েছে। গিটটা খুলে দিল রানা।

'এই অসভ্য, ছাড়ো আমাকে···শয়তান···জানোয়ার···' রানা লক্ষ্য করল চকচক করছে ওর চোখ দুটো।

নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট গ্রাস করল আফরোজার অধর। আরও কয়েক সেকেণ্ড

ধস্তাধস্তি করল আফরোজা। তারপর রানা অনুভব করল, ঢিল হয়ে গেল তার শরীর।

'চেঁচাও!' ফিসফিস করে বলল রানা। 'এখনও সময় আছে। আরেকটু পর অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'বাজে কথা রাখো!' ঝাঁঝের সাথে বলল আফরোজা। তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা।

সাত

জানালা গলে একফালি চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে কামরার ভেতর।

'খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট,' বলল রানা। বালিশ থেকে মাথা তুলে আবছাভাবে আলোকিত কামরার চার দিকে তাকাচ্ছে সে।

'উচিত সাজা,' অলস সুরে ফোড়ন কাটল আফরোজা। সুন্দর একটা নগ্ন হাত মাথার ওপর লম্বা করে দিল সে, অপর হাতটা মুখের সামনে তুলে একটা হাই তুলল। পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। 'রেস্তোরাঁয় না গিয়ে এখানে আমাকে পাকড়াও করার মজাটা বোঝো এবার।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রানা। চোখ দুটো বুজল আবার। 'আগে কোথাও থেকে ঘুরে আসা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু প্রথম থেকেই তুমি এমন গোলমাল শুরু করলে...'

রানার নগ্ন বুকে নরম হাতের ঘুষি মারছে আফরোজা। 'তুমি একটা রক্তচোষা। চরিত্রহীন। নাহ্, উঠে পড়ি। কিছু খেতে না দিলে হয়তো আর কোন দিন আসবেই না।'

পাশ ফিরল রানা, আফরোজার দিকে তাকাল। 'শরৎচন্দ্রের নায়িকারা এই কৌশল অবলম্বন করত। মন্দ নয়।'

উঠে পড়ল আফরোজা। বিছানা থেকে নেমে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছন দিকে তাকাল। মেঝেতে পড়ে রয়েছে লাল সায়াটা, ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল সেটা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে রানা। চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে সায়াটা পরছে সে। হঠাৎ তাকে অস্বাভাবিক সুন্দরী বলে মনে হলো রানার।

'জঘন্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল আফরোজা। 'এর জন্যে ভুগতে হবে আমাকে।'

'ও-কথা বলছ কেন?'

'ভুগতে হবে জানি, তাই বলছি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল আফরোজা।

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। এগারোটা বেজে বিশ। একটা সিগারেট ধরিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে ভ্রূ কুঁচকে। পরবর্তী কর্তব্যটা কি জানা আছে ওর। রূপার সাথে যোগাযোগ করে কাল রাতের প্রোগ্রামের কথাটা জানানো দরকার তাকে। কিন্তু কাজের বিষয় নিয়ে মাথা

ঘামাতে ভাল লাগছে না এখন ওর। মন-প্রাণ-শরীর, সর্বস্ব দিয়ে এমন অকাতরে আত্মসমর্পণ করেছে আফরোজা যে মেয়েটার প্রতি অদ্ভুত একটা দুর্বলতা বোধ করছে ও। প্রথম মিলনেই ওর অনেকখানি দখল করে নিয়েছে সে। এই দুর্বলতা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে যাচ্ছে না, জানে ও। কিন্তু যতক্ষণ অনুভূতিটা থাকবে, ততক্ষণ সেটা উপভোগ করতে চায়। জোর করে প্রেম করার পিছনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল ওর। আফরোজাকে চিনতে ভুল করেনি সে। এই ধরনের মেয়েরা এমন ঘটনার পর ক্রীতদাসী হয়ে যায়। এর সাহায্য দরকার পড়বে ওর, জানে রানা। কিন্তু শুধু কাজের স্বার্থে দৈহিক মিলন—মনের মধ্যে সামান্য হলেও কলুষ বোধ করছে সে।

বিছানা থেকে নামল রানা। কিছু একটা পরা দরকার। এদিক ওদিক তাকিয়ে ওয়ারড্রোবটা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। ওর পরার মত কিছু পাওয়া গেলে হয়। আফরোজার কাপড়চোপড়ের মাঝখানে পুরুষের একটা ড্রেসিং গাউন দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট হলো রানার জন্যে, কাঁধের কাছে একেবারে সেঁটে থাকল। ফিরে এসে বিছানায় বসল ও। মাথার ঘন চুলে আঙুল চালাচ্ছে। কপালে চিন্তার রেখা।

'ফখরুল এখন তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবে,' ঘরে ঢুকে বলল আফরোজা। ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এসেছে সে। 'যা টাইট হয়েছে ছিঁড়ে না গেলেই হয়।'

ট্রের দিকে তাকাল রানা। ঠাণ্ডা মুরগীর স্লাইস, মাখন দেয়া রুটি, আর গর-মরশুমের পীচ ফল। 'মন্দ নয়। কিন্তু আমাকে শক্ত ভাবে গাঁথার জন্যে তোমার উচিত ছিল নিজের হাতে কিছু রান্না করে নিয়ে আসা।'

'চুপ করো তো!' বিছানার ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখল আফরোজা।

'জঘন্য একটা কাণ্ড, বললে। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে ভুগতে হবে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। এক স্লাইস মুরগী তুলে কামড় বসাল তাতে। 'তোমার ওই কথাটার মধ্যে বিপজ্জনক কিছু আছে নাকি?'

'আছে কি না আছে ভাল করেই জানো তুমি,' বলল আফরোজা।

'মুখ ফুটে বলো। পেটে কথা চেপে রাখলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।'

'হেসো না—আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি,' ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে আফরোজা। রানা দেখল, ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে তার। 'যা ভয় করতাম, তাই ঘটে গেল। প্রেম জিনিসটাকে ঘৃণ্য মনে হয় আমার। সব কিছু ভয়ঙ্কর জটিল করে তোলে। জানতাম, আমরা সংযমী না হলে এই ধরনের কিছু একটা ঘটবে। ঘটলও তাই।'

'আমার সাথে প্রেমে পড়ার মধ্যে খারাপটা কি দেখলে?' মুরগীর স্লাইসে লবণের ছিটে দিচ্ছে রানা। 'এতে তো তোমার আনন্দ পাবার কথা, তাই না?'

'তোমার মত লোকের প্রেমে পড়া কোন মেয়ের উচিত নয়। কথাটা আমার মত তুমিও খুব ভাল করে জানো। কাউকে ভালবাসবে, সে মানুষ তুমি নও। ব্যাপারটা এক তরফা। সুতরাং, আঘাত মেয়েটাকেই পেতে হবে।'

প্রসঙ্গটা পছন্দ হচ্ছে না রানার।

'মেয়েরা ঘাড়ে চড়ে বসতে ভালবাসে,' বলল ও। 'কেন, আঘাত পাবে কেন

তুমি? আমি তোমার হাতে নরম একতাল কাদা হয়ে থাকব।'

'তা হয়তো থাকবে, কিন্তু তা সাময়িক কিছু সময়ের জন্যে। শেষ পর্যন্ত বিরক্তি ধরে যাবে তোমার। তখন আর তুমি আমাকে ভালবাসবে না।' অস্থিরতার সাথে কাঁধ ঝাঁকাল আফরোজা। 'যাই হোক, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। একটা কবর তৈরি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবরটা আমার। আচ্ছা, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, মনে হলে হাসি পাচ্ছে না তোমার?'

'এত মন খারাপ করছ কেন? মেয়েদেরকে নিয়ে মুশকিল হলো, কারও সাথে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই সম্পর্কটাকে স্থায়ী বলে ধরে নেয়। পুরুষদের মত হতে পারো না? আগামীকালের জন্যে চোখ না ভিজিয়ে আজকের হাসিটাকে আরও বড় করো। স্থায়ী বলে কিছু নেই। দু'দিন পরই হয়তো আমার চেয়ে ভাল একটা ছেলের দেখা পাবে তুমি, আমাকে তখন ভুলে যাবে। ফর গডস্ সেক, নাটক করো না।'

'একেই বলে, পিছনের দরজা খোলা আছে, তাই না?' হালকাভাবে হাসল আফরোজা। 'বেশ, মেনে নিচ্ছি। কিছুই স্থায়ী নয়। আমাকে যখন আর ভাল লাগবে না তোমার, পিছন ফিরে একবারও তাকিয়ো না, স্রেফ হেঁটে চলে যেয়ো। আজকের দিনটাই জীবনের শেষদিন ধরে নিয়ে এসো সময়টা উপভোগ করি আমরা।'

দু'আঙুল দিয়ে ধরে দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে একটা পীচ রাখল রানা। তারপর জিভ দিয়ে মুখের ভেতর টেনে নিল সেটা। 'পরিস্থিতিটাকে করুণ করে তুলছ তুমি,' বলল ও। 'সে যাই হোক, দায়ী কিন্তু তুমি। আমার নাকের সামনে মুলোর টোপ ঝুলিয়েছিলে তুমি, সেই টোপের পেছনে এখন যদি তুমি নিজেই দৌড়াতে শুরু করো, দোষ আমার? কারও ওপর রাগ যদি করতেই হয়, তোমার ভাইয়ের ওপর করো। সে-ই দায়ী। এখানে সে আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিল, তাই না?'

'বেশ,' এখনও হাসছে আফরোজা, 'স্বীকার করছি আমি দায়ী। কিন্তু আমার ওপর ওভাবে জোর করা তোমার উচিত হয়নি।'

'তোমার এই অভিযোগও আমি মেনে নিতে রাজী নই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'তুমি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলে বলেই জোর খাটিয়েছি। সবুজ সংকেত দেখে কোন ট্রেন ড্রাইভার গাড়ি থামায় বলে শুনেছ? এবার, আসল ব্যাপারটা বলো দেখি?'

'তোমার মধ্যে কি একটুও দয়ামায়া নেই? নিজেকে ক্ষমা করব, তার কোন রাস্তাই খোলা রাখছ না। তবে তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।'

'সব মেনে নিচ্ছ দেখে আমি খুশি,' বলল রানা। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকল ও। আঙুল থেকে পীচ ফলের রস ধুয়ে একটু পরই ফিরে এল কামরায়। দেখল ট্রেটা সরিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে আছে আফরোজা, হাত দুটো মাথার নিচে। 'শ্যেন কাপালাকে বিশ্বাস করা যায়?' খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আফরোজার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল ও।

সামান্য একটু মুখ বাঁকাল আফরোজা। 'জানি না। ওকে আমি ঘৃণা করি। ভয়ঙ্কর লোক, ফখরুল ওর সাথে কাজ করে তা আমার পছন্দ নয়।'

রানার ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বাথরুমে ঢুকে ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল ও, একটা রুমাল পেয়েছে। শ্যেন কাপালার নাম লেখা আছে সেটার এক কোণে।

কোন বন্ধনই এখন আর অনুভব করছে না রানা।

পরদিন রাত দশটা।

রানার ফ্ল্যাটের সামনে একটা কালো টয়োটা এসে থামল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। দরজা খুলে হেঁটে এল গেট পর্যন্ত।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল ফখরুল। সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরে এসেছে সে। আজ আর তাকে অস্থির বা নার্ভাস দেখাচ্ছে না। 'ম্যাপটা নিয়ে এসেছি, আপনার সাথে আলোচনা হওয়া দরকার।'

'আসুন আমার সাথে,' পথ দেখিয়ে ফখরুলকে ওপরে নিয়ে এল রানা।

আগোছাল কামরাটায় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসল ফখরুল। পা ঝুলিয়ে টেবিলের ওপর বসল রানা।

'আফরোজার সাথে বেড়াতে বেরিয়ে কাল সন্ধেটা ভালই কেটেছে আপনার, তাই না?' হাসিমুখে জানতে চাইল ফখরুল।

'একেবারে ছেলেমানুষ, খুব হাসিয়েছে আমাকে। ম্যাপটা দেখতে পারি আমি?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ফখরুল। কি যেন খুঁজছে সে রানার মুখে। কিন্তু ভাবের লেশমাত্র নেই ওর চেহারায়। পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল ফখরুল। টেবিলের ওপর রাখল সেটা, তারপর টোকা মেরে এগিয়ে দিল রানার দিকে।

'একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে সারতে পারবেন কাজটা, কোন অসুবিধে হবে না। ফ্ল্যাটটা দোতলায়, ভেতরে ঢোকার দরজাটা সদর দরজা থেকে দেখা যায় না। দারোয়ান আছে, কিন্তু রাত ন'টার পর ডিউটি শেষ হয়ে যায় তার। ফ্ল্যাটের দরজাটা একবার খুলতে পারলেই হয়, বাকিটা পানির মত সহজ। সিটিংরুমে একটা ডেস্ক আছে, সেটার দেরাজে পাওয়া যাবে চিঠিগুলো। এই যে, এটা হলো সিটিংরুম।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাপে একটা আঙুল রাখল ফখরুল। 'আপনি এখান দিয়ে ঢুকবেন, দোতলায় বাঁ দিকে মোড় নেবেন। সামনে দেখতে পাবেন এই দরজাটা। সিটিংরুমে ঢোকার পথ এটা। ডেস্কটা জানালার ধারে। দেরাজে তালা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার অসুবিধে হবার কথা নয়। ডান দিকের ওপরের দেরাজে আছে চিঠিগুলো।'

ম্যাপটা পরীক্ষা করছে রানা। মুখ না তুলেই জানতে চাইল, 'সমস্ত তথ্য, নির্ভুল, আপনি শিওর?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল ফখরুল। 'মেয়েটার ওপর অনেক দিন থেকেই নজর রাখা হচ্ছে। তার চাকরাণীটাকে কাজে লাগিয়েছি আমরা। সে নিজের চোখে দেখে তবে আমাদেরকে জানিয়েছে, চিঠিগুলো ওখানেই আছে।'

'কিন্তু জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়,' মৃদু গলায় বলল রানা। মনে এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সন্দেহ। এদেরকে প্রতিশ্রুতি দেবার আগে কর্নেল শফির সাথে পরামর্শ করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সুযোগ পায়নি ও। আফরোজার ফ্ল্যাট থেকে আজ বিকেলে বিদায় নিয়ে সোজা এখানে ফিরে আসতে হয়েছে ওকে। সারাটা পথ ওকে অনুসরণ করে এসেছে শিম্পাঞ্জী। রূপাকে ফোন করলে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে ভেবে ঝুঁকিটা নেয়নি ও। কিন্তু এখন ভাবছে, ঝুঁকিটা নিলেই ভাল হত। 'বোকা মেয়ে। এ-লাইনে কাঁচা।'

'তা তো বটেই,' দ্রুত বলল ফখরুল। হাসছে সে। 'ভদ্রলোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যক্তিত্ব বলেই, তা নাহলে এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। পুলিসের কাছে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা, চিঠিগুলো ঠিক শ্লীল নয়।'

ম্যাপটা ভাঁজ করে ফখরুলের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'কিন্তু এতটা সহজ হবে বলে আশা করিনি আমি। ধরুন, ওখানে যদি চিঠিগুলো না থাকে?'

'থাকবে না মানে?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল ফখরুলের। 'না জেনে বলছি নাকি?'

'আর কোথাও সরিয়ে রেখেছে কিনা তা আপনারা জানলেন কিভাবে?' বলল রানা। 'আমি জানতে চাইছি, ডেস্কে যদি চিঠিগুলো না পাই, কি করব আমি? ফ্ল্যাটটা সার্চ করে দেখব?'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, চিঠিগুলো আপনি সিটিংরুমের ওই ডেস্কের দেরাজেই পাবেন। কিন্তু একান্তই যদি না পান, হ্যাঁ, তাহলে আপনি খুঁজে দেখবেন বৈকি। প্রচুর সময় পাবেন হাতে, ওদিক থেকে কোন অসুবিধে হবে না। রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে রাত প্রায় কাবার করে ফেরে মেয়েটা। আজও বেরিয়ে গেছে সে, রাত দুটোর আগে ফিরবে না। তবু সতর্কতা অবলম্বন করেছি আমরা। শ্যেন কাপালা নজর রাখছে তার ওপর। কোন কারণে আজ যদি ক্লাব থেকে তাড়াতাড়ি রওনা দেয়, সাথে সাথে ফোন করবে শ্যেন। ফোন বাজলে ধরতে ভুল করবেন না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'দেখা যাচ্ছে খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারেই মাথা ঘামিয়েছেন আপনারা। গুড। আমরা কি এখুনি রওনা হব?'

'হ্যাঁ। আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

'আসছি,' বলে পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল রানা। একটা দেরাজ থেকে ক্যানভাসে জড়ানো যন্ত্রপাতির একটা ছোট ব্যাগ বের করে পকেটে ভরল। পাতলা চামড়ার একটা দস্তানা তুলে নিল হাতে। ব্রাউনিং নাইন এম.এম. অটোমেটিক পিস্তলটা পড়ে রয়েছে দেরাজে। দুই সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। না, থাক ওটা।

বৈঠকখানায় ফিরে এল ও। 'চলুন তাহলে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ফখরুল বলল, 'বাইরে অপেক্ষা করব আমি। সন্দেহজনক কিছু ঘটতে দেখলে হর্ন বাজিয়ে সাবধান করে দেব আপনাকে।'

'তবু যা হোক একটু ভরসা পাচ্ছি,' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'কিন্তু পেছন দিক থেকে কেটে পড়ার কোন রাস্তা নেই, এটাই যা ভয়ের ব্যাপার। ঘটনাচক্রে যদি

একপাল পুলিস গিয়ে হাজির হয়, আমার দফা সারা।'

'দূর, কি যে বলেন!' গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল ফখরুল। 'পুলিস কোত্থেকে আসবে!' কথাটা এত তাড়াতাড়ি আর জোরের সাথে বলল সে, ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার।

'অসময়ে অজায়গায় হাজিরা দেবার একটা বদ অভ্যাস আছে কিনা পুলিসের,' বলল রানা। 'যাই হোক, সব ভালয় ভালয় চুকে যাক তা আমিও চাই। কিন্তু যদি কোন গণ্ডগোল হয়, গলির মাথায় সরে যাবেন আপনি, আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন ওখানে।'

'ঠিক আছে,' সহজেই রাজী হয়ে গেল ফখরুল।

গ্রীন রোডে চলে এসেছে ওরা। মেইন রোড ছেড়ে চওড়া একটা গলিতে ঢুকল গাড়ি। স্পীড কমিয়ে আনছে ফখরুল।

'ওই যে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা,' বলল সে। 'সাঁইত্রিশের এক।' ফুটপাথের ধারে গাড়ি দাঁড় করাল সে। রিস্টওয়াচ দেখল। 'হাতে আপনি প্রচুর সময় পাচ্ছেন। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব আমি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। চিঠিগুলো জায়গা মত থাকলে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না আমার। ইঞ্জিনটা চালুই থাক।'

'ঠিক আছে। গুড লাক।'

নেমে পড়ল রানা। তারপর কি মনে করে ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে ফখরুলের দিকে তাকাল। 'একটা কথা। শ্যেন যেন আমার টাকা নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। টাকা না পেলে চিঠিগুলো আমি হাতছাড়া করব না।'

জোর করে হাসল ফখরুল। ড্যাশবোর্ডের আলোয় মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার মুখের চেহারা। হঠাৎ যেন উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে তার পেশী। 'টাকার ব্যাপারে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, মিস্টার রানা।'

'গুড। আসি তাহলে।'

রাস্তা পেরোল রানা। ফুটপাথটা সরু। সামনেই লোহার কোলাপসিবল গেট। খোলা। সিঁড়ির ধাপে পা দেবার আগে এদিক ওদিক দেখে নিল। পাঁচটা ধাপ। তারপর আলোকিত একটা হলঘর। ইতস্তত না করে ভেতরে ঢুকল। কোথাও কোন শব্দ নেই।

ঠিক সামনেই একটা অটোমেটিক লিফট। করিডরটা বাঁ দিকে। হলঘর পেরিয়ে সেদিকে এগোচ্ছে রানা। অকস্মাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল লিফটের দরজা, ঈভনিং স্যুট পরা এক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। কটমট করে তাকাল রানার দিকে। কিন্তু কিছু বলল না। লোকটার দিকে দ্বিতীয় বার ফিরেও তাকাল না রানা। সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে ও করিডর ধরে। কিন্তু পরিস্থিতির ওপর চটে গেল মনে মনে। আশা করেছিল কেউ ওকে দেখতে পাবে না। থানায় যদি অভিযোগ করে মেয়েটা, পুলিস এই লোকটাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সাথে সাথে ওর চেহারার বর্ণনা পেয়ে যাবে পুলিস।

সিঁড়ির পাঁচটা ধাপ টপকে রাস্তায় নেমে গেল লোকটা, পায়ের আওয়াজ শুনে

বুঝতে পারল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। পিছিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে মজবুত একটা দরজার সামনে দাঁড়াল ও। পকেট থেকে শক্ত এক টুকরো সেলুলয়েড বের করে তালার 'ক্যাচ'-এর ভেতর ঢুকিয়ে দিল জোর করে। চাঁড় দিতেই খুট করে সরে গেল ক্যাচটা। দরজা ঠেলে ছোট একটা হলঘরে ঢুকল ও। আরেক পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে জ্বালল। নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। টর্চের আলো ফেলল ওর বাঁ দিকে। ম্যাপের নির্দেশ মত সামনে একটা দরজা দেখতে পাচ্ছে ও। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল, কপাটে কান ঠেকিয়ে শুনছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর দরজার হাতলটা মুঠো করে ধরল। ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে সেটাকে। আর যখন ঘুরছে না, একটু একটু চাপ দিয়ে কবাট দুটো খুলতে শুরু করল ও। নিকষ কালো অন্ধকার আলিঙ্গন করল ওকে। ঘরের ভেতর ঢুকে পেন্সিল টর্চটা আবার জ্বালল। খালি ঘর। কেউ নেই। কেন যেন মনে হয়েছিল, একটা লাশ বা ওই ধরনের কিছু দেখতে পাবে। সন্দেহটা এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি মন থেকে।

ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। কিন্তু তালা লাগাল না।

পর্দা-ঘেরা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডেস্ক। নির্ভুল তথ্য। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল সেটা রানা। শুধু ওপরের দেরাজেই তালা মারা রয়েছে, তালাটা বেশ বড় আর মজবুত। দেখে গম্ভীর হলো একটু। শব্দ করে তালা খোলা পছন্দ নয় রানার, সেখানেই সমস্যা। যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে ছোট একটা 'পিক' বের করল ও। তালার ভেতর ঢোকাল সেটা। কয়েক মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করল সেটা, তারপর বের করে আনল তালার ভেতর থেকে। ব্যাগ থেকে একটা প্লায়ার্স বের করে 'পিক'-এর মাথাটা সামান্য একটু বাঁকিয়ে নিল, তারপর আবার সেটাকে ঢোকাল তালার ভেতর। ধীরে ধীরে নাড়ছে। হঠাৎ কোমল একটা ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা।

পিক আর প্লায়ার্স ব্যাগে রেখে দিয়ে পকেটে ভরল সেটা রানা। ডেস্কের দু'ধারেই একের পর এক দেরাজ দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের ওপরের দেরাজটা খুলল সে। খালি।

দ্রুত সরে এসে, বাঁ দিকের ওপরের দেরাজটা একটানে খুলে ফেলল রানা। টুকরো পেন্সিল, কালির দোয়াত, জেমস ক্লিপের বাক্স ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে। কাগজের একটা টুকরোও দেখতে পাচ্ছে না রানা। অন্যান্য দেরাজগুলো পরীক্ষা করতে খুব বেশি সময় নিল না ও। কোথাও নেই চিঠিগুলো!

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা। চিন্তিত হয়ে পড়েছে। চিঠিগুলো হয় অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে মেয়েটা, নয়তো সেগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রথম থেকেই মনে হয়েছে তার, কাজটা অস্বাভাবিক সহজ। তবে কি এটা একটা ফাঁদ?

ডেস্ক ঘুরে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। টয়োটা নিয়ে চলে গেছে ফখরুল।

নির্দয় একটা নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। সম্ভবত নিচের হলঘরে

অপেক্ষা করছে কেউ ওর জন্যে। সামনের দিকে ঝুঁকে জানালার ঠিক নিচেটা দেখল ও। জানালার গ্রিলটা খোলা গেলে কার্নিস থেকে লোহার শিক গাঁথা পাঁচিলে নামা সম্ভব, ওখান থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পৌছানো পানির মত সহজ ব্যাপার। তাই করবে বলে স্থির করল ও। হলঘর দিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ নয়।

তার আগে দরজার তালাটা বন্ধ করতে হবে। ঘুরে দাঁড়াল রানা, দরজার দিকে এগোচ্ছে। অকস্মাৎ ঝনাৎ করে খুলে গেল দরজাটা। সাথে সাথে জ্বলে উঠল ঘরের আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার।

কচুপাতা রঙের শিফন পরা সুন্দরী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়। কাঁধে স্তূপ হয়ে আছে ববড্ চুল, তার পিছনে মুহূর্তের জন্যে একজন লোককে দেখতে পেল রানা, পরনে ড্রেসিং গাউন চোখে মুখে হতচকিত ভাব।

'খবরদার! নড়ো না!' বলল মেয়েটা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। হাতে একটা ছোট পিস্তল, রানার বুকের দিকে তাক করে ধরা। 'মাথার ওপর হাত তোলো।'

'গুড গড!' মেয়েটার পিছন থেকে বলল লোকটা। 'চোর! সিঁধেল চোর! সাবধান! এরা খুব বিপজ্জনক হয়।'

মাথার ওপর হাত তোলার সময় মেয়েটার দিকে চোখ রেখে হাসল রানা। স্মরণ করতে চাইছে, এর আগে কোথায় দেখেছে লোকটাকে। চেনা চেনা লাগছে।

'পুলিসকে ফোন করো, রহমান,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল মেয়েটা। 'ওকে আমি পাহারা দিচ্ছি।'

মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কামরার ভেতর ঢুকল লোকটা। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক, ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছে ও, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সেক্রেটারি, মোখলেসুর রহমান।

'তুমি পাগল হলে নাকি!' ভদ্রলোক আঁতকে উঠে বললেন, 'পুলিস? অসম্ভব! ছেড়ে দাও ওকে, চলে যাক...'

'বুদ্ধির কথা, মিস্টার রহমান,' হেসে উঠল রানা। 'কেলেঙ্কারির ঝুঁকি নেয়াটা উচিত হবে না আপনার।'

'কিন্তু সার্চ করা দরকার ওকে,' প্রতিবাদের সুরে বলল মেয়েটা। 'নিশ্চয়ই পকেটে কিছু ভরেছে ও।'

'ওসব আমার দ্বারা হবে না,' ভদ্রলোক বললেন। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছেন তিনি। তারপর রানার দিকে ফিরে বললেন, 'এই যে, বেরোও এখান থেকে!' দু'পা সামনে এগিয়ে এসে একপাশে খানিকটা সরে দাঁড়ালেন। হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন দরজাটা। 'যাও, ভাগো এখান থেকে!'

'আপনার কোন আপত্তি নেই তো?' মুচকি হেসে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে পড়ে গুলি খেতে চাই না আমি।'

ভদ্রলোকের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে মেয়েটা। এখনও ধরে আছে রানার বুকের দিকে পিস্তলটা। 'ভাগ্যটা ভাল তোমার। হ্যাঁ, যেতে পারো তুমি।'

কিন্তু কোথায় যেন একটা মস্ত গোলমাল আছে। হঠাৎ পরিষ্কার বুঝে ফেলল রানা, মেয়েটা গুলি করতে যাচ্ছে। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুলটা, সাদা হয়ে গেছে সেটার ডগা। চোখে আশ্চর্য একটা নির্দয় উল্লাস। এই উল্লাস এর আগেও খুনেদের চোখে দেখেছে সে।

বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলল রানা। বুঝতে পারল, কেন তাকে পাঠানো হয়েছে এখানে, কি ঘটতে যাচ্ছে, ফাঁদটা আসলে কি। মেয়েটা খুন করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিকে, তার দায় কাঁধে নিতে হবে রানাকে।

'সরে যান!' চিৎকার করে বলল রানা। বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিয়ে পড়ল মেয়েটার দিকে। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে এক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলেছে রানা।

স্যাঁৎ করে ঘুরে গিয়েই গুলি করল মেয়েটা। দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপতে যাচ্ছে, রানা তার কব্জি ধরে ফেলে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি মারল। ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা। তাল রাখতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল রানা, দু'পা সরে গিয়ে পতনটা রোধ করল কোনরকমে।

হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেছে মোখলেসুর রহমানের। তার বুকের ওপর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। ট্যাপের পানির মত হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেটা থেকে। হুড়মুড় করে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল প্রাণহীন শরীরটা।

দরজার দিকে ডাইভ দিল রানা। ঠিক সেই সময় চিৎকার শুরু করল মেয়েটা।

আট

তিন লাফে সিঁড়ি টপকে হলঘরে নেমে এল রানা। সাথে সাথেই ধক করে উঠল বুক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তায় বেরুবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিম্পাঞ্জী। রাবারের মত পুরু ঠোঁট দুটো দু'দিকে প্রসারিত করে নিঃশব্দে হাসছে সে। 'ছুটোছুটি করে লাভ নেই, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো,' ঘড়ঘড়ে, কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। 'কোথাও যাচ্ছ না তুমি।'

শিম্পাঞ্জীর শরীরের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বুঝতে পারল রানা, সাথে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। কোনরকম ইতস্তত করল না ও, জানে প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মূল্যবান, দৃঢ় পায়ে এগোতে শুরু করল ওর দিকে।

প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক, এবং হুঁশিয়ার। একে ধোঁকা দিয়ে পালানো যাবে না। পালাতে হলে একে কাবু করতে হবে আগে। কিন্তু এগোবার সময় শিম্পাঞ্জীকে যেভাবে হাত তুলে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি করতে দেখল, মুহূর্তে বুকটা দমে গেল রানার। শরীরটা সামনের দিকে বাঁকা করে অদ্ভুত একটা আকৃতি নিয়েছে লোকটা। একহাত মুষ্টিবদ্ধ, অপর হাত খোলা, আঙুলগুলো সামান্য একটু বাঁকা হয়ে আছে ভেতরের দিকে। সাভাতে স্টান্স। আন-আর্মড কমব্যাটে কারও চেয়ে কম নয় সে, বোঝা যাচ্ছে।

কনুই ভাঁজ করা হাত দুটো মুখের সামনে তুলে নাড়ছে রানা, যেন বক্সিং ছাড়া কিছুই জানে না; সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে। অকস্মাৎ ডান হাত লম্বা করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি চালাল ও। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সাথে ঘুষিটাকে ঠেকিয়ে দিল শিম্পাঞ্জী, একই সাথে পাল্টা ঘুষি চালাল সে-ও। আঘাতটা আসতে দেখল রানা, কিন্তু একটু দেরিতে। বুঝতে পারল, সরাসরি বাধা দেবার সময় পেরিয়ে গেছে। উঁচু করে দিয়ে কাঁধের ওপর ঘুষিটাকে নিল ও। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলল, ছিটকে এল পিছন দিকে। আশা করল, এবার এগিয়ে আসবে লোকটা, কিন্তু তা সে এল না। নিজের জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে, নিষ্প্রাণ ঠোঁট জোড়া ফাঁক করে হাসছে নিঃশব্দে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, রানার পথ আগলে রাখতে চায়। আর কিছু না।

আবার এগিয়ে আসছে রানা। লোকটাকে খলখল করে হেসে উঠতে শুনে গা শির শির করে উঠল রানার। বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল শিম্পাঞ্জীর দুটো হাত। মাথার একপাশে এসে লাগল বাঁ-হাতি পাঞ্চটা। ডান-হাতি সাভাতে চপ্ আসতে দেখে সামান্য একটু সরে গেল ও। হুস করে বাতাস কেটে কাঁধের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। মার খাওয়াটা সার্থক হলো রানার। বাঁ এবং ডান দুই হাতে লোকটার পাঁজরে দমাদম গোটা চারেক ঘুষি বসিয়ে দিয়েই স্যাৎ করে নাগালের বাইরে চলে এল ও।

রাবারের ঠোঁট থেকে মুছে গেছে হাসিটা। মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কয়েকবার আওয়াজ ছাড়ল সে নাক দিয়ে।

লোকটার আসুরিক শক্তির মুখোমুখি হওয়া সাংঘাতিক ঝুঁকির ব্যাপার, বুঝতে পারছে রানা। কিন্তু উপায় নেই, যা করার এখুনি করতে হবে, দেরি হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। অত্যন্ত নিখুঁত একটা ফাঁদ পেতে রেখেছে ওরা, নিশ্চয়ই পুলিসে খবর দিতেও ভুল বা দেরি করেনি। আবার এগোচ্ছে ও, এবার এগিয়ে আসছে শিম্পাঞ্জীও। বুলেটের মত ছুটে এল তার ডান হাতটা, এক হাত দিয়ে সেটাকে ঠেকিয়ে অপর হাতটা দিয়ে গলায় একটা পাঞ্চ কষাল রানা। টলে উঠে হাত দুটো নামিয়ে নিল শিম্পাঞ্জী। লাফ দিয়ে এগোল রানা, দাঁতে দাঁত চেপে সর্বশক্তি দিয়ে মারল চোয়ালে। ঘুষিটা আসছে টের পেয়ে কাঁধ তুলে সেটাকে ঠেকতে চেষ্টা করল লোকটা। তার কাঁধে লেগে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ল আঘাতটা, কিন্তু মারাত্মক চোট পেয়েছে লোকটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছে বুঝতে পেরেও গ্রাহ্য করল না ও পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল, ভুল করে বসেছে। ধীরে ধীরে শরীরের চারদিকে এঁটে বসছে বজ্র-কঠিন আলিঙ্গন। বুনো একটা ভাল্লুক যেন জড়িয়ে ধরে পিষে মারছে ওকে।

মন্থরভাবে চাপ বাড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে রানার শিরায় উপশিরায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড চাপে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পাঁজরগুলো, হাড় বেঁকে যাওয়ার চড়চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, মট্ করে যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। হাঁসফাঁস করছে রানা। লোকটার থুতনির নিচে হাতের তালু ঠেকিয়ে ওপর দিকে ঠেলা দিচ্ছে ও,

পিছন দিকে সরিয়ে দিচ্ছে মাথাটাকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দু'জন দু'জনের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। দু'জনের গায়ের জোর প্রায় সমান, কেউ কাউকে পিছু হটাতে পারছে না। কিন্তু শিম্পাঞ্জী তার সবটুকু শক্তি ব্যয় করছে রানাকে ধরে রাখার জন্যে, আর রানা তার শক্তি ব্যয় করছে প্রতিপক্ষকে ব্যথা দিয়ে সরিয়ে দেবার জন্যে। অবশেষে আলিঙ্গন ঢিল করতে হলো শিম্পাঞ্জীকে। চিবুকের নিচে নার্ভ সেন্টারে চাপ পড়তেই টলতে টলতে এলোমেলো পা ফেলে পিছু হটতে শুরু করল সে, এই সুযোগে বাম হাতটা চালাচ্ছে রানা সমানে, প্রত্যেকটা ঘুষি পড়ছে পাঁজরের একই জায়গায়। ক্রমে শরীরটা ঘুরে যাচ্ছে লোকটার। ধাক্কা খেয়ে হাঁটু আর কনুই দিয়ে পড়ল মাটিতে। সাথে সাথে মেঝের ওপর এক গড়ান দিয়ে দ্রুত আবার উঠে বসার চেষ্টা করল।

আর সময় নষ্ট না করে দরজার দিকে ছুটল রানা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে ফুটপাথ থেকে উঠে আসছে চারজন খাকী ইউনিফর্ম পরা পুলিস।

থামল না রানা, দৌড়ের মধ্যেই বন্ করে আধপাক ঘুরল, লাফ দিয়ে টপকাল শিম্পাঞ্জীকে, আরেক লাফে সোজা গিয়ে ঢুকল অটোমেটিক লিফটের ভেতর। বোতামের ওপর থাবা মারছে ও, এই সময় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পুলিস হলঘরে। লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একজন পুলিস চিৎকার করে উঠল। তার পাশ থেকে ডাইভ দিল আরেকজন।

হাঁপাচ্ছে রানা। টপ ফ্লোরের বোতামটা টিপে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিল ও। সাবলীল গতিতে উঠে যাচ্ছে লিফট।

লিফটের সাথে প্রায় একই সময়ে সিঁড়ি বেয়ে টপ ফ্লোরে উঠে আসবে ওরা, আন্দাজ করল রানা। ম্যাপে ছাদে ওঠার কোন সিঁড়ি দেখেনি ও। টপ ফ্লোরে উঠে দু'দশ সেকেণ্ড সময় হাতে পাওয়া গেলেও পুলিসের চোখকে কিভাবে ফাঁকি দেবে ভেবে পাচ্ছে না রানা।

টপ ফ্লোরে উঠে এল লিফট। দরজা খুলে যেতেই মাথা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে প্রথমেই ভারী বুট জুতোর শব্দ পেল ও, তিন তলা থেকে চারতলায় উঠে আসছে পুলিস। দ্রুত লম্বা করিডরের এদিক ওদিক তাকাল ও। দুই প্রান্তে দুটো জানালা, কিন্তু দুটোই বন্ধ। পায়ের শব্দ সিঁড়ির মাথার কাছে চলে এসেছে। কাছিমের মত মাথাটা স্যাৎ করে লিফটের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল দরজা দ্রুত নামতে শুরু করল লিফট।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থামল লিফট। বোতামে হাত রেখে অপেক্ষা করছে রানা। দরজাটা সরে যাচ্ছে একপাশে। হলঘরে শিম্পাঞ্জী নেই, কিন্তু রাস্তায় নেমে যাবার সিঁড়ির মাথায় ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিস। লোকটা ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছে, এই সময় সেকেণ্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে আবার বন্ধ করে দিল দরজাটা।

আবার উপরে উঠছে লিফট। ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে রানা। কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়েনি। জানে, কোনমতেই পুলিসের হাতে ধরা পড়া চলবে না। ধরা পড়লে

খুনের অভিযোগে বিচার হবে ওর। ওর নির্দোষিতা সম্পর্কে কেউ একটা টুঁ-শব্দও করবে না। কর্নেল শফি হয়তো স্বীকারই যাবেন না যে তিনি ওকে চেনেন।

তিন তলায় উঠছে লিফট। থামতেই দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। লম্বা করিডর। ফাঁকা। দুই প্রান্তে দুটো জানালা। একটা খোলা।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। উপর-নিচে চারদিকে চিৎকার, হৈ-চৈ। এক ছুটে খোলা জানালার সামনে চলে এল সে। পায়ের আওয়াজটা এখনও নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। গ্রিলের স্ক্রু খুলতে হবে। দ্রুত পকেট থেকে ক্যানভাস জড়ানো যন্ত্রপাতির ছোট ব্যাগটা বের করল। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে চেষ্টা করতেই খুলে গেল গ্রিলটা।

মাথা বের করে বাইরে উঁকি দিল রানা। নিচে অন্ধকার, কিছুই ভালমত ঠাহর করা যাচ্ছে না। জানালার পাশে তাকাল ও। পানির একটা পাইপ দেখা যাচ্ছে, জানালার কার্নিস থেকে নাগাল পাওয়া যেতে পারে। লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে বসল ও। কার্নিসের শেষ মাথায় গিয়ে উঠে দাঁড়াল, দু'হাত লম্বা করে দিয়ে আলিঙ্গন করল দেয়ালকে। খাড়া দেয়াল, ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারল না। পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে কার্নিস থেকে লাফ দিল ও, ডান হাতের পাঁচটা আঙুল আঁকড়ে ধরল পাইপের গা। ঝুলে পড়ল শরীরটা। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল হাতে, সড় সড় করে হাত দুয়েক নেমে এল নিচের দিকে। পাইপের একটা গাঁটে এসে ঠেকেছে হাতটা, বন্ধ হয়ে গেছে পিছলে নেমে যাওয়াটা। হু হু করে জ্বালা করছে হাতের তালু, মরচে ধরা কর্কশ পাইপে ঘষা খেয়ে চামড়া ছড়ে গেছে।

শরীরটা স্থির হতেই দুই হাত দিয়ে ধরল রানা পাইপটা। পা দুটো ঝুলছে। তরতর করে নেমে আসছে নিচে। আরেকটা সংযোগের স্পর্শ পেয়ে সেখানে পা রাখল ও। নিচের দিকে তাকাতেই অন্ধকারে কি যেন নড়ে উঠতে দেখল। তিন সেকেণ্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর ছলকে উঠল বুকের রক্ত। নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে শিম্পাঞ্জী।

সাথে সাথে নড়ে উঠল রানা। দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। জানে, ছাদে ওঠা মানে নিজের চারদিকে বিপদের বেড়াটাকে আরও ছোট করে আনা। কিন্তু এছাড়া এখন আর কোন উপায়ও নেই।

আবার জানালাটার পাশে চলে এসেছে রানা। ওর ডান দিকে আরেকটা জানালা, এটা একেবারে কাছাকাছি, হাত বাড়ালেই নাগাল পাবে ও। ভাবছে বাইরের দিক থেকে ওটা খোলা গেলে···ঠিক এই সময় পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল একটা মেয়ে। পরমুহূর্তে তার পাশে এসে দাঁড়াল এক যুবক। লাজুক লাজুক চেহারা মেয়েটার, যুবকের মধ্যে বুক টান করা একটা ভাব। বোধহয় নতুন বিয়ে হয়েছে।

কি যেন বলল মেয়েটা, তাই শুনে হা হা করে হাসছে যুবক। নড়তে পারছে না রানা, নড়লেই ওদের চোখে পড়ে যাবে ও। হাসি থামিয়ে যুবক বলল, 'এত ভয় করো তুমি?'

রানা অনুমান করল, বোধহয় তার ব্যাপারেই আলোচনা করছে ওরা। ঠিক

সেই মুহূর্তে ওকে দেখে ফেলল যুবক। ভুরু কুঁচকে দুই সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর চেঁচিয়ে উঠে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

'ও-ও-রে শালা, তুমি এখানে ঘাপটি মেরে আছ?'

'এই, কি করছ, না...' ভয় পেয়ে বলে উঠল মেয়েটা।

দ্রুত উঠতে শুরু করেছে রানা, তাই দেখে চিৎকার জুড়ে দিল যুবক, 'ধর! ধর! চোর! পালাল! পুলিস! অ্যাই শালা,' খপ্ করে রানার মাথার চুল ধরে ফেলল। 'খবরদার! এবার! পুলিস! বাঁচাও!'

এই বিপদের মধ্যেও হাসি পাচ্ছে রানার। পাইপ থেকে নামিয়ে একটা হাত নিজের মাথায় আনল ও। যুবকের আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে অকস্মাৎ মোচড় দিতেই মট্ করে ভেঙে গেল তার দুটো আঙুল। 'মরে গেলাম! বাঁচাও! মেরে ফেলল!...' চেঁচাচ্ছে যুবক। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে তর তর করে পাইপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে রানা।

ছাদে উঠতে তেমন বেগ পেতে হলো না ওকে। নিচ থেকে হুইসেলের আওয়াজ ভেসে আসছে অনবরত। ঘ্যাচ, করে ব্রেক কষার শব্দ হলো, বোধহয় আরেক গাড়ি এল পুলিস।

যা ভেবেছিল, ছাদে ওঠার কোন সিঁড়ি নেই। দ্রুত উল্টোদিকের কিনারায় চলে এল ও। নিচে একটা ছোট মাঠ, ওপারের বাড়িটা অনেক দূরে। ছাদের আরেক কিনারায় এসে দাঁড়াল ও। ফ্ল্যাটবাড়িটার পিছন দিক এটা। নিচে একটা গলি, খুব চওড়া নয়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উল্টোদিকের বাড়িটা একই সমান, কিন্তু মাঝখানের ফাঁকটা এক লাফে পেরোন সম্ভব কিনা বুঝতে পারছে না ও।

অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না, তবে দূরত্বটা বারো-তেরো হাতের কম নয়। মনে মনে তৈরি হচ্ছে রানা, সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। ঝুঁকে পড়ে ভাল করে তাকাতে গিয়ে ঢোক গিলল একটা। উল্টোদিকের ছাদের কার্নিসটা কংক্রিটের তৈরি হলেও লাফ দিয়ে পড়লে ওর ওজন সহ্য করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখান থেকে যতদূর বোঝা যাচ্ছে, মাত্র তিন ইঞ্চি পুরু ওটা।

ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে শব্দটা। ফায়ার ব্রিগেড! পুলিস এবার ছাদে উঠবে। বারো,না, তেরো হাত...ভাবছে রানা। পারবে সে? পিছিয়ে আসছে ও। আবোলতাবোল বিক্ষিপ্ত চিন্তা এসে অস্থির করে তুলছে মনটাকে। এ তো স্রেফ আত্মহত্যা! নাকি পারবে? পিছু হটার আর জায়গা নেই, কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকাল একবার। আলোকিত রাস্তায় গিজগিজ করছে খাকী পোশাক। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে কেউ কেউ। ওকে উঁকি মারতে দেখে একটা শোরগোল উঠল তাদের মধ্যে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। মনে পড়ল, লং জাম্পে এগারো-বারো হাত দূরত্ব এর আগেও পেরিয়েছে সে। আজ বিপদের সময় তেরো হাত কেন পেরোতে পারবে না? এত ওপরে মাধ্যাকর্ষণের টান কিছুটা কম থাকার কথা নয়? আত্মরক্ষার সময় সমস্ত নৈপুণ্যের রেকর্ড ভাঙতে পারে মানুষ, সে নিজেও তো বহুবার তা প্রমাণ

করেছে। তাছাড়া, দূরত্ব হিসাব করতে ভুল হয়ে থাকতে পারে তার। হয়তো বারো হাতই, তেরো হাত নয়। ঠিক মত লাফ দিতে পারলে আধহাত কার্নিসের ওদিকেই হয়তো পড়বে সে।

চোখ বুজল রানা। বুক ভরে শ্বাস নিল। ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল একবার। তারপর সাহসে বুক বেঁধে শুরু করল দৌড়।

তীর বেগে ছুটছে রানা। তেরো হাত দূরত্ব পেরিয়ে যেতে পারবে, সে-ব্যাপারে এখন আর তার মনে কোন সন্দেহ নেই। সামনে দেখা যাচ্ছে ছাদের কিনারা। সেখানে পা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও।

অনন্ত যুগের মত লাগছে মুহূর্তগুলোকে। ঠিক কার্নিসের ওপর পড়ল ও, স্প্রিংয়ের মত ঝাঁকি খেলো পা দুটো, ডিগবাজি দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল ছাদের ওপর। সিঁড়ির দরজাটা খোলা। নিজের পিঠে দুটো চাপড় মেরে ছুটল সেদিকে। চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জোড়া পায়ের শব্দ, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ছাদে। মরিয়া হয়ে চারদিকে তাকাল ও। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না, মনে হচ্ছে বুকটা ফেটে যাবে। গা ঢাকা দেবার মত কোন জায়গা নেই ছাদের কোথাও। আর দুই সেকেণ্ড, তারপরই ছাদে উঠে আসবে পুলিস। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে রানা।

'দমকল আইসা গেছে, যাইব কই বাছাধন!'

দরজার আড়ালে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। দম আটকে রেখেছে।

'লাশের সাথে পিস্তলটা রেখে গেছে,' এটা অন্য একজনের কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু আরেকটা পিস্তল থাকতে পারে ওর কাছে।'

টর্চের আলো পড়ল ছাদে। পায়ের শব্দগুলো এগোচ্ছে। নিঃশব্দে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। থামেনি ওরা, সোজা এগোচ্ছে ছাদের কিনারার দিকে। দরজা টপকে সিঁড়িতে চলে এল রানা। দ্রুত নামছে। এখনও হুইসেল বাজছে চারদিকে।

একতলা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নেমে এল রানা, কারও সাথে দেখা হলো না। দরজাটা করিডরের শেষ মাথায়, বাইরে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। অলস ভঙ্গিতে দরজার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একজন পুলিস। সন্তর্পণে এগোল রানা। দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, উঁকি দিয়ে তাকাল বাইরে। মাথাটা ফিরিয়ে নিল সাথে সাথে। অসম্ভব, গলির ভেতর গিজগিজ করছে পুলিস! দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত চিন্তা করছে ও। কি করা যায়! কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেয়ে যাবে পুলিস, ছাদে নেই ও। সাথে সাথে আশপাশের বাড়িগুলো সার্চ করতে শুরু করবে।

সমস্যার সমাধানটা নিজে নিজেই হেঁটে চলে এল রানার কাছে। দরজা টপকে করিডরে পা রাখল একজন সেপাই। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। ছাদে উঠবে। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ের পেছনে প্রচণ্ড এক রদ্দা মারল সে। অজ্ঞান শরীরটা ধরে ফেলে পতনটা রোধ করল। দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথা মনে হলো, কিন্তু তা না করে লোকটাকে টেনে নিয়ে চলল করিডরের আরেক দিকে।

সিঁড়ির নিচে চমৎকার একটা আড়াল পাওয়া গেল, তিন মিনিটের মধ্যে লোকটাকে দিগম্বর বানিয়ে তার পোশাক পরে নিল ও। একটু আঁটসাঁট হলো, কিন্তু আবছা আলোয় দেখলে তা কারও নজরে পড়বে না। জুতো জোড়া ট্রাউজারে জড়িয়ে নিয়ে বগলের নিচে রাখল, তারপর ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল পুলিসের লাঠিটা। সিঁড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে এল ও। করিডর পেরিয়ে দরজার সামনে চলে এল, এবার আর উঁকি দিল না, সোজা বেরিয়ে এল বাইরে।

রাস্তার একটা দিক একেবারে ফাঁকা, আরেকদিকে চার-পাঁচজন পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে টর্চ, দু'দিকের বাড়ির ছাদগুলোয় আলো ফেলে দেখছে। পিছন ফিরল রানা, ধীরে ধীরে হাঁটছে। দশ গজ এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। দু'জন পুলিস সোজা ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। ঘুরল রানা, ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কে, রাখাল?' হাঁক ছাড়ল একজন পুলিস। 'তাড়াতাড়ি এসো, শালাকে নাকি দেখা গেছে ছাদে।'

যে-বাড়িটা থেকে বেরিয়েছে রানা, সেটার ভেতর ঢুকছে কনস্টেবল দু'জন। 'তাই নাকি?' গলায় চাপা উত্তেজনা এনে বলল রানা, 'তোমরা দৌড় দাও, আমি আসছি।'

দরজা টপকে বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল ওরা। ঘুরে দাঁড়াল রানা। হনহন করে হাঁটছে। বাঁকটা দেখা যাচ্ছে সামনে। হঠাৎ সেখানে একজন পুলিস অফিসারকে দেখা গেল। দৌড়ে বাঁক নিয়ে এগিয়ে আসছে। ঠিক পাশ কাটাবার সময় রানাকে দেখতে পেল সে, সাথে সাথে খেঁকিয়ে উঠল, 'ওদিকে কি! আমার সাথে এসো!'

'ইয়েস, স্যার!' বলল রানা। কিন্তু অফিসারকে অনুসরণ না করে রাস্তার ওপর বসে পড়ল। জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করছে, কিন্তু তাকিয়ে আছে অফিসারের দিকে। পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালই না সে। সোজা দৌড়াচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত এগোচ্ছে বাঁকটার দিকে।

গলিটা ছোট। শেষ মাথাটা মেইন রোডের সাথে মিশেছে। সীটের ওপর বসে টুং-টাং করে অলস ভঙ্গিতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে একজন রিকশাওয়ালা। রানাকে আসতে দেখে কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল সে। বেলের ওপর হাতটা স্থির হয়ে গেছে, গলাটা লম্বা করে দিয়ে দেখছে রানাকে। পুলিস কনস্টেবল সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল সে, সীট থেকে নামার উদ্যোগ করছে। দ্রুত উঠে পড়ল রানা রিকশাটায়, বলল, 'রমনা থানা।'

'হ, সাব,' বলেই প্যাডেলে চাপ দিল রিকশাওয়ালা। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ রিকশা চালাবার পর জানতে চাইল সে, 'চিক্কুর, আঙ্গামা, লৌড়ালৌড়ি—কি অইতাছে, সাব?'

'খুন।'

প্যাডেল থেকে পা হড়কে গেল রিকশাওয়ালার। 'কন কি, সাব, এক্কেরে মাঠার? হালারে ধরছেন?'

কোন জবাব নেই। আরও দু'একটা প্রশ্ন করল রিকশাওয়ালা, কিন্তু কোনটারই যখন উত্তর পেল না, ঘাড় ফিরিয়ে চট্ করে পিছন দিকে তাকাল এবার। সাথে সাথে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। প্যাসেঞ্জার গাড়িতে নেই। ব্রেক করে রাস্তার একধারে রিকশা দাঁড় করাল সে। একটা হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে। খুঁজছে। কিন্তু কোন খাকী পোশাক ধরা পড়ল না তার চোখে।

রিকশা থেকে নেমে বাকি পথটা হেঁটে কাকরাইলে পৌছুল রানা।

বাঁক নেবার মুখে একটা বাড়ির গেটে গা ঢাকা দিল ও, উঁকি দিয়ে দেখে নিল দুদিকের রাস্তাটা। কেউ নেই। গেটের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল, একটা দেয়াল ঘেঁষে খানিক দূর এগোবার পর লোহার গেটটা দেখে দাঁড়াল ও। ভেতর থেকে বন্ধ সেটা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে গেট টপকে উঠনে নামল ঝপ্ করে। নির্জন সিঁড়ি বেয়ে টপ ফ্লোরে উঠে এল ও। কলিংবেলের বোতামে আঙুল রেখে চাপ দিল। তারপর পিছিয়ে এসে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল নিচের দিকে। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত। কেউ নেই।

পাতলা ঘুম, দ্বিতীয়বার কলিংবেল বাজাতে হলো না। দরজা খুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রূপা।

'হ্যালো,' বলল রানা। 'আগেই জানিয়ে রাখছি, আমার কোন বদ মতলব নেই, যদি অনুমতি দাও তো ভেতরে ঢুকি।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল রূপা। অবাক হয়েছে, কিন্তু চেহারায় এখন আর তার কোন ছাপ নেই। 'এসো,' মৃদু গলায় বলল সে। সরে দাঁড়াল এক পাশে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ছিমছাম ভাবে সাজানো কামরার চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রূপার দিকে ফিরল। 'কর্নেলকে ডেকে পাঠাও এখানে,' বলল ও। বগলের নিচে থেকে ট্রাউজারে মোড়া জুতো জোড়া ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। 'সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়েছি আমি।'

'ওরা হয়তো ফ্ল্যাটের ওপর নজর রেখেছে,' মৃদু গলায় বলল রূপা। 'ব্যাপারটা কি এতই জরুরী?'

হেসে উঠল রানা। 'ফ্ল্যাটের ওপর নজর রেখেছে তো কি হয়েছে? তোমার ঘরে রাত-দুপুরে মেহমান আসতে পারে, তা তো ওদের জানাই আছে?' একটু গম্ভীর হলো ও। 'হ্যাঁ, জরুরী। তাঁর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। এখানে চাই কর্নেলকে।'

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে দু'সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রূপা, তারপর নিঃশব্দে এগোল টেলিফোনের দিকে। শান্তভাবে ডায়াল করল সে, অপেক্ষা করল, তারপর মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে কথা বলল। ইতিমধ্যে খাটের নিচ থেকে ইলেকট্রিক স্টোভটা বের করে ফেলেছে রানা।

'কর্নেল আসছেন,' রিসিভার রেখে দিয়ে বলল রূপা। 'কি করছ তুমি?'

'তোমাকে চা খাওয়াব,' মুখ তুলে বলল রানা। 'কেটলি ইত্যাদি সব কোথায়

যদি বলো...'

একটা আরাম কেদারা দেখিয়ে বলল রূপা, 'ওখানে বসো।'

কথা না বলে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে বসল আরাম কেদারায়। 'খবরটা বোধহয় পাওনি এখনও?'

স্টোভে চায়ের পানি চড়াচ্ছে রূপা, মুখ তুলে জানতে চাইল, 'কিসের খবর?'

টেবিল থেকে গোল্ডলিফের একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে খুলল রানা। একটা সিগারেট বের করে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তার আগে বলো, মোখলেসুর রহমান নামটা তোমার কাছে পরিচিত লাগছে কিনা।'

একটু চিন্তা করল রূপা। 'কার কথা বলছ বুঝব কিভাবে?'

'বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের...'

'হ্যাঁ, সেক্রেটারি,' বলল রূপা। 'কি হয়েছে?'

'খানিক আগে খুন হয়েছেন ভদ্রলোক,' বলল রানা। নিজের বুকে বুড়ো আঙুল দিয়ে টোকা মারল ও। 'তাঁকে খুন করার অভিযোগে পুলিস আমাকে খুঁজছে।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রূপা; ভাবের লেশমাত্র নেই চেহারায়। বলল, 'চায়ের সাথে আর কিছু খাবে তুমি?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ভুরু কুঁচকে কিচেনের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কোন প্রশ্ন নয়, কোন জেরা নয়, স্রেফ ওর প্রয়োজনের দিকে খেয়াল! আজ আবার নতুন করে উপলব্ধি করল ও, রূপার মনের গভীরে ডুব দেয়া সহজ কাজ নয়। এ এক আশ্চর্য মেয়ে। ইস্পাতের মত কঠিন ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তার ভেতর রয়েছে আশ্চর্য কোমল এক মমত্ববোধ।

পোশাক পাল্টে আরাম কেদারায় বসল রানা। হেলান দিল। মাথার একটা পাশ ব্যথা করছে। ছুটোছুটির চেয়ে উত্তেজনাই ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে।

একটা পিরিচে দু'টুকরো কেক আর এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে এল রূপা। টেবিলের ওপর রানার নাগালের মধ্যে রাখল সেগুলো। 'ঘরে আর কিছু নেই।'

এক টুকরো কেক তুলে নিয়ে কামড় বসাল রানা। 'কর্নেল কি এক্ষুণি আসছেন?'

'দশ মিনিটের মধ্যে।'

টেবিলের ওপর দু'কাপ চা রাখল রূপা। রানার সামনে একটা কাঠের চেয়ারে বসল। পাশেই একটা জানালা, পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। নিঃশব্দে চা-টুকু শেষ করল ওরা।

টেবিলের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। 'সিগারেট চলবে?' জানতে চাইল ও।

পর্দার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে রানার দিকে তাকাল রূপা। 'না।'

'কর্নেল সম্ভবত রেগে আগুন হয়ে যাবেন আমার ওপর,' সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা। 'সমস্ত ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তার ওপর সাংঘাতিক একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। তিনিই আমাকে এর মধ্যে ঢুকিয়েছেন, সুতরাং আমি আশা করব তিনিই উদ্ধার করবেন।'

'চিন্তা করো না,' মৃদু কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল রূপা। 'যাই ঘটে থাকুক, কর্নেল তোমাকে বিপদ থেকে বের করে আনবেন।'

'ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখছ তুমি,' বলল রানা। 'এটা একটা মার্ডার কেস। যেখানে খুন হয়েছে সেখান থেকে পুলিস আমাকে পালাতে দেখেছে। আমার রক্তের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠবে কিছু লোক।'

'শুধু তোমার নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল রূপা। 'কিছু লোক কর্নেলেরও রক্ত চাইবে। কর্মীদের পেছনে লুকিয়ে থাকা তাঁর স্বভাব নয়, তুমি জানো।'

হঠাৎ স্বার্থপর বলে মনে হলো নিজেকে রানার। এতক্ষণ শুধু নিজের কথাই ভাবছিল ও। কর্নেলও যে বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁর বিপদ যে ওর চেয়ে বেশি, সে-কথা একবারও মনে পড়েনি ওর। কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'কর্নেল যে ইনফরমেশন আমাকে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে গলদ ছিল। ওরা আমাকে দলে তো নিলই না, উল্টে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবার জন্যে ফাঁদ পাতল। ভাগ্য ভাল, তাই কোনরকমে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু কতক্ষণের জন্যে, সেটাই হলো প্রশ্ন। কর্নেল যদি এড়িয়ে যেতে চান, ঝপ্ করে পানিতে পড়ব আমি।'

'বিপদ দেখে চোখ উল্টে নেবেন, কর্নেল সেরকম মানুষই নন,' আবার বলল রূপা। 'তাছাড়া, তোমার বেলায় তো সে প্রশ্ন ওঠেই না। অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমাকে তিনি।'

'কর্নেল? আমাকে? স্নেহ করেন?' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'কিছুই দেখছি জানো না তুমি! আমি একজন কুখ্যাত লোক, সেজন্যেই আমাকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এর পেছনে স্নেহ বা আর কোন কারণ নেই। প্যাঁচ মেরে কাজ আদায় করে নিচ্ছেন আমার কাছ থেকে। যা ঘটেছে, শোনা মাত্র আমাকে হয়তো গুলি করতে চাইবেন।'

রানার রসিকতায় কিন্তু হাসল না রূপা। বলল, 'তুমি জানো না, কর্নেল তোমাকে সত্যি ভালবাসেন।'

'বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুনতে হবে!' একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'সে যাই হোক,' গম্ভীর হলো ও, বলল, 'একটা কাজ খুব অন্যায় করেছেন কর্নেল। তোমাকে এর মধ্যে ঢোকানো তাঁর উচিত হয়নি।'

এই প্রথম সামান্য একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল রূপা। ক্ষীণ একটু চড়ল গলাটা, 'তার মানে? কি বলতে চাও? ভেবেছ নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি না?'

'আহা, তা কেন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'রূপা অবলা নারী নয় তা আমি জানি।' নিজের গালে হাত বুলাচ্ছে ও। 'মনে পড়লে এখনও ব্যথা পাই এখানে। কিন্তু আমি বলতে চাই সবাই তো আর মাসুদ রানা নয়, শিম্পাঞ্জী আর হনুমানও আছে এই জঙ্গলে।'

'শিম্পাঞ্জী? হনুমান?'

'যারা আমাকে রাতদিন চোখে চোখে রেখেছে,' বলল রানা। 'ওরা ভয়ঙ্কর লোক, রূপা।'

হাসল রূপা। 'আজ তোমার হয়েছে কি বলো তো? নিজে বিপদে পড়েছ বলে চারদিকে সকলের জন্যে শুধু বিপদই দেখতে পাচ্ছ? ওদেরকে দেখেছি আমি। বেঁটে

লোকটার নাম খাদেম। বাহাত্তর সালে ভারত থেকে এসেছে, কোন একটা সেন্ট্রাল জেলের জল্লাদ ছিল। লম্বা লোকটার নাম নঈম। পাকিস্তান আমলে ফায়ারিং স্কোয়াডে ছিল, করাচী থেকে পালিয়ে এসেছে সে। দু'জনের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, অন্তত আমার তাই ধারণা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জেনেশুনে যদি বিপদের মধ্যে নাক গলাতে চাও, আমার কিছু বলার নেই,' রূপার অহমে আঘাত করে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে ও। 'কিন্তু কর্নেলের উচিত ছিল তোমার বদলে কোন পুরুষ মানুষকে বেছে নেয়া।'

রানাকে নিরাশ করে দিয়ে হেসে উঠল রূপা। 'আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তা করছ, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা একটু বেমানান হয়ে যাচ্ছে না কি? যে লোক প্রতি পদে নিজেই বিপদে জড়িয়ে পড়ে, অন্যের ব্যাপারে তার অতটা দুশ্চিন্তা করাটা হাস্যকর নয়?'

কালো হয়ে গেল রানার চেহারা। 'কি বললে? প্রতি পদে বিপদে জড়িয়ে পড়ি আমি?'

'শুধু তাই?' ভুরু নাচিয়ে বলল রূপা। 'সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এর তার ওপর নির্ভর না করেও পারো না।'

তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল কলিংবেল। প্রথমে একবার, তারপর একটু বিরতি দিয়ে পরপর দু'বার।

'ওই যে এসে গেছেন কর্নেল,' চেয়ার ছেড়ে একছুটে দরজার কাছে পৌঁছে গেল রূপা। খুলে দিল দরজা।

ঘরে ঢুকলেন কর্নেল শফিকুর রহমান। দরজা বন্ধ করে তাঁকে পাশ কাটিয়ে ধীর পদক্ষেপে পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল রূপা। রানা এবং কর্নেল পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'নরক ভেঙে পড়েছে আমার মাথার ওপর,' রূঢ় কণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'এর জন্যে তুমিই দায়ী।' পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। 'তোমার মতলবটা কি, রানা?'

'একটা ফাঁদ পেতে রেখেছিল ওরা, বুঝতে না পেরে তাতে পা দিয়েছি আমি,' বলল রানা। 'ভুলটা আমারই। রোববারে আফরোজা খানমের সাথে আমার একটা ডেট ছিল, আপনি জানেন। ওর ফ্ল্যাটে ওর ভাই ফখরুল আনসারী আর শ্যেন কাপালা নামে একজন থাই ছিল। শ্যেন কাপালা আমাকে দশ হাজার টাকার একটা কাজ দেয়। একটা মেয়ে এক লোককে ব্ল্যাকমেইল করছে, লোকটা শ্যেনের ক্লায়েন্ট, মেয়েটার বাড়ি থেকে কিছু চিঠি চুরি করে এনে দিতে হবে। প্রস্তাবটা পেয়ে আমি ধরে নিলাম, আমাকে ওরা টেস্ট করতে চাইছে। কাজটা করতে রাজী হলে শ্যেন আমাকে তাদের সংগঠনে ঢুকতে দেবে, এই রকম আশা করেছিলাম আমি। ওইখানেই ভুল করি। টেস্ট নয়, ফাঁদ। মোখলেসুর রহমানের খুনের দায় ঘাড়ে নেবার জন্যে আমাকে বাছাই করেছিল ওরা।'

'রোববারে শ্যেন কাপালার সাথে দেখা হয় তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'রূপাকে রিপোর্ট করোনি কেন? তুমি যদি খুন হতে? শ্যেন কাপালার নামটা

পর্যন্ত জানা হত না আমার। এটা যে একটা ভাইটাল ইনফরমেশন, বোঝোনি তুমি?'

'রাতটা আমি আফরোজা খানমের ফ্ল্যাটে কাটিয়েছি,' বলল রানা। 'ঠিক সেই সময় তথ্যটার গুরুত্ব আমি বুঝতে পারিনি।'

কঠোর দৃষ্টিতে রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে একটা আরাম কেদারায় বসলেন কর্নেল। 'রূপাকে যদি সব কথা জানাতে তুমি, তোমার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতাম আমি। সেক্ষেত্রে তোমার পক্ষে একজন সাক্ষী থাকত। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, এই রকম বোকামি তুমি করলে কিভাবে! তুমি এই ভুল করেছ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ভুল হয়েছে, প্রথমেই কি তা আমি স্বীকার করিনি, কর্নেল?' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কাজটা আমি নিতে চাইনি। আপনিই আমাকে জোর করে গছিয়েছেন।'

'তুমি জানো মোখলেসুর রহমান একজন কী-ম্যান?' বললেন কর্নেল। 'সরকার গোটা পুলিস বিভাগ আর আমাদের মত প্রতিষ্ঠানের ওপর খেপে আগুন হয়ে যাবে। তারপর সবাই যখন জানবে, এর সাথে আমি জড়িত, প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে উঠবে জবাবদিহি করতে করতে। ভুল তুমি একটা করোনি। ওই ফ্ল্যাটেরই এক ভদ্রলোক তোমাকে ঢুকতে দেখেছে ওখানে। পাশের বাড়ির নব-বিবাহিত এক দম্পতিও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে তোমার চেহারার। পুলিস জানে, খুনটা তুমি করেছ। আর সেই মেয়েটা অভিযোগ করেছে, তার বাক্সে অনেক টাকার জুয়েলারী ছিল, সব নিয়ে এসেছ তুমি। বলেছে, ঠাণ্ডা মাথায় মোখলেসুর রহমানকে খুন করেছ তুমি।'

'ওখানে কোন জুয়েলারী ছিল না, মোখলেসুর রহমানকেও আমি খুন করিনি,' বলল রানা।

'জানি। কিন্তু আমার জানায় কিছু এসে যায় না। অন্তত এই কেসে যায় না। ব্যাপারটা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু আমি তো বুঝতেই পারছি না কিভাবে তা সম্ভব!'

'খুন আমি করিনি, সুতরাং কোন না কোন ভাবে সেটা প্রমাণ করা সম্ভব,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা। কাজটা আপনার, তা করতে গিয়েই এই বিপদে জড়িয়ে পড়েছি আমি, সুতরাং আপনি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।'

পকেট থেকে একটা টোবাকো পাইপ আর পাউচ বের করলেন কর্নেল। ধীরেসুস্থে পাইপে তামাক ভরলেন তিনি। তারপর আগুন ধরিয়ে একমনে ধোঁয়া টানতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'কিভাবে উদ্ধার পেতে পারো ভেবেছ কিছু?'

'পুলিসকে সব কথা খুলে বলি আমি, আপনি আমাকে সমর্থন করে যাবেন,' বলল রানা। 'মেয়েটাকে শক্ত করে চেপে ধরলে ভাঙতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'তুমি যেমন ভাবছ, ব্যাপারটা অত সহজ নয়,' বললেন কর্নেল। 'গোটা ব্যাপারটাকে তুমি তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছ। কিন্তু আমি দেখছি অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে। একটা কথা বুঝতে পারছ না কেন, সংগঠনের ওরা এখনও টেরই পায়নি যে আমরা ওদের অস্তিত্ব বা তৎপরতার কথা জেনে ফেলেছি।

এই যে স্যাবোটাজ করছে, এই যে খুনগুলো করছে, ওরা ভাবছে আমরা মনে করছি এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নির্দিষ্ট একদল লোকের কাজ বলে সন্দেহই করিনি। ওদের ধারণা সংগঠনের অস্তিত্ব গোপন রাখা গেছে, আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। আমি যে ওদেরকে শিকার করতে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই পরিস্থিতিতে আমি যদি খোলস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তোমার কাহিনী সমর্থন করতে যাই, থলে থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে বিড়াল। ওদেরকে তখন ধরা আরও কঠিন হয়ে উঠবে। আমার ধারণা, দেশের স্বার্থেই এই মুহূর্তে সামনে আসা চলে না আমার।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। অস্বাভাবিক কঠোর দেখাচ্ছে ওকে। নিঃশব্দে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল, 'এক কথায়, স্পষ্টভাবে জবাব দেবেন। আপনি কি আমাকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিতে চান?'

ঘন ঘন পাইপে টান দিয়ে নিজের মুখের সামনে একটা স্মোকস্ক্রীন তৈরি করলেন কর্নেল। 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাকে, রানা, হ্যাঁ, আর কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে তোমাকে আমি নেকড়েদের মুখেই ঠেলে দিচ্ছি। ওই মেয়েটা, আফরোজা খানম, তার সাথে যদি মজে না যেতে, রূপাকে খবর দেবার কথা ঠিকই মনে পড়ত তোমার। আর খবর পেলে তোমাকে কাভার দেবার জন্যে লোকও পাঠাতাম আমি। গুলির শব্দ হওয়া মাত্র বাড়ির ভেতর ঢুকত সে, এবং খুনের অপরাধে গ্রেফতার করত মেয়েটাকে। তুমি হতে একজন সাক্ষী। এর মধ্যে আমার আসার কোন প্রয়োজনই হত না। যাই হোক, এখনকার পরিস্থিতি ঠিক তার উল্টো। এক দিকে তুমি, আরেক দিকে দেশ। তোমাকে আমি ভালবাসি, রানা। কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসি দেশকে। দুঃখিত।'

হঠাৎ নিঃশব্দে হাসল রানা। টেবিলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। খুক খুক করে অকারণে কাশল একটু। তারপর বলল, 'বেশ। কি আর করা। আপনার কাজটা হারালাম, সেটাই যা দুঃখের ব্যাপার। আবার ততটা মন খারাপ করারও কোন মানে দেখি না। কাজের তো আর কোন অভাব নেই। বিশেষ করে আমার মত লোকের। তাই না?' হাসছে ও।

গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন কর্নেল। রানার কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি। ধীরে ধীরে ভুরু কুঁচকে উঠছে তাঁর।

'আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না, পুলিসের কাছে গিয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলব, এই যে আমি এসেছি, মোখলেসুর রহমানকে খুনের অপরাধে দয়া করে গ্রেফতার করুন আমাকে?' বলে চলেছে রানা। 'তা যদি আশা করে থাকেন, আপনাকে বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারব না আমি। বুঝব, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। দেশের স্বার্থটা বড়, এ-কথা আপনার পক্ষে বলা সহজ। কারণ, আপনার প্রাণ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে না কেউ। ঝুঁকিটা আমার প্রাণের ওপর, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জিনিসটাকে আবার খুব বেশি ভালবাসি আমি, তাই এটাকে রক্ষা করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে আমাকে। আমার ধারণা, আপনার প্ল্যানটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, কর্নেল। সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'বুঝতে ভুল হয়েছে আমার,' অস্বাভাবিক গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল শফি।

'তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি আমার।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন,' বলল রানা। হাসছে ও। 'আমি একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, কিন্তু ইঙ্গিতটা বোধ হয় ধরতে পারেননি আপনি। আমার টাকা দরকার। যেখানে টাকা আছে, সেখানে আমি আছি। দুঃখিত, কর্নেল, আপনার মত দেশের প্রতি অতটা দরদ বর্তমানে আমার নেই। আমাকে বিপদে পড়তে দেখে আপনি যেমন নির্লজ্জের মত লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছেন, আমিও তেমনি নিজের প্রাণের তাগিদে আরেক জনের সাহায্য নেবার জন্যে দৌড়াতে যাচ্ছি। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন, কর্নেল?'

বিবর্ণ হয়ে গেছে কর্নেলের চেহারা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রানার মুখের দিকে।

'এই দেশটার সমস্ত ভালমন্দের সোল এজেন্সী নিয়ে বসে আছেন আপনি,' বলল রানা। 'দেশপ্রেমের নেশায় যাকে খুশি তাকে বলি দিতে বাধছে না আপনার। কিন্তু আপনাকে আমি একটু টাইট দিতে চাই। আপনার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। ওদের দলে যোগ দিচ্ছি আমি, কর্নেল। আপনি কি, কতটুকু জানেন না জানেন সব যদি ওদেরকে বলি, ওরা আমাকে নিশ্চয়ই খুব খাতির করবে। বারো নম্বরের কপালে কি ঘটেছে, জানতে চাইবে ওরা। বারো নম্বরের কথা মনে আছে আপনার? কথা আদায় করতে গিয়ে টরচার করে মেরে ফেলেছেন যাকে, আমি তার কথা বলছি। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে যাচ্ছে, তাও ওদেরকে আমার বলতে হতে পারে। ওদের বিশ্বাস আর খাতির প বার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে আমাকে, তাই না? চেষ্টার কোন ক্রটি করব না আমি, সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন আপনি। তারপর আপনার কোন্ জায়গাটায় আঘাত করতে হবে তা যদি বলি ওদেরকে, ওরা নিশ্চয়ই ভাল একটা ব্যবস্থা করবে আমার নিরাপত্তার জন্যে। গোটা একটা বাড়িই হয়তো ছেড়ে দেবে আমাকে, যেখানে দীর্ঘ দিন লুকিয়ে থাকতে পারব আমি। ব্যাপারটা কেমন হবে বলুন তো?'

কড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে নাকের একটা পাশ ঘষতে ঘষতে রানার সব কথা শুনলেন কর্নেল শফি। গম্ভীর, চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। অপ্রত্যাশিতভাবে হাসতে দেখল তাঁকে রানা। ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে হাসিটা।

'রাইট,' বললেন কর্নেল। 'ঠিক বলেছ তুমি। খেলা চালিয়ে যাবার এটাই একমাত্র উপায়। ওরা যদি বিশ্বাস করে তোমার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তোমাকে দলে নিতে ইতস্তত করবে না। এটা একটা ভয়ঙ্কর খেলা, কিন্তু তোমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার, সবদিক সামলে ঠিকই উতরে যেতে পারবে তুমি।'

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের সামনে এটাই এখন একমাত্র খোলা পথ। তবে সাবধানে থাকতে হবে আপনার। কাজটা নিখুঁতভাবে করতে হলে আমার বড়শিতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে আপনাকে।'

'রাইট,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন কর্নেল। 'আমি সতর্কতা অবলম্বন করব। এটা একটা ভয়ঙ্কর জুয়া খেলা, তবে আমাদেরই জেতার সম্ভাবনা বেশি।' নিভে

যাওয়া পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন তিনি। 'যা কিছু জানো সব ওদেরকে বলতে হবে। তার মধ্যে একটাও মিথ্যে কথা থাকা চলবে না। তোমার প্রতিটি কথা চেক করবে ওরা, যদি ধরা পড়ো মিথ্যে কথা বলেছ, তুমি-আমি দু'জনেই ডুবব। পরিস্থিতি বুঝে কিভাবে কি করতে হবে, সব আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে যদি গ্রহণ করে ওরা, তাহলেই বাজীমাত। ঝাড়-বংশ সুদ্ধ উপড়ে আনতে পারবে তুমি। তোমাকে শুধু একটা কথা জানাতে চাই, রূপাকে এসবের মধ্যে জড়িয়ো না। তোমাকে বোধহয় বলিনি, ও আমার আপন ভাগ্নী, আমি ওকে অত্যন্ত ভালবাসি। ওকে আমি এসব থেকে দূরে রাখতে চাই।'

'কিন্তু সংগঠনের হোতাটাকে ধরতে হলে,' বলল রানা, 'কারও কথা গোপন রাখা চলবে না আমার। ওদের সাথে কোন রকম ছলচাতুরী করতে চাই না আমি। জিজ্ঞেস না করলে রূপার কথা বলব না। কিন্তু জানতে চাইলে না বলেও পারব না। আমার ধারণা, ওর ওপরও নজর রাখছে ওরা। আপনি বরং এখান থেকে সরিয়ে দিন ওকে, ওদের নাগালের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন। কাজটা সুচারুভাবে করার স্বার্থে ওদেরকে মিথ্যে কথা বলা সাজে না আমার।'

সায় দিলেন কর্নেল। 'ঠিক বলেছ। ওকে আমি সরিয়ে দেব।' রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর মৃদু গলায় বললেন, 'তোমার সাথে ওভাবে কথা বলেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত, রানা। যা বলেছি, সব ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমিও সব ভুলে যাও। তোমাকে বোকা বলা আমার অন্যায় হয়েছে।'

হাসছে রানা। 'আমি বোধহয় একটু নরম আর অলস হয়ে গিয়েছিলাম,' বলল ও, 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাকে বোকা বানিয়ে পার পেয়ে যাবে কেউ। পাওনা আমি সুদে-আসলে আদায় করি। শ্যেন কাপালা আমার ওপর একটা সুযোগ নিয়েছে, সেজন্যে ভুগতে হবে তাকে। এবার তাহলে যেতে হয় আমাকে। যাবার সময় রূপাকে নিয়ে যাবেন আপনি। ওর বিপদ আসতে একটু দেরি হচ্ছে, কিন্তু আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।' হাতটাও বাড়িয়ে দিল রানা। 'সো লং, কর্নেল। খুব বেশি সময় নেব না, ওদের কল্লা নিয়ে এই ফিরে এলাম বলে। ওদের মধ্যে হোতাটা থাকবে। তার জন্যে আলাদা কোন ফী দিতে হচ্ছে না আপনাকে। কাজটা আমি ফাও করে দিচ্ছি। কারণ, এ কাজে আমি আনন্দ পাব।'

হ্যাণ্ডশেক করলেন কর্নেল। 'গুড লাক, রানা। সাবধানে থেকো। যদি কোন সাহায্য লাগে, তুমি তো জানোই কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে আমার সাথে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'না, আপনার সাথে যোগাযোগ করার ঝুঁকি আমি নেব না। গোটা ব্যাপারটা একা সামলাব আমি। আপনাকে যখন ডাকব, মনে করবেন কবরে ওদের লাশগুলো নামাবার জন্যে সাহায্য দরকার হয়েছে আমার। সো লং, কর্নেল।'

'আমার মনে হয়, রূপা তোমার সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা জানাতে চায়।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। কিন্তু তার দরকার নেই। একটা মেয়ে এখনও হাতে রয়েছে আমার।' হাসছে রানা। 'আপনার ভাগ্নীকে নিয়ে সমস্যা হলো, যেমন সুন্দরী তেমনি মেজাজী। ওকে আমার পছন্দ হয়, অনেক ব্যাপারে আমার সাথে মিলও খুঁজে পাই, আর ঠিক সেই জন্যেই ওর সাথে আমি যত কম পারা যায় দেখা

করতে চাই। সেটা ওর জন্যেও ভাল, আমার জন্যেও।'

বেডরুমের দরজায় কান পেতে ওদের কথা শুনছে রূপা। লাল হয়ে উঠেছে মুখটা।

নয়

নিশুতি রাত। তিনটে বাজতে বিশ মিনিট বাকি।

আফরোজার দরজায় হেলান দিয়ে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল রানা। কাকরাইল থেকে মোহাম্মদপুর আসার পথে দু'দুবার একটুর জন্যে বেঁচে গেছে ও। একবার একটা পেট্রোল কার তাড়া করেছিল, আরেকবার একজন সাদা পোশাক পরা পুলিস ওকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল। পেট্রোল-কারটাকে ফাঁকি দেবার জন্যে পাঁচিল টপকে একটা বাগানে ঢুকে পড়েছিল ও। বিশ মিনিট লুকোচুরি খেলে তবে ধুলো দেয়া গেছে ওদের চোখে। সাদা পোশাক পরা পুলিসটাকে কাবু করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি ওকে। লোকটা ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড ঘুষি মেরে তার নাকটা ভেঙে দিয়েছে ও।

ফ্ল্যাটের ভেতর বেল বাজছে। আফরোজা একা আছে কিনা ভাবছে রানা। সাড়া দিতে এত সময় নিচ্ছে কেন?

লেটার-বক্সের ফাঁক গলে আফরোজার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, 'কে?'

একটু ঝুঁকে নিচু হলো রানা, আফরোজার অবাক চোখে চোখ রাখল। 'হ্যালো, সুইট হার্ট!' বলল ও। 'দরজা খোলো।'

দরজা খুলে দিল আফরোজা। স্বচ্ছ নাইলনের ড্রেসিং গাউন পরে রয়েছে সে, ছোট্ট আর সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু দু'চোখে রাজ্যের ভীতি।

'রানা! কি হয়েছে…জানো না রাত তিনটে বাজে এখন?'

'জানি। তিনটে নয়, প্রায় তিনটে।' আফরোজার কাঁধে একটা হাত রেখে সিটিংরুমের দিকে নিয়ে চলল তাকে রানা। 'এসো। তোমার ফোনটা একটু ব্যবহার করব। কিছু একটা চাপাও গায়ে, তোমার ড্রেসিং গাউনটা চোখেই পড়ছে না। তারপর কফি বানাও।'

'এ কি ধরনের পাগলামি, রানা? এত রাতে এভাবে তুমি আমার কাছে আসতে পারো না…'

আফরোজার হাত দুটো ধরে তাকে একটু নাড়া দিল রানা। চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। 'যা বলছি, করো। তোমার ভাইয়ের ফোন নাম্বার বলো।'

'ছাড়ো আমাকে! এ কি রকম…'

আরেকবার নাড়া দিল রানা, আফরোজার মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকি খেল, মুহূর্তের জন্যে আটকে গেল নিঃশ্বাসটা।

'ঠাট্টা করছি না, আফরোজা। আমি সিরিয়াস। ফখরুলের ফোন নাম্বার দাও।'

বিড় বিড় করে ফোন নাম্বারটা উচ্চারণ করল আফরোজা। তারপর বলল,

'কিন্তু ফখরুলকে কি দরকার তোমার? কি হয়েছে?'

'জিজ্ঞেস করো কি হতে বাকি আছে,' ফোনের দিকে এগোচ্ছে রানা। 'তোমার প্রিয় ভাই আর তার বন্ধু একটা খুনের সাথে জড়িয়ে দিয়েছে আমাকে।' ডায়াল করছে ও। 'হাঁ করে ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না, মাছি ঢুকবে ভেতরে। গায়ে কিছু চাপিয়ে নিয়ে কফি বানাও।'

নড়ল না আফরোজা। কিন্তু হাত দুটো তুলে ক্রুশ-চিহ্নের মত করে বুকের ওপর রাখল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখের চেহারা। চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'খুন?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। অপর প্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ।

পরমুহূর্তে ফখরুলের গলা শুনতে পেল রানা। 'কে বলছেন?'

'রানা। শোনো, কোন প্রশ্ন নয়। শ্যেনকে নিয়ে সোজা তোমার বোনের ফ্ল্যাটে চলে এসো। এখুনি। মজা যা করার করে নিয়েছ তোমরা, এখন আমার পালা। কোনরকম চালাকী করার ইচ্ছে থাকলে, ভুলে যাও। বুঝতেই পারছ, আফরোজা আমার হাতে রয়েছে।' স্তম্ভিত বিস্ময়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ফখরুলের গলা থেকে, এমনি সময় ক্রাডলে রিসিভারটা রেখে দিল রানা।

পিছু হটতে শুরু করেছে আফরোজা। আতঙ্কে হাঁপাচ্ছে সে। 'কিন্তু রানা...।'

'উত্তেজিত হয়ো না, ভয়ের কিছু নেই তোমার,' বলল রানা। তীক্ষ্ণ, কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে ও। 'ওদের উদ্দেশ্য জানতে তুমি?'

'তোমার কোন কথাই বুঝতে পারছি না আমি, রানা! তোমাকে আমার ভয় লাগছে। কি ঘটেছে বলছ না কেন আমাকে?'

'চিঠিগুলোর কথা জানতে তুমি?'

খানিক ইতস্তত করল আফরোজা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ...মানে, দু'একটা কথা বলেছে আমাকে ফখরুল। ও চেয়েছিল চিঠিগুলো তুমি...'

'এটা যে একটা ফাঁদ, তা তুমি জানতে না?' চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে রানা। 'না, মনে হয় তুমি জানতে না। ওখানে চিঠির কোন অস্তিত্বই নেই। মেয়েটা মোখলেসুর রহমানের সাথে ফুর্তি করছিল। আমি যেতে তার বুকে গুলি করে সে। আমাকে ওখানে পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল, খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপানো। এই খুনের সমস্ত আয়োজন শ্যেন আর তোমার ভাই করেছে।'

'অসম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'করো না। কিন্তু করবে। কাল সকালে খবরের কাগজ দেখলেই বুঝতে পারবে সব। তারপর ফখরুল যখন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসবে, কিছুই অবিশ্বাস করার থাকবে না তোমার।'

'ওহ্, রানা!' ছুটে এসে রানার গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল আফরোজা। গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে কপাল ঘষছে। 'ভীষণ ভয় করছে আমার। কিন্তু তুমি যদি কোন বিপদে পড়ো, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে সব কিছু করব আমি।'

ঠেলে সরিয়ে দিল ওকে রানা। 'শুনে খুশি হলাম,' নিঃশব্দে হাসছে ও। 'এখন থেকেই শুরু করে দাও—যাও, কফি আনো আমার জন্যে। ভাল কথা, তোমাকে

একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি। গলা থেকে ওই জেড রিংটা খুলে ফেলো। জিনিসটা ভয়ঙ্কর।'

ঘন ঘন চোখ পিট পিট করছে আফরোজা। কয়েক সেকেণ্ড অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর জানতে চাইল, 'তোমার শরীর ভাল তো, রানা? অসুস্থবোধ করছ না?' উদ্বেগ ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'কেমন যেন আবোলতাবোল লাগছে তোমার কথা।'

'তোমার বয়স এগারো নয়, সুতরাং ন্যাকামি করো না।' কাঁধ দুটো ধরে আফরোজাকে ঘুরিয়ে দিল রানা, নিতম্বে একটা চাপড় মেরে বলল, 'যাও।'

কফি বানাতে চলে গেল আফরোজা। ওয়েস্টকোটটা খুলে একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরাল রানা। অপেক্ষা করছে। আফরোজার নড়াচড়ার শব্দ ভেসে আসছে কিচেন থেকে। কতটা গভীরভাবে জড়িত ও? চিন্তা করছে রানা। খুব বেশি কিছু জানে বলে মনে হয় না। ওদের উদ্দেশ্য বা তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই বোধ হয় জানে না। অন্ধকারে রেখে ব্যবহার করছে ওকে ফখরুল। আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

ট্রে নিয়ে ফিরে এলে আফরোজা। চুল গুটিয়ে খোঁপা বেঁধেছে। ড্রেসিং গাউন খুলে রেখে ভারতীয় ছাপা শাড়ি পরেছে একটা। কাপে কফি ঢালছে সে, রানা লক্ষ্য করল হাত দুটো কাঁপছে তার।

'দেখো, ছলচাতুরী করে লাভ নেই। এই ব্যাপারটার সাথে কতটুকু জড়িত তুমি?'

দ্রুত সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল আফরোজা। 'আমার সাথে হেঁয়ালি করছ কেন? কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো। কোন্ ব্যাপারটার সাথে?'

'শ্যেন আর ফখরুল একটা সংগঠনের সদস্য বা তারাই সংগঠনটা চালাচ্ছে, এর কাজ হলো এই দেশের মিল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য আর সব রকম অর্থনৈতিক অগ্রগতি বন্ধ করা। তুমি জানো না?'

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল আফরোজা। 'আমি···আমি জানি কিছু একটা করছে ফখরুল। কিন্তু কি করছে তা আমাকে কখনও বলেনি।'

বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে কফির কাপটা নিল রানা। 'এখন জেনেছ তো?'

'বিশ্বাস করতে পারছি না। থাক, আর কিছু বলো না আমাকে। আমার ভয় করছে।'

'জেড রিংটা কেন পরো তুমি?' থামছে না রানা। 'তুমি জানো না সংগঠনের প্রতিটি সদস্য এই আংটি পরে?'

'ফখরুল আমাকে পরতে দিয়েছিল। দরকার নেই, ওকে আমি ফিরিয়ে দেব এটা।'

তা সম্ভব, ভাবল রানা। আফরোজার ওপর তার আগ্রহ সৃষ্টি করাটা ফাঁদেরই একটা অংশ হতে পারে। কফির কাপটা তেপয়ে রেখে দিয়ে পা দুটো সামনে মেলে দিল ও। 'ভুলে যাও সব,' বলল ও। 'কিন্তু তোমার ভাই যখন আসবে, কাছে পিঠে থেকো। অনেক অবিশ্বাস্য কথা শুনতে পাবে।'

অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে অপেক্ষা করছে ওরা। আরও অনেকক্ষণ পর দরজার

কলিংবেল বেজে উঠল, সাথে সাথে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আফরোজা। হাত বাড়িয়ে তার কব্জিটা খপ্ করে ধরে ফেলল রানা।

'এখান থেকে নড়ো না,' বলল ও। 'আমি যাচ্ছি দরজা খুলতে।' এগিয়ে গেল ও। লেটার-বক্সের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল শ্যেন কাপালা আর ফখরুল দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। ওদের সাথে আর কেউ নেই। দরজা খুলে দিল ও। 'ভেতরে ঢোকো।'

রানার চোখে চোখ রেখে ভেতরে ঢুকল ওরা। অস্থির, নার্ভাস দেখাচ্ছে ফখরুলকে। কিন্তু শ্যেন কাপালা অটল। তার চ্যাপ্টা মুখে ভাবের লেশমাত্র নেই। কিন্তু চোখ দুটো সজাগ। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'সিটিং রুমে এসো,' বলল ও।

হলঘর থেকে সিটিং রুমে এল ওরা। দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হলো আফরোজার সাথে ফখরুলের। ভাই-বোন দু'জনেই আড়ষ্ট বোধ করছে। সিটিং রুমের দরজাটাও বন্ধ করল রানা। ফিরে এসে নিজের চেয়ারটায় বসল। পট থেকে নিজের জন্যে আরেক কাপ কফি ঢালছে।

'ফাঁসাতে চেষ্টা করার জন্যে ধন্যবাদ,' সিগারেট ধরাল রানা, শ্যেন কাপালার দিকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল। 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফাঁদটা বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তোমাদের কাছে।'

সোজা এগিয়ে সাদা দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শ্যেন কাপালা, রানার দিকে পিছন ফিরে। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো। মৃদু শব্দে হাসল সে। 'পুলিস তোমাকে খুঁজছে, রানা,' সহজ সুরে বলল সে। 'আমার কর্তব্য তুমি যে এখানে আছ তা ওদেরকে জানিয়ে দেয়া। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?'

'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না,' হাসছে রানা। 'এই ঝামেলা থেকে এখন বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচো তোমরা। সেজন্যেই এসেছি আমি। তোমরা আশা করেছিলে, মেয়েটা গুলি করার পর ধরা পড়ে যাব আমি। সেজন্যেই ওই মোটা হোঁদল কুতকুতকে পাঠিয়েছিলে। কিন্তু সে আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। এখন পরিস্থিতিটা কি? যতটা না আমার বিপদ, তার চেয়ে বেশি বিপদ তোমাদের। আমার নিরাপত্তা বিধানের মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তোমার একটা কথাও বুঝতে পারছি না আমরা। এখানে তোমার থাকা চলে না। তুমি এখন যেতে পারো।'

'কেন, পুলিসকে খবর দেওয়ার কি হলো?' বলল রানা। টেলিফোনটা দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। 'ফোন করো থানায়, ওদেরকে বলো খুনীকে তোমরা আটকে রেখেছ। অবশ্য তার আগে ভেবে দেখো, এই বিপদ থেকে নিজেদেরকে তোমরা বের করে আনতে পারবে কিনা।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল শ্যেন কাপালা। 'এটা আফরোজার ফ্ল্যাট না হলে অবশ্যই পুলিস ডাকতাম আমি,' হাসিমুখে বলল সে। 'ওকে আমি কোনরকম ঝামেলায় ফেলতে চাই না। তার চেয়ে তুমি চলে গেলেই আমি খুশি হব।'

সিগারেটে টান দিয়ে সিলিঙের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'তোমাকে খুশি করতে পারছি না বলে দুঃখিত, শ্যেন। আপাতত এই ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাবার

ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। তোমাদের সাথে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। এক ঘন্টা আগে পর্যন্ত এন.এস.আই.-এর সাথে জড়িত ছিলাম আমি। এন.এস.আই.-এর তৎপরতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে? দেশের বিরুদ্ধে কোথাও ষড়যন্ত্র হলে তা উদ্ঘাটন করা, ভিনদেশী স্পাই খুঁজে বের করা, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের রহস্য মীমাংসা করা ওদের কাজ। প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করেন একজন বদমেজাজী কর্নেল। তোমরা জানো, তিনি তোমাদের পিছনে লেগেছেন? জানো না। তোমাদের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আমাকে। উদ্দেশ্য তোমাদের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা। কিন্তু তোমরা আমাকে দলে গ্রহণ না করে একটা ফাঁদ পেতে ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে খুনের দায়। কর্নেল এটাকে আমার একার ব্যর্থতা বলে রায় দিয়েছেন। জানিয়েছেন, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি আঙুলটিও তুলবেন না। ঝপ্ করে পানিতে পড়ে গেছি আমি। বিরক্ত বোধ করছ নাকি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল শ্যেন কাপালা। 'বলে যদি শান্তি পাও, শুনতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কথা বলছ, সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। তবে সন্দেহ নেই, তাতে তোমার কিছু এসে যায় না।'

'কর্নেল একটা বিষয়ে সাংঘাতিক স্পর্শকাতর,' বলল রানা। 'তিনি যে তোমাদের পিছনে লেগেছেন, সেটা কোনমতে জানতে দিতে চান না তোমাদেরকে। সেজন্যেই আমাকে তিনি বলি দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা পছন্দ হয়নি আমার। এখন আমি জল আর ডাঙার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছি, তাই তোমাদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়া ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।'

'তোমার সাহায্য?' একটা ভুরু কপালে তুলে রানাকে পরীক্ষা করছে শ্যেন কাপালা। 'তোমার সাহায্য দরকার নেই আমার। একজন খুনীকে ভাড়া করা আমার নীতি নয়।'

'কথাটা মিথ্যে বলা হলো,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'খাদেম, আমি যার নাম রেখেছি শিম্পাঞ্জী, সে একজন প্রফেশন্যাল মার্ডারার।'

মুহূর্তের জন্যে শ্যেন কাপালার মুখের পেশীতে টান পড়ল। কিন্তু দ্রুত আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল চেহারাটা। 'কার কথা বলছ? খাদেম? ও নামের কাউকে আমি চিনি না।'

'তুমি বোধহয় নঈম নামে কোন লোককেও চেনো না?' হাসছে রানা। 'ফায়ারিং স্কোয়াডের নঈম, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে।'

শ্যেন কাপালার ক্ষীণ চমকে ওঠাটা এবারও দৃষ্টি এড়াল না রানার।

'না, চিনি না,' বলল শ্যেন কাপালা, কিন্তু মুখের হাসিটা মুছে গেছে তার।

'আসলে,' কার্পেটের ওপর সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল রানা, 'তোমাদের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন কর্নেল। যেমন ধরো, জেড রিং। কর্নেল শুধু দক্ষই নন, সাংঘাতিক তৎপরও বটে। তোমাদের অনেকের ডোসিয়ার তৈরি করেছেন তিনি। তোমাদের আর তোমাদের অনুসারীদের। যাই হোক, আমি

যে তোমাদের কাজে লাগব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে কাজে লাগাতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তোমাদেরকে। তোমরা জানো কি জানো না বলতে পারব না, নীতির কোন বালাই নেই আমার, আমি কোন আদর্শে বিশ্বাসী নই। চোখে শুধু একটা জিনিসই দেখতে পাই আমি, টাকা। কে আমাকে কাজে লাগাচ্ছে, আমি কার কাজ করছি, আমার কাছে সেটা কখনোই বিবেচ্য বিষয় নয়—যতক্ষণ চাহিদা মত টাকা পাচ্ছি। এ.এস.আই.-এর ভেতরের সমস্ত খুঁটিনাটি জানা আছে আমার। ওদের এজেন্টদেরকে আমি চিনি। ওদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে। কার কার ওপর নজর রাখতে হবে তা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারব। হয়তো এরই মধ্যে তোমাদের সংগঠনের ভেতর অনুপ্রবেশ করেছে তাদের দু'একজন, কিন্তু তোমরা চিনতে পারছ না। এ-ব্যাপারে আমার সাহায্য পেতে পারো তোমরা। তাছাড়া, এক্সপ্লোসিভ, স্যাবোটাজ এবং অবাঞ্ছিত লোকজনকে বিদায় করে দেয়ার ব্যাপারে এমন কিছু নেই যা আমি জানি না। তোমাদের নবীশদেরকে ট্রেনিং দিতে পারব আমি। সত্যিকার কিছু শিখতে পারবে ওরা আমার কাছ থেকে। টাকা দিতে হবে আমাকে, অবশ্যই, সেই সাথে অত্যন্ত আরামদায়ক একটা আশ্রয়ও চাই আমার। তবে কথা দিচ্ছি, এসব ব্যাপারে যুক্তিছাড়া দরাদরি করব না।'

চোখ জোড়া ছোট হয়ে গেছে শ্যেন কাপালার, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'হয় নেশা করেছ, নয়তো বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ তুমি,' বলল সে। 'এত কথা বললে, সব আমার কাছে প্রলাপ বলে মনে হলো। বুঝতেই পারলাম না কি বিষয়ে কথা বললে। আবার তোমাকে বলছি আমি, চলে যাও এখান থেকে।'

হেসে উঠল রানা। 'এখনও সতর্ক? বেশ, নিজেকেই তুমি জিজ্ঞেস করে দেখো, আমাকে ছাড়া তোমাদের চলে কিনা। বারো নম্বর ধরা পড়েছে, ভুলে যেয়ো না। পেটের কথা কিছুই বলতে বাকি রাখেনি সে।'

কালো একটা ছায়া পড়ল শ্যেন কাপালার মুখে। চোখের নিচে একটা শিরা লাফিয়ে উঠল।

'ওকে বিশ্বাস করো না!' দ্রুত, হড়বড় করে বলল ফখরুল। শ্যেন কাপালার চেহারা বদলে যেতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে। 'এসবের পিছনে নিশ্চয়ই কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে ওর!'

'সম্ভবত তাই,' বলল শ্যেন কাপালা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর নিষ্কম্প। 'কিন্তু একটা কথা বোধহয় ঠিক বলেছে ও, ওকে ছাড়া চলবে না আমাদের।' ছোট একটা অটোমেটিক পিস্তল বেরিয়ে এল তার হাতে। রানার কপাল লক্ষ্য করে ধরল সেটা। 'বারো নম্বর সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'তবু ভাল,' বলল রানা, 'এতক্ষণে অন্তত স্বীকার করলে যে যাদের কথা বলছি তাদের একজনকে অন্তত চেনো তুমি। বারো নম্বর কোথায় গায়েব হয়ে গেল তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ তোমরা, তাই না? শোনো বলছি। এন.এস.আই.-এর হাতে ধরা পড়েছিল সে। ওরা তাকে নির্জন খালি একটা বাড়িতে নিয়ে যায়। কথা আদায় করার জন্যে তার ওপর টরচার করা হয়। ওখানে যাদেরকে টরচারের দায়িত্ব দেয়া

হয় তাদের প্রাণে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটা আঙুল তুলেছে কেউ, একথা শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় ওদের। যাই হোক, আধমরা অবস্থায় মুখ খোলে বারো নম্বর। তারপর আরও কিছু গোপন করে রাখছে কিনা জানার জন্যে তার ওপর আবার অত্যাচার চালানো হয়। হয়তো আর কিছু বলার ছিল না বারো নম্বরের, কিন্তু ওরা তা বিশ্বাস করেনি। কখনোই তা করে না ওরা। যাই হোক, অত্যাচার চলছে, এই অবস্থায় মারা যায় বারো নম্বর।'

আঁতকে উঠল ফখরুল, মাঝপথে নিঃশ্বাসটা আটকে গেল তার। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'ধরা পড়লে বারো নম্বরের মত সাহস তুমি দেখাতে পারবে বলে আমি মনে করি না। তার মুখ খোলাবার জন্যে পুরো একটা দিন সময় লেগেছিল ওদের। তোমার বেলায় আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।' ফখরুলের রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'উঁহুঁ, ভুল হলো। ওরা টরচার শুরু করার আগেই গড় গড় করে সব কথা বেরিয়ে আসবে তোমার মুখ থেকে!'

'যথেষ্ট হয়েছে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল শ্যেন কাপালা। 'আর কি জানো তুমি?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'অনেক কিছুই জানি, কিন্তু এখুনি সব আমি হাতছাড়া করি কিভাবে? সামান্য কিছু আমার জন্যে করো তোমরা, তারপর দেখো তোমাদের জন্যে অসামান্য কত কিছু করি আমি। আমার একটা কাজ আর একটা আশ্রয় দরকার। বদলে তোমাদের উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করব আমি। রাজী?'

ফখরুলের দিকে তাকাল শ্যেন কাপালা। দ্রুত ঢোক গিলল ফখরুল। হাঁপাচ্ছে সে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ দুটো।

হাসল শ্যেন কাপালা। 'এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি? ওকে আমরা স্টেশনে নিয়ে যাব। টরচার করে কথা আদায় করার লোক আমাদেরও আছে।'

দশ

ভ্যানের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু সিগারেটে যখন ফুঁক দিচ্ছে খাদেম, লালচে হয়ে উঠছে অন্ধকারটা। মেঝেতে বসে আছে রানা, প্রতিটি ঝাঁকির সাথে বাড়ি খাচ্ছে পিঠটা ভ্যানের গায়ে। প্রায় মিনিট দশেক ধরে শহরের মাঝখানে ঘোরাফেরা করেছে গাড়িটা, তারপর এই সোজা রাস্তাটা ধরেছে। দিক সম্পর্কে রানার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যেই ওই সময়টা নষ্ট করেছে ওরা। আধঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে একটানা ছুটছে ভ্যান, কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না রানা।

ফোন করে নঈম আর খাদেমকে আফরোজার বাড়িতে আনিয়েছিল শ্যেন কাপালা। এদের সাথে আসতে মন সায় দিচ্ছিল না রানার। গাড়িতে ওঠার আগেই নিরাপত্তার সাংঘাতিক অভাব বোধ করছিল ও। কিন্তু সেই সাথে এ-ও বুঝেছিল যে ঝুঁকিটা তাকে নিতে হবে। এরই মধ্যে খানিকটা এগিয়েছে ও। ফখরুল আর শ্যেন কাপালা দু'জনেই যে সংগঠনের সদস্য, এটুকু জানা গেছে। তবে শ্যেন সংগঠনের

পরিচালক কিনা তা ভবিষ্যতে দেখার বিষয়। রানার তা মনে হয় না। শ্যেনের সাথে কথা বলার সময় আচরণে কোনরকম তোষামোদ বা কোমলতার ভাব দেখায়নি ওরা। ওদের আচরণে বরং একটু তাচ্ছিল্যই লক্ষ করেছে রানা, অ্যামেচারদের সাথে প্রফেশন্যালরা যেমন আচরণ করে থাকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, সংগঠনে ফখরুলের জায়গা অনেক নিচে, নগণ্য বলে মনে করা হয় তাকে। খাদেম আর নঈমকে যমের মত ভয় করে সে। অবশ্য তাই করা উচিত। দু'জনকে একসাথে দেখলে একজোড়া নির্দয় খুনী ছাড়া কিছুই মনে হয় না। রানা নিজেও ভয় করে এদের। নঈম আর খাদেম ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছুবার আগেই আফরোজাকে ঠেলে পাশের ঘরে দিয়ে এসেছিল ফখরুল। রানা আর শ্যেন কাপালার কথাবার্তা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল সে।

খুব একচোট ধমক মেরেছে ফখরুল বোনকে। 'এসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না তুমি!' চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। 'মুখ থেকে যেন একটা টুঁ-শব্দও না বেরোয়। বুঝতে পারছ না, এসব ভয়ঙ্কর ব্যাপার, বোকা কোথাকার!'

নঈম আর খাদেমের সাথে রাস্তায় নেমে এসে এই ভ্যানটা দেখতে পায় রানা। নঈম চালাচ্ছে।

আরও প্রায় পৌনে একঘন্টা পর ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল ভ্যানের গতি। তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিল একটা, এক মিনিট পর কোনরকম আগাম আভাস না দিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝাঁকি খেয়ে থেঁতলে গেল রানার পিঠ।

ভ্যানের দরজা খুলে খাদেম বলল, 'বেরোও।'

লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, দেখল হাতে একটা অটোমেটিক মাউজার নিয়ে ভ্যান ঘুরে এগিয়ে আসছে নঈম।

কাঁকর বিছানো একটা পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রানা, ভ্যানের হেডলাইটের আলো সেটার ওপর আড়াআড়ি ভাবে পড়েছে, চারদিকে কোথাও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না গাঢ় অন্ধকারে। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে কালো আকাশের গায়ে আরও ঘন কালো ছায়াগুলোকে দেখে বুঝল মাথা-উঁচু অসংখ্য গাছ দিয়ে ঘেরা রয়েছে জায়গাটা।

'এসো,' হুকুমের সুরে বলল খাদেম। রানাকে মাঝখানে নিয়ে কাঁকর বিছানো পথের ওপর দিয়ে এগোতে শুরু করল ওরা।

পঞ্চাশ গজের মত পেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির আবছা কাঠামো দেখতে পেল রানা সামনে। ও তাকিয়ে আছে, এই সময় সামনের দরজার মাথায় একটা বালব্ জ্বলে উঠল।

ভেতরে ঢুকল ওরা। বিরাট একটা হলঘর। সিলিঙের সাথে ঝুলছে ইলেকট্রিক ঝাড়-বাতি। দেয়ালে সেগুন কাঠের প্যানেল। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্ত স্ট্যাচুর মত একজন লম্বা লোক। পরনে সাদা কোট, কালো ট্রাউজার, ক্রেপ-সোল লাগানো কালো জুতো। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল খাদেম।

'অনেক দেরি হলো তোমাদের,' বলল লোকটা। গলার আওয়াজ ঠাণ্ডা, স্থির।

'সোজা পথে এলে এতটা সময় লাগত না,' বলল খাদেম। 'এই নিন, আপনার লোক। আপনি এর দায়িত্ব বুঝে নিলে আমরা একটু ঘুমাতে পারি।'

'যেতে পারো তোমরা।'

দরজা খুলে খাদেম আর নঈম একসাথে বেরিয়ে গেল। রানার দিকে তাকাল না লোকটা, এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করল দরজা। তারপর নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ঠিক একেবারে রানার নাকের সামনে দাঁড়াল। দুই চোখে রূঢ়, কঠিন দৃষ্টি। রানার সামনে থেকে এক পা সরে গেল ডান দিকে, কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার চোখের দিকে, ডান দিক থেকে আবার সরে এল বাঁ দিকে—এইভাবে চারবার। 'হুঁ,' রানার চোখের পাতা একবারও কাঁপল না দেখে মাথা ঝাঁকাল সে। 'কঠিন পাত্র! এসো আমার সাথে। ড. সমুদ্র গুপ্ত তোমার সাথে কথা বলতে চান।'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, নড়ছে না। লোকটা ছয় ফুটের ওপর লম্বা, একহারা শরীর, গায়ের রঙ ফর্সা। চওড়া, উঁচু কপাল। ছোট, কালো চোখ। মুখটা সরু। নাকটা চিকন, খাড়া। এই টাইপের লোককে ভালভাবে চেনে রানা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই ধরনের লোকদেরকেই গেস্টাপোয় নেয়া হত। মানবিক অনুভূতিহীন একজন পাষাণ, রক্তমাংসের একটা মেশিন, হুকুম পেলে চরম দক্ষতা আর নির্দয়তার সাথে তা পালন করতে জানে শুধু। এমন কিছু নেই যা সে করতে পারে না। খাদেম আর নঈম যদি বিপজ্জনক হয়, এই লোক ভয়ঙ্কর।

'আমার পিছু নাও,' আবার বলল সে। এবার আর রানার জন্যে অপেক্ষা করল না, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল একটা দরজার দিকে।

লোকটার পিছু পিছু একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। সেগুন কাঠের একটা পালিশ করা দরজার সামনে দাঁড়াল লোকটা। হাতল ঘুরিয়ে খুলল সেটা। রানাকে যাবার পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ব্র্যাণ্ডির কড়া গন্ধ পেল রানা।

ছোট, আরামদায়ক আসবাবে সাজানো একটা কামরায় ঢুকেছে রানা। এক কোণে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, শেডের ছায়া প্রায় ঢেকে রেখেছে কামরাটাকে, শুধু লাল পারসিয়ান গালিচার ওপর কড়া সাদা একটুকরো আলো পড়েছে। কামরার মাঝখানে একটা আরাম কেদারা, তার ভেতর প্রায় অর্ধেকটা ডুবে বসে আছে একজন লোক। ওদের পায়ের শব্দে নড়ে উঠল সে।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল লোকটা, দেখছে রানাকে। চোখে অদ্ভুত একটা চকচকে কৌতুক। 'তুমি রানা।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'একসেলেন্ট। তুমি এখন যেতে পারো, বোরহান,' আরাম কেদারা থেকে বলল লোকটা। 'আবার যখন দরকার হবে তোমাকে আমি রিং করব।'

সাদা কোট পরা লোকটা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'আমার সামনে এসে বসো, রানা,' আরাম কেদারা থেকে বলল লোকটা। 'ওহো, আমার পরিচয়টা দেয়া হয়নি তোমাকে। আমি ড. সমুদ্র গুপ্ত। তোমাকে এখানে পেয়ে সত্যি খুব খুশি হয়েছি, রানা।'

'কিন্তু আমি খুশি হব কিনা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না,' শুকনো গলায় বলল রানা। এগিয়ে গিয়ে বসল একটা আরাম কেদারায়, লোকটার সামনে। লম্বা পা

দুটো মেলে দিল ও। আগ্রহের সাথে দেখছে ড. সমুদ্র গুপ্তকে। শরীরটা বিরাট, মোটা মানুষ, গোলগাল। চোখ দুটো আকারে ছোট, কিন্তু পলক নেই, এবং সারাক্ষণ বিস্ফারিত হয়ে আছে। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তার বড় বড় হলুদ দাঁতগুলো। ঘোড়ার দাঁতের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর পরনেও বোরহানের মত সাদা একটা কোট। মোটা, মাংসল পা দুটো সাদা-কালো চেক ট্রাউজারে ঢাকা। মাথায় ঘন, সাদা ধবধবে চুল, ছোট করে ছাঁটা।

'এ একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার,' বলল সমুদ্র গুপ্ত, ভুরু কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করল সে। 'শ্যেন কাপালা তোমার কথা বলেছে আমাকে। অবশ্য তোমার সম্পর্কে আগেই সব কথা শুনেছি আমি। তোমার খ্যাতি কার কানেই না গেছে! তুমি তাহলে আমাদের দলে ভিড়তে চাও?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে অফার করল ও।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সমুদ্র গুপ্ত। 'না, ধন্যবাদ। তুমি আমাদের দলে আসতে চাও শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি, রানা। ঠিক তোমার মত লোকই এখানে দরকার আমাদের। মুগ্ধ হওয়া যায়, এমন একটা রেকর্ড আছে তোমার। তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না,' বলল রানা। কথার ধারা লক্ষ্য করে একটু অবাক হচ্ছে ও। 'কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনাদের দলে ঢোকার পিছনে আমার একটা স্বার্থ আছে। সেটা পূরণ না হলে আমার কাছ থেকে উপকার পাবার কোন আশা নেই আপনাদের।'

খক খক করে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল সমুদ্র গুপ্তের গলার ভেতর থেকে। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলে রানা মনে করত গলায় হাড় বা কাঁটা আটকে গেছে লোকটার। কিন্তু আওয়াজটা হাসিরই একটা বিচিত্র নমুনা, চোখে দেখে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। 'চমৎকার! তুমি রসিকতা করতে জানো। তা, অবশ্যই আমরা সবাই যার যার স্বার্থের জন্যে কাজ করি। সেটাই তো উচিত। সে যাক, ওসব ব্যাপারে কোন অসুবিধে হবে না তোমার। কিন্তু আপাতত এখানে তুমি পরীক্ষার মধ্যে আছ। তাই তোমাকে কিছুদিন নবীশ হিসেবে ধরা হবে। কিন্তু একবার যখন আমরা নিঃসন্দেহে বুঝব যে দলের কাজে আন্তরিকভাবে নিজেকে নিবেদন করেছ তুমি, তখন তোমার কাজের বিনিময়ে যা চাইবে তাই পাবে।' টেবিল ল্যাম্পের আলোয় হলুদ দাঁতগুলো চক চক করে উঠল। 'যতদূর বুঝতে পারলাম, শ্যেন কাপালা একটু সন্দেহ করছে তোমাকে। আসলে সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ লোক ও। আমাকে বা এই সংগঠনের আর কাউকেও যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ও, আমার তা মনে হয় না।' আবার বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল সেই খক খক হাসি। 'এই যে কাউকে বিশ্বাস করে না ও, ওর এই নীতিটা আমি সমর্থন করি। সন্দেহ জিনিসটা নিরাপত্তার প্রহরী।'

'আমি কি তাহলে এখানে বন্দী বলে মনে করব নিজেকে?' জানতে চাইল রানা।

'বন্দী শব্দটা আমার পছন্দ নয়, বড় বেশি রূঢ় লাগে কানে। বলা যেতে পারে তোমার স্বাধীনতার ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা থাকবে।' বাতাসে একটা হাত নাড়ল সমুদ্র গুপ্ত। 'প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করো না। কেউ যাতে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে না পারে তার জন্যে নিখুঁত ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছি এখানে আমরা। গোটা এলাকাটা দশ ফুট উঁচু ইলেকট্রিফায়েড তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক আর অসম্ভব একটা ব্যাপার। রাতের বেলা শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়। সন্ধ্যার পর ঘর ছেড়ে মাটিতে পা পর্যন্ত রাখতে রাজী নই আমি। এর ওপর আছে ফটো-ইলেকট্রিক-রে, তার আওতায় কাউকে দেখা গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আর গেটে তো পাহারা আছেই।' হাতটা আরেকবার বাতাসে নাড়ল সে, গলা কাটার ভঙ্গিতে। 'সবাইকে বলা আছে, কেউ পালাতে চেষ্টা করছে দেখলেই মেরে ফেলতে হবে তাকে। এসব তোমার কাছে একটু বেশি কড়াকড়ি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা বেশ কিছু লোককে নিজেদের আশ্রয়ে রেখেছি, তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি পালিয়ে যেতে পারে, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।' হলুদ দাঁতগুলো আবার চকচক করে উঠল। 'স্বীকার করি, নিষ্ঠুরতার দিক থেকে যে-কোন কসাই-এর চেয়ে অনেক বেশি উগ্র বোরহান, কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও তো সত্যি যে ওর এই নিষ্ঠুরতার জন্যেই আজকাল কেউ আর পালাবার কথা ভাবতে পর্যন্ত চায় না।'

'শুনে মনে হচ্ছে এটা একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প।'

'না এবং হ্যাঁ, দুটোই সত্যি। সহযোগিতা পেলে আমরা মানুষকে জামাই-আদর করি। কিন্তু কথা না শুনলে একে একে শায়েস্তা করার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করি না।'

'জানতে চাওয়াটা বেয়াদবি হয়ে যাবে, জায়গাটা ঠিক কোথায়, এখানে কি করছেন আপনারা, ইত্যাদি?'

'মানে, হ্যাঁ,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল সমুদ্র গুপ্ত। 'তা একটু বেয়াদবি হয়ে যাবে বৈকি। আসলে যতক্ষণ তুমি নবীশ পর্যায়ে থাকছ, এই জায়গাটা ঠিক কোথায় তা জানা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। বোঝোই তো, নিজের চারদিক সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলে পালাবার চেষ্টা করাটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এটা একটা অ্যানিমেল ফার্ম, এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকো তুমি। আমরা যে জেনুইন, সে-ব্যাপারে পুলিস বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মনে কোনরকম সন্দেহ নেই। এই এলাকায় আমাদের একটা সুনাম আছে। গরীব মানুষকে আমরা সস্তায় দুধ, ডিম, ঘি, মাখন ইত্যাদি দিই। বলতে পারো এখানে আমরা একটা দানছত্র খুলে বসেছি। এটা আমাদের হেডকোয়ার্টার কিনা, তাই বাইরের চেহারাটা এই রকম রাখতে হয়েছে।'

'সবই খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনাদের মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। যতটুকু জানি, তা একতরফা। পরিষ্কার একটা ছবি পেতে চাই আমি। দলে ঢুকতে চাইছি, তাই আপনাদের তরফের

বক্তব্যও আমার শোনা দরকার। আপনাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শটা কি?'

দু'হাত এক করে ঘষছে সমুদ্র গুপ্ত। তার উজ্জ্বল স্থির চোখ দুটো পরীক্ষা করছে রানাকে। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। তথ্যগুলো এখান থেকে পাচার হয়ে যাবার ভয় নেই, কাজেই তোমাকে বলা যেতে পারে। তুমি তো আর এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারছ না, আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। শোনো তাহলে। শুনে খুব মজা পাবে তুমি। কারণ আমরা এখানে কে কে কিভাবে আছি জানতে পারলে নিজের পজিশন এবং ফিউচার সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে যাবে তুমি।' রুমাল দিয়ে নাকের ডগাটা আরেকবার মুছে নিল সে।

'এই সংগঠনে বিভিন্ন আদর্শের লোক সমবেত হয়েছি আমরা,' বলে চলেছে সমুদ্র গুপ্ত। 'কেউ আমরা রাজনীতি করি। কেউ ব্যবসা। আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা ব্যবসা বা রাজনীতি কোনটাই করে না, স্রেফ প্রতিশোধ নিতে চায় বলে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে। কেউ সরকারের ওপর, কেউ অন্য কোন প্রভাবশালী মহলের ওপর খেপে আছে, তাই প্রতিশোধ নিতে চায়। সব রাজনীতিকরা আবার সরাসরি এই সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত করেন না, তাঁদের প্রতিনিধিরা রয়েছে এখানে। এ-কথা ব্যবসায়ীদের সম্পর্কেও খাটে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একত্রিত হয়েছি আমরা। আমাদের আদর্শ এক এক জনের এক এক রকম, কিন্তু উদ্দেশ্য সবার একটাই: এই দেশের ক্ষতি করা। এই দেশটাকে উন্নতি করতে না দেয়া। এবং সেরা ব্রেনগুলোকে হয় কিনে নেয়া, নয়তো নষ্ট করে দেয়া। এখানে এমন লোকও আছে যাদের নীতি বা আদর্শের কোন বালাই নেই। কিন্তু ধ্বংসাত্মক কাজে তারা দক্ষ। এদের ভরণ-পোষণ আর আরাম-আয়েশের দায়িত্ব নিয়েছি আমরা, এরাও আমাদের সংগঠনের সদস্য।'

'শুনে সত্যিই মজা লাগছে আমার,' বলল রানা। 'বেশ খাপে খাপে বসে যাব আমিও এখানে। নীতি বা আদর্শের বালাই আমারও নেই। একটা প্রভাবশালী মহলের ওপর আমিও বিতৃষ্ণ, তাই প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝছি না। এত বড় একটা সংগঠন চালাতে বিস্তর টাকারও তো দরকার হয়, কোত্থেকে আসে সেই টাকা? কে দেয়?'

'এই সংগঠনের মাধ্যমে যারা সরাসরি ভাবে লাভবান হচ্ছে তারা দেয়। হ্যাঁ, বিস্তর টাকা লাগে, কিন্তু লাভ থেকে দেয় বলে তা দিতে কারও গায়ে লাগে না।'

'শো-টা তাহলে আপনার?' ফস্ করে সরাসরি জানতে চাইল রানা।

চোখ পিট পিট করছে সমুদ্র গুপ্ত। 'তুমি জানতে চাইছ—আমি লীডার কিনা? হা ভগবান! রানা, তুমি পাগল না মাথা খারাপ? আরে না, আমি স্রেফ একজন পশু চিকিৎসক। এই জায়গাটাকে যাতে জেনুইন ডেয়ারী ফার্ম বলে মনে হয় তার জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। এই রকম আরও অনেকে আছেন এখানে। থাকো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে সব। গরু-ছাগলের রোগ সারাই আমি, সেই সাথে সংগঠনের এক-আধটু কাজও করি। তবে এই জায়গাটাকে পরিচালনা করার ব্যাপারে আমার তেমন কোন হাত নেই। সংগঠনের অ্যাকশন সংক্রান্ত কাজের বেলায় বোরহান আমার সুপিরিয়র। তোমার কৌতূহলটা প্রশংসনীয়। তোমাকে

আমি সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, এ বড় ভয়ঙ্কর জায়গা, রানা। লীডারের পরিচয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়েছে। কেউ যদি তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করে, ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে নিষ্ঠুর পরিণতির শিকার হবে সে।' মোটা একটা হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। কাজ শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলাম, এই সময় শুনলাম তুমি এসে পৌঁচেছ এখানে। শ্যেন সম্ভবত কাল কিছু প্রশ্ন করবে তোমাকে। তার আগে তোমার খানিকটা বিশ্রাম হয়ে যাওয়া দরকার। শ্যেনের কাজই হলো লোকের নার্ভের ওপর খোঁচা মারা। তারপর আছে বোরহান। ওর কথা আর কি বলব, তুমি নিজেই দেখতে পাবে।' হাত বাড়িয়ে দেয়ালের একটা বোতামে চাপ দিল সে। 'বোরহান নিয়ে যাবে তোমাকে। ওর ব্যাপারে সাবধান! ধৈর্য খুব কম ওর।'

নিঃশব্দ পায়ে কামরায় ঢুকল বোরহান।

'রানা একটু বিশ্রাম নিতে চায়,' বলল সমুদ্র গুপ্ত। খক খক করে হাসল সে। 'তুমি ওর দায়িত্ব নেবে নাকি?'

ঝট্ করে মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল বোরহান রানাকে, এক পাশে সরে দাঁড়াল।

'ঘুমুতে চেষ্টা করো, রানা,' বলল সমুদ্র গুপ্ত। 'তোমার সাথে আলাপ করে খুশি হয়েছি আমি। কাল আবার কথা বলা যাবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। ক্লান্তি লাগছে ওর। 'গুড নাইট,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

দরজার কাছে পৌঁচেছে ও, পিছন থেকে সমুদ্র গুপ্ত বলল, 'বোরহান, যাবার সময় আমাদের নতুন বন্ধুকে সেই নমুনাটা দেখাবে নাকি? আমি ইবরাহিমের কথা বলছি।' হলুদ দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল তার। 'ইবরাহিম আমাদের কথা কানেই তোলেনি, রানা। বোকা। তার বিশ্বাস ছিল, এখান থেকে পালাতে পারবে সে। অনেকভাবে তাকে নিরাশ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সর্বনাশা বিশ্বাসটা ছাড়তে পারেনি সে। শুতে যাবার আগে ওকে একবার দেখে যাওয়া উচিত তোমার। আমাদের এখানে ওটাই তোমার প্রথম সবক হোক, কেমন?'

'এসো,' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বলল বোরহান।

বোরহানের পিছু পিছু করিডর ধরে এগোচ্ছে রানা। এক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ টপকে আরেকটা করিডরে নেমে এল ওরা। একটা দরজার সামনে দাঁড়াল বোরহান। তালা খুলে কবাট দুটো উন্মুক্ত করল। 'এই যে, দেখো ইবরাহিমকে। কেউ পালাতে চেষ্টা করলে এই অবস্থা হবে তার। সাতচল্লিশ ঘণ্টা সময় লেগেছিল ওর মরতে।'

কামরার ভেতর তাকাল রানা। সিলিংয়ের সাথে ঝুলছে একটা মানুষের কাঠামো। দড়ির সাথে লোকটার পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো বাঁধা হয়েছে। মুখের পেশীতে টান অনুভব করছে রানা। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে, মুখে অদ্ভুত একটা বাঁকা হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বোরহান।

জোর করে হাসল রানা। বলল, 'এভাবে মরার কোন ইচ্ছে নেই আমার। কথা দিচ্ছি, আর যাই করি, এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করব না।'

বিষ নিঃশ্বাস-২

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৮১

এক

ঘুম ভাঙল রানার। তাজা ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। চোখ মেলে মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে।

সবুজাভ হলুদ রঙের ডিসটেম্পার করা কামরা। কার্পেটের ওপর ঝলমল করছে রোদ। রিস্টওয়াচ দেখল ও। সোয়া দশটা বাজে। ঘন্টা পাঁচেক ঘুমিয়েছে একটানা।

গরাদহীন জানালা গলে হুহু বাতাস ঢুকছে, হাফ পর্দাগুলো ওপর নিচে দু'দিকেই ফিতে দিয়ে আটকানো, নৌকার পালের মত ফুলে আছে বাতাসের চাপে। ফোমের বিছানা, লাল মখমলের চাদর বিছানো, নরম তুলতুলে। হাত বাড়িয়ে পাশের তেপয় থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে খুলল ও।

সিলিঙের দিকে চোখ রেখে ছোট ছোট টান দিচ্ছে সিগারেটে। একে একে স্মরণ করছে সব। এখানে ও বন্দী। ভয়ঙ্কর একদল লোকের মুঠোর ভেতর চলে এসেছে। বেসমেন্টের কামরায় পায়ের আঙুলে রশি দিয়ে বাঁধা ঝুলন্ত লোকটা দুঃস্বপ্ন নয়। অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয়েছে লোকটাকে, কারণ সে পালাতে চেষ্টা করেছিল। ওর কপালেও ঠিক তাই ঘটতে পারে। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক এরা। বিশেষ করে বোরহান। ড. সমুদ্র গুপ্ত নিজেই বলেছে, কাজের দিকগুলো দেখে না সে, তার মানে নাম এবং চেহারায় কেউকেটা বলে মনে হলেও এখানে সাধারণ একটা ভূমিকা পালন করছে সে। শ্যেন কাপালা ভয়ঙ্কর, কিন্তু তারও বোধ হয় ততখানি গুরুত্ব নেই। আর ফখরুল বিপজ্জনকও নয়, গুরুত্বপূর্ণও নয়। এদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তাকে, লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান—বোরহান।

এটা ওদের হেডকোয়ার্টার হওয়ারই সম্ভাবনা। জায়গাটাকে স্টেশন বলছে ওরা। কোন রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি বলে? প্রথম কাজ, জায়গাটা ঠিক কোথায় জানতে চেষ্টা করা। তারপর কোন উপায়ে কর্নেল শফির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা। তাড়াহুড়ো করে কিছু হবে না, সময় এবং সুযোগ বুঝে সেটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। নজরবন্দী অবস্থায় এসব করতে যাওয়া মানে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া। কোথাও একটু ভুল হয়ে গেলেই আঙুলে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে সিলিঙের সাথে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মুক্তি নেই। নিঃশব্দে ক্ষীণ একটু হাসল ও। ড. সমুদ্র গুপ্তের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ঝুলন্ত লাশটা তাকে দেখাবার

কথা ওই মোটা লোকটার মাথাতেই এসেছিল। মনে পড়লেই কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে রানার।

কাভার হিসেবে একটা ডেয়ারী ফার্মকে ব্যবহার করছে এরা। জায়গাটার সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ড. সমুদ্র গুপ্ত যা বলেছে, বিনা আপত্তিতে সমস্তটাই বিশ্বাস করে নিয়েছে রানা। কাঁটাতারের ইলেকট্রিফায়েড বেড়া, শিকারী কুকুর, ইনভিজিবল-রে আর সশস্ত্র প্রহরী। বেরিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেই অপঘাতে মৃত্যু। উঁহুঁ, যেভাবে হোক ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে তাকে, তা নাহলে কোন সুবিধে করা যাবে না।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল ও। ফার্মটা কোথায় তা সে জানবে কিভাবে? ফোন আছে এখানে, লেবেল যদি তুলে ফেলে না থাকে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে জিজ্ঞেস করলে একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ছোটখাট ব্যাপারে কোথাও না কোথাও কোন না কোন ভুল করে রেখেছে ওরা, খুঁজে বের করতে হবে সে-সব।

অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। কিন্তু কামরায় ঢুকল বোরহান ধীর পদক্ষেপে। বগলের নিচে দেখা যাচ্ছে কাপড়ের একটা বাণ্ডেল। ছুঁড়ে বিছানার ওপর ফেলল সেটা। 'এগুলো পরো। তোমার কাপড়চোপড় খুলে ওয়ারড্রোবে রেখে দিয়ো। বিশ্বস্ত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন সবাইকে এই সাদা পোশাক পরতে হয়। ব্রেকফাস্ট আসছে। সাড়ে এগোরোটায় কথা আদায় করা হবে তোমার কাছ থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর মুচকি হেসে জানতে চাইল, 'স্রেফ কৌতূহল বোধ করছি…রাতে যে লাশটা দেখালে আমাকে, ওটা তোমরা সরাবে কিভাবে?'

বোরহানের চেহারায় ক্ষীণ একটু তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। হাসল সে। 'লাশটা তোমাকে বেশ ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে, তাই না? গুড। লাশ গায়েব করা এখানে কোন সমস্যাই নয়। দুধ জাল দেয়ার জন্যে প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক চুলো আছে আমাদের। হাড় পর্যন্ত ছাই করা যায়।'

নিঃশব্দ পায়ে ফিরে গেল বোরহান। যাবার সময় আবার দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা। গম্ভীরভাবে সেদিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর উঠে বসে হেলান দিল বালিশে, বোরহানের দিয়ে যাওয়া কাপড়গুলো নেড়েচেড়ে দেখছে। সাদা ট্রপিক্যাল স্যুট, সাদা ক্রেপসোল লাগানো জুতো। স্যুটের পিছনে গোল। একটা চাকতি। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, ক্ষীণ একটু আলোর ভাব রয়েছে ওটায়। রাতের অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করবে। অন্ধ না হলে যে-কোন পিস্তল বা রাইফেলধারীর অনায়াস টার্গেট হতে পারবে এটা।

দাড়ি কামাচ্ছে ও, এই সময় একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে তাল গাছের মত লম্বা নঈম ঢুকল ব্রেকফাস্ট নিয়ে। বিছানার পাশে, টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখল সে। কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় রানার উদ্দেশ্যে চাপা একটা হুঙ্কার ছেড়ে গেল।

লক্ষ্য করল রানা, ওর ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করা হচ্ছে না। ব্যাপারটার মধ্যে আশ্চর্য একটা হুঁশিয়ারি সঙ্কেত প্রকাশ পাচ্ছে। মুক্ত-স্বাধীন থাকলেও এখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই, সেটাই বোঝাতে চাইছে ওরা। ভেজানো দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল ও। করিডরটা লম্বা, উজ্জ্বল আলোয় দিনের মত ফর্সা। ইলেকট্রিক বালবগুলো মোটা কাঁচের আড়ালে সিলিঙের সাথে আটকানো।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ফিরে এল ও। দাড়ি কামানো শেষ করে সাদা ট্রপিক্যাল স্যুটটা পরে নিল। দু'টুকরো কেক, সেদ্ধ দুটো ডিম খেল। কফির কাপ হাতে নিয়ে বসল একটা সোফায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। বাইরে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ফার্মটা। শেষ সীমানায় উঁচু পাঁচিল। ফার্মের ভেতর মাথা উঁচু গাছ আর ফাঁকা মাঠ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। লম্বা একটা লেকের খানিকটা দেখা যাচ্ছে ডান দিকে। কোথাও কোন লোকজন নেই। গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সব এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। দূর প্রান্তের পাঁচিলের মাথায় আকাশ দেখা যাচ্ছে।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় কামরায় ঢুকল খাদেম। ঝট করে ডান হাত তুলে বুড়ো আঙুলটা বাঁকা করল সে, কাঁধের ওপর দিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল। 'চলো,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সে।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গলার কি অবস্থা? ব্যথা-ট্যথা আছে নাকি এখনও?'

চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল বেঁটে শিম্পাঞ্জীর। কিন্তু মুখের চেহারা ভাবলেশহীন। 'ফলো করো আমাকে,' কঠিন সুরে বলল সে। করিডর ধরে হাঁটছে, থপ্ থপ্ শব্দ হচ্ছে পায়ের। সিঁড়ির ক'টা ধাপ টপকে আরেকটা করিডরে নেমে এল সে। ড. সমুদ্র গুপ্তের কামরার দিকে এগোচ্ছে। নিঃশব্দে অনুসরণ করছে তাকে রানা।

জানালার পাশে একটা মস্ত ডেস্ক, সেটার পিছনে বসে আছে ড. সমুদ্র গুপ্ত। দরজার দিকে পিছন ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যেন কাপালা। দরজার পাশে, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে বোরহান। নঈম দাঁড়িয়ে রয়েছে কামরার মাঝখানে, বাঁ হাতের লম্বা আঙুলগুলো কিলবিল করছে উরুর ওপর। ডান হাতে লোহার কাঁটাওয়ালা একটা চাবুক দেখা যাচ্ছে।

'এসো, রানা,' হলুদ দাঁত বের করে বলল ড. সমুদ্র গুপ্ত। 'খাদেম, মি. রানাকে একটা চেয়ার দাও।' ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার রাখা হলো। 'বসো, রানা।'

বসল রানা। উত্তেজনার কোন ছাপ নেই চেহারায়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু ঠিক পিছনেই রয়েছে খাদেম, সে-ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ও। নঈমের হাতের চাবুকটার কথাও সরাতে পারছে না মন থেকে।

'শোনো, রানা,' শুরু করল ড. সমুদ্র গুপ্ত, 'সময় নষ্ট করতে রাজী নই আমরা। তোমার যা বলার আছে তা আমরা এখনই সমস্ত শুনতে চাই। আমাদেরকে কিছু তথ্য দিতে চাও তুমি, তাই না? শ্যেন কাপালাকে তুমি বলেছ, আমাদের সংগঠন সম্পর্কে নাকি অনেক কথাই প্রকাশ পেয়ে গেছে, এবং আমাদের

অপারেশনগুলোকে ব্যর্থ করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এসব তথ্য কতটুকু সত্যি?'

'সবটুকু,' বলল রানা। 'এন.এস.আই.-এর কাছে আপনাদের অস্তিত্ব এখন আর গোপন কোন ব্যাপার নয়। তারা কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিকে আপনারা খুন করেছেন, এ.এস.আই. তা জানে। মিল-কারখানায় বড় বড় ধর্মঘটগুলো আপনাদের উসকানিতে আর টাকায় পরিচালিত হচ্ছে, তাও ওদের অজানা নেই। তাছাড়া, সীমান্ত পথে ইদানীং চোরাচালানের যে ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে তার জন্যে আপনারা দায়ী, একথা কর্নেল নিজে বলেছে আমাকে। আপনারা নাকি রপ্তানী বন্ধ করার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন, তাও আমাকে বলেছে সে। ওরা আপনাদের একজন এজেন্টকে ধরে কথা আদায় করার সময় মেরে ফেলেছে। তার নম্বর বারো। মরার আগে সব কথা জানিয়ে গেছে সে।'

'এসব আমি শুনেছি,' বলল ড. সমুদ্র গুপ্ত। একদিকে কাত হয়ে পকেটে হাত ভরল সে, রুমালটা বের করে নাকের ডগা মুছল। দুই চোখে রাজ্যের অস্বস্তি। 'এই কর্নেলের নাম কি?'

'কর্নেল শফিকুর রহমান,' সাথে সাথে জবাব দিল রানা। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সাথে কাজ করেছিলাম। এমন যোগ্য লোক আমি আর দেখিনি। এমন ভয়ঙ্কর মানুষও আমার আর চোখে পড়েনি।'

গুপ্ত আর কাপালা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আমাদের সম্পর্কে আর কি জানে সে?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করল শ্যেন।

'তা আমি বলতে পারব না,' বলল রানা। 'তবে ধরে নিতে পারো, তোমাদের সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেছে সে। জেড রিং সম্পর্কে জানে। বারো নম্বর যা কিছু জানত সব বলে গেছে। সেটা কতটুকু তা আমার চেয়ে তোমরাই ভাল বলতে পারবে। বারো নম্বর যা জানত, কর্নেল শফিও তাই জানে, ধরে নিতে পারো। খাদেম আর নঈমের ওপর নজর আছে তার। ওদের ব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল।'

রুমাল দিয়ে আরেকবার নাকের ডগা মুছল ড. গুপ্ত। 'হেডকোয়ার্টার··· আমাদের এই জায়গা সম্পর্কে কিছু জানে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'তা জানে না, তবে আপনাদের যে একটা হেডকোয়ার্টার আছে সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। খুঁজছে। খুঁজে বের করতে খুব একটা বেশি সময়ও লাগবে না তার। কোন কাজে হাত দিয়ে আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি কর্নেল। তাছাড়া, আপনারা যেভাবে সাহায্য করছেন তাকে, সাফল্য তার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে বলে মনে হয় না।'

'আমরা সাহায্য করছি?' শ্যেন কাপালা জানতে চাইল।

'করছ না?' ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'নঈম আর খাদেমের মত লাল পতাকা কার চোখ এড়াবে বলো? দেখলেই তো চেনা যায় ওদেরকে।'

ড. গুপ্ত আর শ্যেন আবার দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর বোরহানের দিকে

তাকাল গুপ্ত, বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে মি. রানা আমাদের সাথে অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা করছেন। আরও আলোচনা করার আগে এদের দু'জনকে যার যার কাজে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়?' কথা শেষ করে খাদেম আর নঈমের উদ্দেশ্যে সস্নেহ হেসে হাত নাড়ল সে।

ওরা দু'জনেই চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল বোরহান। 'তোমরা বাইরে যাও,' হুকুমের সুরে বলল সে।

খাদেম আর নঈম চলে যেতে গুপ্ত বলল, 'এবার বলো, রানা, এসবের মধ্যে হঠাৎ তুমি কোত্থেকে এলে?'

খুব সহজভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা। কানিজ ফাতেমা, তার জেড রিং কুড়িয়ে পাওয়া, তার খুন, ইন্সপেক্টর তোয়াব খান কিভাবে এসে ওকে নিয়ে গেল কর্নেল শফির কাছে, সবশেষে কর্নেলের সাথে বৈঠকে কি কি কথাবার্তা হলো, সবই বলল ও। একটা মিথ্যে কথাও যেন মুখ থেকে বেরিয়ে না যায় সে-ব্যাপারে সতর্ক হয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে শ্যেন কাপালা ইঙ্গিত দিয়ে গুপ্তকে আশ্বাস দেবে যে সত্যি কথাই বলছে ও।

'যা সত্যি তা মেনে নেয়া উচিত,' বলে চলেছে রানা। 'আপনারা নিরাপদ, এই অনুভূতিটা এখন মিথ্যে হয়ে গেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী একটা প্রতিষ্ঠান আপনাদের বিরুদ্ধে লেগেছে। সতর্কতা অবলম্বন না করলে নিজেদের ভরাডুবি আপনারা ঠেকাতে পারবেন না। আমি যতটুকু বুঝি, সূত্র ধরে ধরে এগোচ্ছে কর্নেল, আপনাদের এই হেডকোয়ার্টার খুঁজে বের করা তার পক্ষে শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আপনাদেরকে অন্য কোথাও উঠে যাবার জন্যে মানসিক ভাবে তৈরি থাকতে হবে।'

'আর কোন পরামর্শ দিতে চাও তুমি?'

'সবচেয়ে বোকামি হয়েছে জেড রিংটা বিলি করা,' বলল রানা। 'সবার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিন ওটা। স্পাই শিকার করার পাল্টা একটা ব্যবস্থা নিন। সংগঠনের কোন সদস্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার ব্যবস্থা করুন। সংগঠনে যারা থাকবে তাদের সবাইকে বিশ্বস্ত হতে হবে। ওই দুই লাল পতাকার মত কোন লোককে সংগঠনে নেবেন না। ওদের সবাইকে চেনে শফি।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠল কামরার ভেতর। শ্যেন কাপালার দিকে তাকাল গুপ্ত, বলল, 'ঠিক বলেছে ও। প্রথম থেকেই ওদেরকে কাজে লাগাতে নিষেধ করে আসছি আমি। ওদেরকে বাদ দিতে হবে।'

'এখানে থাকুক ওরা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল বোরহান। 'বাইরে কোন কাজে না পাঠালেই হবে। কাজের লোক ওরা, ওদেরকে আমি হারাতে চাই না।'

'হ্যাঁ,' বলল শ্যেন কাপালা। 'এখানে থাকুক ওরা।' চ্যাপ্টা মুখটা থমথম করছে তার, তীক্ষ্ণ চোখে রানার চেহারায় কি যেন খুঁজছে। 'আর কি পরামর্শ দেবার আছে তোমার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সমস্ত ব্যাপারটা জানা থাকলে নিশ্চয়ই আরও অনেক

পরামর্শ দিতে পারব,' বলল ও। 'কিন্তু তোমাদের এই সংগঠন কিভাবে চালাও তোমরা সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখো কিভাবে তাও আমি জানি না। যদি সম্ভব হয় ওদের চেহারা দেখাবার ব্যবস্থা করো, কাউকে যদি চিনতে পারি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কর্নেলের লোক তোমাদের এই সংগঠনে অনুপ্রবেশ করেছে। তোমাদের মনে রাখা দরকার, ট্যাংরা-পুঁটি ধরা উদ্দেশ্য নয় তার, রুই-কাতলা আর রাঘব বোয়ালটাকে ধরতে চায়। যখন বুঝতে পারবে লীডার ফস্কে যেতে পারবে না তখনই জাল গুটাবে সে, তার আগে পর্যন্ত এমন কিছু করবে না সে যাতে তোমরা সাবধান হয়ে যাও। টাকার জন্যে কর্নেলের কাজ করতে রাজী হয়েছিলাম, সে-টাকার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে শ্যেন কাপালা আমাকে খুনের সাথে জড়িয়ে দিয়ে। এন.এস.আই. আমাকে আর প্রোটেকশন দিতে পারছে না। ফেঁসে গেছি আমি। তোমরা চাইলে টাকার বিনিময়ে আমি···।'

'কর্নেলকে সরিয়ে দেয়া হোক, তুমি কি এই পরামর্শ দেবে?' তির্যক দৃষ্টিতে রানাকে দেখছে শ্যেন কাপালা।

'একশোবার,' বলল রানা। 'সেই তো এন.এস.আই-এর ব্রেন। তাকে খতম করতে না পারলে তোমাদের টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। শফিকে মারতে পারলে ওদের অ্যাকটিভিটি টিমে হয়ে যাবে। কিন্তু তা খুব বেশিদিনের জন্যে নয়। তার জায়গায় নতুন লোক আসবে। কিছুদিন পর সে-ও লাগবে তোমাদের পিছনে।'

'কিন্তু নতুন লোকটা কর্নেল শফির মত যোগ্য আর বুদ্ধিমান নাও হতে পারে।'

'তা ঠিক।'

'তুমি তাহলে বিশ্বাস করো কর্নেল শফিকে মেরে ফেলাটাই আমাদের জন্যে ভাল?'

হঠাৎ হাসল রানা। 'ভাল, যদি তাকে মারতে পারো,' বলল ও। 'কিন্তু সে ভাগ্য তোমাদের হবে কিনা কে জানে। কর্নেল শফি সম্ভাব্য সবরকম আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে।'

'তুমি বলতে চাইছ কাজটা অসম্ভব?'

'না, তা আমি বলছি না।'

'সম্ভব?'

একটু চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আরও ভেবে দেখতে হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর শ্যেনই প্রশ্ন করল, 'দায়িত্বটা যদি তোমাকে দেয়া হয়? নেবে?'

'ভেবে দেখতে হবে,' বলল রানা। 'তার আগে জানতে হবে, বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল শ্যেন কাপালার। 'বুঝলাম না।'

'দেখো, বুঝেও না বোঝার ভান করো না। প্রাণ হাতে নিয়ে তোমাদের দলে

যোগ দেবার ঝুঁকি নিয়েছি এমনিতে নয়, নগদ নারায়ণের আশায়। রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই, আমি কোন আদর্শেরও অনুসারী নই। কোন বিদেশী ব্যবসায়ীর চামচা হিসেবেও কাজ করতে আগ্রহী নই। আমার কোন দোসর নেই, আমি একা। পাঁচ লাখ টাকা দাও আমাকে, তোমাদের প্রাণের দুশমন কর্নেল শফিকে সরিয়ে দিচ্ছি। টাকাটা আমার ব্যাংকে জমা দিতে হবে। অর্ধেক এখুনি, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে।'

'কিন্তু খানিক আগে তুমি যা বললে তাতে মনে হলো কর্নেল শফি তোমার বন্ধু মানুষ।'

'তা আমি বলিনি। বলেছি, একসাথে কাজ করেছি আমরা।'

'কিন্তু তাকে তুমি মেরে ফেলতে রাজী আছ?'

'আপত্তি নেই, যদি আমার শর্ত পূরণ করা হয়।'

'আচরণটা অর্থপিশাচ, ভাড়াটে খুনীর মত হয়ে যাচ্ছে না?'

রেগে গেল রানা। 'বড় বেশি বাজে কথা বলো তুমি। এটা আমার পেশা। তোমরা আমাকে খুন করার জন্যে ভাড়া করছ। আমার আচরণ ভাড়াটে খুনীর মত হবে না তো কি রকম হবে? আর শোনো, আমাকে আর পিশাচ বলো না কখনও। কাজের গুরুত্ব অনুসারে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি আমি। তোমরা যদি কখনও খাদেম বা নঈমকে খুন করার প্রস্তাব দাও আমাকে, মাথা পিছু দু'হাজারের বেশি চাইব না।'

'আচ্ছা, ধরো, তোমার শর্তে যদি রাজী হই আমরা, কাজটা কিভাবে করবে তুমি?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা। 'অত্যন্ত জটিল একটা কাজ। সাংঘাতিক কঠিন। আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজ হবে ওটা। অনেক চিন্তা আর নিখুঁত প্ল্যান দরকার এর পিছনে। প্রস্তুতির জন্যে লম্বা সময় চাই। তবে এইটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, কাজটা করা সম্ভব, আমি তা করতে পারব।'

'তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব আমরা,' বলল শ্যেন কাপালা। 'হয়তো কাজটা করার কোন দরকার হবে না। কিংবা এত বড় একটা ঝুঁকি আমরা হয়তো শেষ পর্যন্ত নেব না। কর্নেল শফির মত একজন লোক খুন হলে তুমুল আলোড়ন উঠবে, খেপে যাবে একটা গোটা ডিপার্টমেন্ট। আর তাকে খুন করতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হও তুমি, সে যদি বেঁচে যায়, আমাদের জড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে লোকটা। অন্তত চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। যাই হোক, কাজটা করার ঝুঁকি যদি নিই আমরা, তোমাকেই প্রথমে সুযোগ দেয়া হবে। তুমি যদি সফল হও, তোমাকে দলে ভর্তি করে নেবার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে একবার কাজ করতে শুরু করলে দু'হাতে টাকা কামাবে তুমি। কিন্তু তুমি যদি ব্যর্থ হও, তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। ব্যর্থ লোককে সংগঠনে রাখি না আমরা। এগুলো আমাদের শর্ত। তুমি রাজী তো?'

কট্ করে শব্দ হলো লাইটার জ্বালার। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে একমুখ

ধোঁয়া ছাড়ল রানা। বলল, 'একজন বেঈমানকে উচিত শাস্তি দিতে আজ পর্যন্ত কখনও ব্যর্থ হইনি আমি, কাজেই ব্যর্থ হলে আমার কি হবে তা নিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা করছি না। আমরা তাহলে একমত হলাম, কাজটা যদি করি আমি, পাঁচ লাখ টাকা পাব, আর সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করব—ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। ভেরি গুড।' খুশি হয়ে উঠল রানা। 'মনে হচ্ছে এত দিনে নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমি।'

দুই

সরু, লম্বা ডাইনিং হল। সিলিংটা অনেক উঁচুতে। দেয়ালের অর্ধেকটা মেহগনি কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা, বিদেশী শিল্পীর আঁকা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর লাইফ সাইজ পোর্ট্রেট থেকে শুরু করে মোনালিসার ফটো, সব ধরনের ছবি ঝুলছে। পালিশ করা এক ডজন টেবিল, টেবিল পিছু চারটে করে চামড়া মোড়া চেয়ার। প্লেট ইত্যাদি সব সিলভারের তৈরি, প্রতিটি টেবিলে একটা করে দামী ফুলদানী, গোছা গোছা তাজা ফুল। ডান দিকে ফখরুল আর বাঁ দিকে বোরহানকে নিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসল রানা। নাক বরাবর একটা জানালা দেখা যাচ্ছে। বাইরে ঘাস মোড়া মাঠের খানিকটা চোখে পড়ে, আরেক দিকে একটা গ্যারেজ, ভেতরে ট্রাক্টর, ক্রেন, ট্রাক আর কয়েকটা জীপ।

সাদা স্যুট পরে ক্ষীণ একটু অস্বস্তিবোধ করছে রানা, বসার সময় লক্ষ্য করল চারদিকের টেবিল থেকে কৌতূহলী চোখে সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

একবার চোখ বুলিয়েই টেবিল দখল করে বসে থাকা লোকজনকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলল রানা। একদলকে দেখলেই চেনা যায়, গুণ্ডামি আর খুন-খারাবি এদের পেশা। গায়ে উৎকট রঙচঙে পোশাক, চেহারায় নেশা আর লোলুপতার ছাপ, চোখে কঠিন, নীচ দৃষ্টি। আরেক দল শান্তশিষ্ট, সৌম্য চেহারা, পোশাক-আশাক ধবধবে সাদা হালকা রঙের, কথাবার্তা হাবভাবে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস লক্ষ করা গেলেও সবকিছুর মধ্যে একটা ধীরস্থির ভাব রয়েছে। কিন্তু এদের চোখগুলো অন্যরকম। অদ্ভুত একটা জেদ বা প্রতিজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় আশ্চর্য একটা নেশার ঘোরে চকচক করছে চোখগুলো। সব মিলিয়ে ফ্যানাটিকের চেহারা। আদর্শের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

পাশের একটা টেবিলের ওপর নজর পড়ল রানার। এটার সাথে চারটে নয়, ছয়টা চেয়ার দেখা যাচ্ছে। ওর মতই সাদা স্যুট পরে ছয়জন লোক বসে রয়েছে টেবিল ঘিরে। লোকগুলোর বয়স হয়েছে, চল্লিশের কম নয় কেউ। একটাও কথা বলছে না তারা, কিন্তু প্রত্যেককেই অস্থির দেখাচ্ছে। লোকগুলোকে কেমন যেন মানসিকভাবে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে রানার। এই একটা টেবিলের লোকেরাই কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

'আমার বোধহয় ওই ভদ্রলোকদের সাথে বসা উচিত ছিল,' ফখরুলকে বলল রানা। 'তোমাদের সাথে এখানে আমাকে মানাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পরিবেশটাকে অগোছাল করে তুলেছি আমি।'

একটু অপ্রতিভভাবে হাসল ফখরুল, বলল, 'আরে না! আপনি তো পরীক্ষার মধ্যে আছেন, বোধহয় পাসও করে যাবেন। কিন্তু ওদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, কয়েকজনের পরীক্ষা নেবার দরকারই পড়েনি—ওরা সবাই এখানে বন্দী।'

'কিছুটা হলেও ওদের সাথে আমার তাহলে পার্থক্য আছে? খুশি হলাম। কিন্তু, তাহলে এই সাদা পোশাক কেন? এ থেকে কবে বেরুতে পারব আমি? পিছনের চাকতিটা আগুনের মত গরম লাগছে পিঠে।'

'ওটার কথা ভুলে গেলেই পারো, তাহলে আর টেরই পাবে না কিছু,' বলল বোরহান। 'পালাবার চেষ্টা না করলে ওটা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

'পালাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই,' বলল রানা। 'সে ইচ্ছে থাকলে কোন্ বোকা নিজের বুদ্ধিতে এখানে আসে?'

'আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু করছেন আপনি,' বলল ফখরুল। 'আপনার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ঠিক করেছি আমরা। টাইম ফিউজ ইত্যাদি তো আপনি খুব ভাল বোঝেন, তাই না?'

রোস্ট করা পটেটো চামচে গেঁথে মুখে পুরল রানা। 'আমার চেয়ে ভাল আর কেউ বোঝে কিনা জানা নেই,' বলল ও। 'কাজটা কি?'

'সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনটাকে উড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আগের চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে আমাদের, তাই এবার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্ল্যান করা হচ্ছে। পাওয়ার স্টেশনের দু'জন ইঞ্জিনিয়ার হাত মিলিয়েছে আমাদের সাথে। আপনি আমাদের কিছু লোককে বিস্ফোরক ও স্যাবোটাজ সম্পর্কে ট্রেনিং দেবেন। প্রয়োজনীয় ব্লু প্রিন্টস আর ফটোগ্রাফ যোগাড় করা হয়েছে। পারবেন?'

'না পারার প্রশ্নই ওঠে না,' বলল রানা। 'কিন্তু এ থেকে আমি কি পাব?'

'পাবে না।' বলল বোরহান। 'কিছুই পাবে না তুমি। হয় যা বলা হবে করবে, না হয় এক হপ্তা সেলে কাটাতে হবে, বেছে নাও।'

হাসল রানা। 'বুঝেছি, এটা ফাও করে দিতে হবে। বেশ, দেব করে।'

পরে, ওরা যখন লাঞ্চের ওপর হামলা চালাচ্ছে, ফখরুলকে বলল রানা, 'এখানে আসার পর থেকে এত কিছু ঘটছে যে তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি কথাটা···তোমার সুন্দরী বোনটাকে এখানে দেখছি না যে? কেমন আছে সে?'

নিমেষে মুখ শুকিয়ে গেল ফখরুলের। চট্ করে চোরা চোখে বোরহানকে একবার দেখে নিল সে। নিচু গলায় বলল, 'ভাল আছে।'

'এখানে তাকে দেখতে পাব না?'

প্রতি মুহূর্তে আরও কালো হয়ে যাচ্ছে ফখরুলের মুখের রঙ। 'এখানে কি করতে আসবে? আমাদের এই সংগঠন সম্পর্কে কিছুই জানে না ও।'

রানার কাঁধে টোকা মারল বোরহান।

ধীরে ধীরে ফিরল রানা।

'এখানে এসব বিষয়ে কথা বলা নিষেধ,' বলল বোরহান। কিন্তু রানা দেখল, কথা বলার সময় ফখরুলের দিকে তাকিয়ে আছে বোরহান। চোখে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি।

'ওর বোনের সাথে পরিচয় আছে তোমার?' বোরহানের কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে বলল রানা। 'মেয়েটাকে দেখেছ কখনও?' হাসছে ও, যেন আহামরি স্বাদের কোন ভাল খাবারের কথা মনে পড়ে গেছে। 'আশ্চর্য মেয়ে। আশ্চর্য ভাল মেয়ে।' ডাইনিং হলে বসে থাকা মেয়েগুলোর দিকে তাকাল ও। 'এখানে এরা যারা রয়েছে, দূর দূর, এদের মধ্যে থেকে তুমি আর কি বাছাই করবে! এখন শুধু মেকআপটুকু বাকি আছে এদের, সেটা খসে পড়লেই পেত্নী বেরিয়ে পড়বে। কি, ঠিক বলিনি?'

বোরহানের ঠাণ্ডা চোখের পাতা পাখির ডানার মত দ্রুত ঝাপটা মারল কয়েকবার। 'হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে নয়,' মৃদু গলায় বলল সে।

'কিই বা এসে যায় তাতে,' বলল ফখরুল, সামলে নিতে চেষ্টা করছে নিজেকে। 'এখানে ওরা কাজ করার জন্যে এসেছে, রূপ দেখাতে নয়। ওদের কাজে আমরা সন্তুষ্ট, সেটাই বড় কথা।'

'তা ঠিক,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কিন্তু কাজের সাথে সাথে আমাদেরকে যদি কিছুটা আনন্দ দিতে পারত, আমরা কি আরও বেশি সন্তুষ্ট হতাম না? আনন্দ আমাদের সবার দরকার, ওদেরও—কথাটা অস্বীকার করতে পারো?'

ঠিক বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু মনে হলো বোরহান তার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছে, যদিও মুখ ফুটে কিছু বলছে না।

'কানিজ ফাতেমাকে তুমিই বোধহয় দু'ভাগ করেছিলে?' বোরহানের দিকে ফিরে জানতে চাইল রানা। 'মেয়েটা কিন্তু বেশ ছিল, তাই না?'

'তাতে কি?' এই প্রথম দাঁত বের করে হাসল বোরহান। 'দেখতে মন্দ ছিল না, কিন্তু মাগী চোর ছিল একটা।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তা ঠিক। মোটামুটি চিনতাম ওকে। ওরা সবাই কমবেশি চোর বা লোভী হয়। তবে ভাল মেয়ে যে ওদের মধ্যে একেবারেই নেই তা নয়। আছে।'

বোরহান একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কোন প্রতিবাদ বা উৎসাহ কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না।

'তোমার সাথে আরেকটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে নিক, তারপর দেখবে এমন সব জায়গায় নিয়ে যাব, এই দুনিয়াটাকেই মনে হবে স্বর্গ। একসে এক মেয়ে, বুঝলে, দেখলে শালার মাথা ঘুরে যায়! ওই যে তুমি বললে, শুধু দেখতে ভাল হলেই চলে না, আমারও সেই কথা। মেয়েমানুষ হবে জ্যান্ত কই মাছ, লাফ-ঝাঁপ দেবে। এইসব মেয়েদের পার্টিতে গেছ কখনও? যাওনি। দু'একটা গল্প বলি, তাহলে একটু ধারণা হবে। শোনো।' শুরু করল রানা।

পার্টি গার্লদের উদ্দাম উচ্ছৃংখল আচরণের বর্ণনা দেবার সময় লক্ষ্য করল রানা, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে, নির্লজ্জ লালসায় চকচক করছে বোরহানের চোখ। কিন্তু দৃষ্টিতে নগ্ন ঘৃণা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফখরুল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বোরহান। 'বন্ধ করো, রানা,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। তার চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠেছে। 'একদিনেই বড় বেশি গায়ে পড়া ভাব দেখাচ্ছ তুমি।'

'আপত্তি থাকলে আগে বলোনি কেন?' অবাক চোখে দেখল ওকে রানা। 'আমি তো ভাবছিলাম, শুনতে ভালই লাগছে তোমার। চাইছ না যখন, বলব না। কিন্তু, মনে করো না এসব বানোয়াট। হয় এসব। আরও কত কি কারবার হয়! আমাকে যখন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবে, তখন যদি ইচ্ছে হয় বলো আমাকে, একবার নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব। ওদের চেহারা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার।'

বিকেলটা কাটাল রানা সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন থেকে তুলে আনা ইঞ্জিনিয়ার দু'জনের সাথে। কিভাবে জেনারেটর ধ্বংস করতে হয়, কিভাবে টাইম-ফিউজ ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদি শেখাল ওদেরকে। দু'জনেই বয়সে তরুণ, দুনিয়া সম্পর্কে খুবই সীমিত ধারণা। ওদের সাথে কথা বলে অদ্ভুত কয়েকটা তথ্য পেল রানা। শিক্ষিত হলে কি হবে, মানুষ যে চাঁদে গেছে সে-ব্যাপারে এখনও সংশয় আছে ওদের মনে। রাজনীতি বিষয়ে আলাপের সময় ওদের একজন বলল, 'বাঙালীরা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে, এদেরকে সৎ পথে আনার জন্যে নির্দয় একজন আদর্শ ডিক্টেটর দরকার।' বাস্তবতার ধারে কাছে ঘেঁষতে রাজী নয় এরা, বেঁচে আছে আশ্চর্য এক কল্পনার রাজ্যে। নিজেদের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, ভাগ্যের পরিবর্তন চায়। ওদের ধারণা, দেশে বিরাট একটা পরিবর্তন আসন্ন। বোরহানদের এই সংগঠনই সেই পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে।

ট্রেনিং দেয়ার কাজ শেষ করে ল্যাবরেটরিতে একা বসে সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, এই সময় সেখানে ফখরুল এসে হাজির হলো।

'কি রকম মনে হলো ওদেরকে?' জানতে চাইল সে। 'সন্তোষজনক?'

'কি বলব!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কাজটা করতে পারবে ওরা, কিন্তু বিস্ফোরণের সাথে নিজেরাও উড়ে যাবে কিনা তা আমি বলতে পারি না।'

'তা উড়ে যায় যাক,' হাসল ফখরুল। 'কাজটা দিয়ে কথা।' পরমুহূর্তে চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল তার। কি যেন মনে পড়ে গেছে। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে রানার দিকে একমনে তাকিয়ে আছে। 'মি. রানা।'

হাত ঝাপটা দিয়ে সামনে থেকে সিগারেটের ধোঁয়া সরিয়ে ভাল করে তাকাল রানা। 'কি ব্যাপার, ফখরুল?'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব আমি, রাখবেন?'

'অনুরোধ? আমাকে?' বিস্মিত দেখাচ্ছে রানাকে।

'হ্যাঁ। বোরহানের সামনে আফরোজার কথা আর যদি না তোলেন, আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব। অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ও, তাছাড়া মেয়েদের ব্যাপারে সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে···আমি চাই না আফরোজার কথা ওর সামনে আলোচনা করা হোক।'

'আফরোজার কথা তুলেছিলাম বলে আমাকে তুমি দোষ দিতে পারো না,'

বলল রানা। 'আমার তো ধারণা ছিল আফরোজাও এই সংগঠনের একজন সদস্যা।'

'কক্ষনো না!' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফখরুলের। 'প্লীজ, মি. রানা, এ-কথা ভুলেও আর কাউকে বলবেন না।'

'ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না আমার,' বলল রানা। 'তুমি বলতে চাইছ আফরোজা এই সংগঠনের সদস্যা নয়। তাহলে এই সংগঠনের কথা জানল কিভাবে সে? জানে, এ-কথা তুমি অস্বীকার করতে পারো না।'

'জানে, কিন্তু তা না জানারই মত। আপনার দোহাই লাগে, কথাটা কাউকে, বিশেষ করে বোরহানকে বলবেন না, প্লীজ! দু'একটা কথা আমার মুখ থেকেই জেনেছে আফরোজা, কিন্তু তা এমন কিছু নয়। তাতে সংগঠনের কোন ক্ষতি হবে না।'

'সে যাই হোক, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'এই সংগঠনের সাথে আমার বোন জড়িয়ে পড়ুক তা আমি চাই না।'

'কেন? কি কারণে চাও না?'

'সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি রয়েছে এতে। আফরোজা আমার একমাত্র বোন, ওকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি,' বলল ফখরুল, হাত দুটো নিজের অজান্তেই মুঠো পাকিয়ে গেছে তার। 'এ-ব্যাপারে আপনি যদি কাউকে কিছু না বলেন, আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

'আমি না হয় কিছু বললাম না, কিন্তু শ্যেন কাপালা? সে তো নিশ্চয়ই জানে...'

'কিছুই জানে না শ্যেন! কেউ কিচ্ছু জানে না। আপনি কাউকে কিছু না বললেই হবে...'

'কিন্তু ঘটনার সাথে তোমার কথা মিলছে না,' বলল রানা। 'আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে আফরোজাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল শ্যেন। কথাটা ভুলে গেছ নাকি?'

খপ করে রানার একটা হাত ধরে ফেলল ফখরুল। 'শুনুন, প্লীজ। ওটা আমার একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল। রাজী হওয়া উচিত হয়নি আমার। প্রস্তাবটা শ্যেনই দিয়েছিল। আপনি যখন ক্লাবে এলেন, ওখানেই ছিল সে। আপনি যে এন.এস.আই-এর হয়ে কাজ করছেন তা সে জানত। ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের সাথে কানিজের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল আপনাকে ওর লোক। আমার অনুমতি নিয়ে আফরোজাকে বলল, আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। একটা রোমাঞ্চকর খেলা খেলা ভাব নিয়ে আফরোজাও রাজী হয়ে গেল। খোদার কসম বলছি, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানত না ও। এই সংগঠন সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই ওর। কিন্তু বোরহানের কানে এসব যদি যায়, ধরে নেবে আফরোজা সবই জানে। সাথে সাথে এখানে নিয়ে এসে আটকে রাখবে ওকে। তার পরিণতি যে কি, বুঝতেই তো পারেন।'

'দুশ্চিন্তা করো না,' হাসল রানা। 'তোমার বোনকে খুব ভাল লাগে আমার,

এমন কিছু বলব না যাতে ওর কোন ক্ষতি হয়। কিন্তু তুমি বোধ হয় দেরি করে ফেলেছ। আরও আগে সাবধান করা উচিত ছিল আমাকে তোমার। বোরহানকে বোকা মনে করো না। আমি যখন আফরোজার কথা বলছিলাম, তোমার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। লক্ষ্য করেছ ব্যাপারটা?'

রুমাল বের করে হাত আর মুখের ঘাম মুছছে ফখরুল। 'আফরোজাকে যদি এখানে নিয়ে আসা হয়...'

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ তুমি,' হালকাভাবে বলল রানা। 'আমাকে যদি ওর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে, ওর সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করব আমি। ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওর সাথে কথা বলার সময় সাবধান! ওর মত ভয়ঙ্কর লোক এই সংগঠনে আর একটাও নেই। পাকিস্তান দু'টুকরো হবার সময় করাচীতে আটকে পড়া বাঙালীদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেবার নাম করে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিত, কিছু লোককে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলত। ওর হাত থেকে এখানে আমরা কেউ নিরাপদ নই। আপনাকে এত সব কথা বলছি, কারণ আমি জানি আফরোজাকে স্নেহ করেন আপনি। মি. রানা, আমি...আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করছি আপনার ওপর। ইচ্ছে করলে আফরোজার সর্বনাশ করতে পারেন আপনি। সেই সাথে আমারও। কিন্তু আপনি তা করবেন না জানি বলেই এত কথা বলে ফেললাম...'

'বললাম তো, দুশ্চিন্তা করো না।'

'আফরোজার সর্বনাশ হোক নিশ্চয়ই তা চান না আপনি?' উদ্বেগের সাথে রানার মুখটা সার্চ করছে সে।

'কক্ষনো না।'

'আপনাকে তাহলে বিশ্বাস করতে পারি আমি?'

'অবশ্যই।'

তবু সন্দেহ দূর হয় না ফখরুলের। দু'চোখে রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানাকে হাসতে দেখে সে-ও হাসল, কিন্তু জোর করা হাসি সেটা, ঠোঁট জোড়া কেঁপে গেল। বলল, 'আমি তাহলে যাই। এখানে কথা বলা নিরাপদ নয়। কখন কে শুনে ফেলে। আপনার ওপর তাহলে বিশ্বাস রাখতে পারি?'

'আমার কথার নড়চড় হয় না,' বলল রানা, চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে ওর।

'ধন্যবাদ।'

ফখরুল চলে যাবার পর নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে ভাবনা চিন্তা করছে। বোরহানের বিশ্বাস আর আস্থা অর্জনের ওপরই নির্ভর করছে ওর সাফল্য। দুর্বলচেতা বোকা ফখরুলের জন্যে তাচ্ছিল্য মেশানো করুণা অনুভব করছে ও। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ল্যাবরেটরি থেকে। করিডর ধরে ড. সমুদ্র গুপ্তের কামরার দিকে এগোচ্ছে।

এই সময় দরজা খুলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ড. গুপ্ত। রানাকে করিডরে দেখে অবাক হলো সে, কিন্তু মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বিস্ময়ের ভাবটুকু দ্রুত গোপন করল। 'এই যে রানা, কাজ তো শুরু করে দিয়েছ, কেমন লাগছে তোমার?'

'খুব ভাল,' বলল রানা। 'আচ্ছা, বলতে পারেন, বোরহানকে কোথায় পাব আমি? তার কামরাটা আমি চিনি না।'

মুখের হাসিটায় ঢিল পড়ল গুপ্তের। 'ওকে তোমার দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'বোরহানের হাতে সময় কম,' অস্বস্তির সাথে বলল গুপ্ত। 'ওকে বিরক্ত করা উচিত হবে না তোমার। কি দরকার ওকে? আমাকে দিয়ে কাজ হবে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। বোরহান আমাকে বলেছে, হাতের কাজ শেষ করে আমি যেন তার সাথে দেখা করি। অবশ্য আপনি যদি বলেন, তার বদলে আপনাকে রিপোর্ট দিতে পারি আমি।'

'না-না!' তাড়াতাড়ি বলল গুপ্ত। 'সে যদি তোমার সাথে দেখা করতে চেয়ে থাকে সেটা আলাদা কথা। ওপর তলায় পাবে তাকে। সিঁড়ির দিকে মুখ করা দরজাটা।'

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, ফখরুল আর গুপ্ত দু'জনেই ভয় করে বোরহানকে। সুযোগ এবং সময় মত এই অস্ত্রটা ব্যবহার করা যেতে পারে। 'ধন্যবাদ,' কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। ধাপগুলো টপকাবার সময় হঠাৎ একবার পিছন ফিরে তাকাল ও। এখনও করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুপ্ত, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। বোরহানের দরজায় নক করছে রানা, তখনও চোখ সরায়নি সে।

'কাম ইন।'

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল রানা, ধীর পায়ে ছোট একটা কামরায় ঢুকল। অফিসের মত করে সাজানো কামরাটা, জানালার কাছে একটা বিছানা রয়েছে। ডেস্কের পিছনে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বোরহান, কি যেন লিখছে খস খস করে। দ্রুত মুখ তুলে তাকাল সে। 'বলো!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। তারপর আবার ঘুরে এগিয়ে এল। দাঁড়াল ডেস্কের সামনে। বোরহানের মুখ থেকে ভুর ভুর করে কড়া ব্র্যাণ্ডির গন্ধ বেরুচ্ছে।

'এইমাত্র ফখরুল আমাকে বলল, আমি যেন তোমার সামনে তার বোনের কথা না তুলি। বলল, মেয়েদের ওপর তোমার নাকি সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে। সে তার বোনকে এই সংগঠন সম্পর্কে দু'একটা কথা জানিয়েছে, সে-কথা জানতে পারলে তুমি নাকি তাকে এখানে নিয়ে এসে বন্দী করে রাখবে। ফখরুলের ভাষায় তুমি ভয়ঙ্কর মানুষ, পাকিস্তান দু'টুকরো হবার সময় করাচীতে আটকে পড়া বাঙালীদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে ভারতে পৌঁছে দেবার নাম করে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিতে, কিছু লোককে কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে। এখানে আমরা কেউই নাকি তোমার হাত থেকে নিরাপদ নই। পাকিস্তান আমলে তোমার এই আচরণ সম্পর্কে ফখরুল যে অভিযোগ করছে তা যদি সত্যি হয় এবং

প্রকাশ পায়, তোমার মৃত্যুদণ্ড ঠেকায় কে! সে-কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার করে না, তুমি নিজেও তা ভাল করে জানো।'

চেয়ারে হেলান দিল বোরহান, হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে রাখল। মুখে ভাবের লেশমাত্র নেই। 'কি মনে করে এসব কথা শোনাচ্ছ আমাকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তার মানে? সন্দেহজনক চরিত্র বাছাইয়ের দায়িত্ব তোমরাই তো দিয়েছ আমাকে! নাকি ভুল বুঝেছি আমি? ফখরুলকে বিশ্বস্ত বলে মনে হলো না, তাই রিপোর্ট করলাম তোমার কাছে। কিন্তু তুমি যদি উল্টো অর্থ করো...'

'এত তাড়াতাড়ি শুরু করবে তুমি তা আমি ভাবিনি,' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে বলল বোরহান।

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে,' শান্তভাবে বলল রানা, 'আমার কথাগুলো পছন্দ হয়নি তোমার। দুঃখিত। ভুল বোধ হয় আমারই হয়েছে, তোমার কাছে না এসে রিপোর্টটা ড. সমুদ্র গুপ্তের কাছে করা উচিত ছিল আমার। মেরুদণ্ডের কাছে একটু দুর্বল বলে মনে হয়েছে তাকে আমার, তাই তার কাছে যাইনি। এই তো, এইমাত্র এখানে আসার পথে তিনি আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে কি করতে হবে তুমিই বরং সেটা বলে দাও আমাকে। কাকে রিপোর্ট করব আমি?'

'তোমার মতলবটা কি?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে বোরহানের, নেকড়ের মত হিংস্র দেখাচ্ছে চেহারাটা। 'গোলমাল পাকাতে চাও?'

'অবশ্যই। সেটাই কি কাজ নয় আমার? নাকি সংগঠনের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, বিশৃঙ্খলা চলছে এসব জানতে ভয় পাও তুমি?' কঠিন হলো রানার চেহারা। 'এড়িয়ে গেলে আমরা সবাই পটল তুলব, বন্ধু।'

'দু'একটা চতুর মিথ্যে কথা বলে গোলমাল পাকানো তেমন কঠিন কাজ নয়,' বলল বোরহান। 'তাই হয়তো করতে চাইছ তুমি। হয়তো তোমার কোন বদ মতলব আছে, গোলমাল পাকালে তা সিদ্ধ হবে বলে ভাবছ। এর আগেও সে-চেষ্টা করা হয়েছে, রানা, কিন্তু তারা কোন সুবিধে করতে পারেনি।'

'আমাকে সন্দেহ করছ, এটা ভাল লক্ষণ,' গম্ভীর ভাবে বলল রানা। 'কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ জিনিসটা ব্যারাম নয়, ওষুধ। কিন্তু শুধু আমাকে একা নয়, তোমার উচিত সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখা। আমার মতলবের কথা যদি জানতে চাও, এর আগেও বলেছি, এখন আবার একবার বলছি, চোখের সামনে টাকা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না আমি। টাকা থাকলে মেয়ে চাইলে মেয়ে, মদ চাইলে মদ, সব স-ব পাওয়া যায়। এখানে আমি টাকা রোজগার করতে এসেছি। কাজ দেখাতে না পারলে তোমরা আমাকে টাকা দেবে? দেবে না। তাই চুপ করে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চোর বাছতে যদি গাঁ উজাড় হয়ে যায়, আমাকে তোমরা দোষ দিতে পারো না। শুধু ফখরুল নয়, ত্রুটি শ্যেন কাপালার মধ্যেও রয়েছে। এই সংগঠন সম্পর্কে আফরোজাকে যে কিছু কিছু জানানো হয়েছে তা তার অজানা নয়, তবু কথাটা সে তোমার কানে তোলেনি। এর কারণ আফরোজার ওপর তার দুর্বলতা আছে। একটা মেয়ের জন্যে সংগঠনের নিরাপত্তার

কথা বেমালুম ভুলে থাকছে ওরা। এদেরকে তুমি কি বলবে? সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকত, শ্যেন কাপালাকে আমি দল থেকে বের করে দিতাম। ফখরুলের শাস্তির ব্যবস্থা না করে ছাড়তাম না। আর আফরোজাকে তো অবশ্যই এখানে নিয়ে এসে আটকে রাখতাম। অবশ্য এসব করতাম শুধুমাত্র যদি দলের স্বার্থটাকেই বড় বলে মনে করতাম।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বোরহান। তারপর হঠাৎ ক্ষীণ একটু হাসল সে। বলল, 'শ্যেনকে বের করে দেয়া অত সহজ নয়। লীডার তাকে পছন্দ করেন।'

'সেটা কোন বাধা নয়,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'লীডারের সাথে যোগাযোগ করো। তাঁকে সব কথা খুলে বলো। তাঁর আস্থা অর্জন করো। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সময় নিয়ে করো। শ্যেনের ওপর যদি নজর রাখো, তার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ যোগাড় করতে পারবে। ফখরুলের ব্যাপারে কি করতে যাচ্ছ?'

'ওর সাথে কথা বলব,' বলল বোরহান, হাসল। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, ওর বোনকে অবশ্যই এখানে নিয়ে এসে রাখা দরকার। ফখরুলের সাথে আজ রাতে কথা হবে আমার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বলল, 'সে হয়তো সব কথা অস্বীকার করবে...।'

'স্বীকার করাবার পদ্ধতি জানা আছে আমার,' হালকা ভাবে বলল বোরহান।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে এসেছে রানা, এই সময় পিছন থেকে বলল বোরহান, 'কাল থেকে তুমি তোমার নিজের কাপড় পরতে পারো। ইনফরমারকে পুরস্কার দেয়া উচিত।'

অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। 'ধন্যবাদ,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ও। করিডরের শেষ মাথায় পাথরের মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে ফখরুল। দু'চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। মুখটা ঝুলে পড়েছে, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। রানা তার দিকে ভাবলেশ শূন্য চোখে একবার তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। এক কাপ চা খেয়ে নিজের কামরায় ফিরে যাবে ও।

তিন

পাঁচ মিনিট হয়নি নিজের কামরায় ফিরে এসেছে রানা, হঠাৎ গোটা বাড়ি সচকিত হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ বেল-এর শব্দে। মুহূর্তের জন্যে কাঠ হয়ে গেল ও। শুনছে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল করিডরে। দেখার কিছু নেই এখানে। সিঁড়ির নিচে থেকে একনাগাড়ে ভেসে আসছে শব্দটা।

দড়াম করে খুলে গেল ওর উল্টোদিকের দরজাটা, দ্রুত বেরিয়ে এসে করিডরে দাঁড়াল একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। শরীরে অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব

করল রানা। মেয়েটাকে দেখেই প্রথম যে কথাটা মনে হলো ওর—এত সুন্দরী মেয়ে এখানে কি করতে এসেছে? খুব একটা লম্বা নয়, একরাশ ঘন কালো চুল কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর পিছন ছুঁই ছুঁই করছে। পরনে শাড়ি, কিন্তু পরার স্টাইলটা দেশীয় নয়। খুব বেশি জ্বাল দেয়া ঘন দুধের মত গায়ের রঙ, স্বাস্থ্যটা ভাল, কিন্তু একতিল মেদ নেই শরীরে কোথাও। মুখের আকৃতি প্রায় গোল, নাকটা ছোট, চোখের ওপর ভুরু জোড়া যেমন লম্বা তেমনি ঘন আর কালো। সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখ দুটো। গভীর মায়াময় ঠাণ্ডা কোমল। ছোট কপালে মস্ত একটা লাল টিপ পরেছে। বাঙালী নয়, বোঝা যায় পরিষ্কার। থাই? উঁহুঁ! সিঙ্গাপুরী হতে পারে, অনুমান করল রানা। মুখের চেহারায় কোন ভাব নেই, যেন পাথরে খোদাই করা। ডাইনিং হলে একে দেখেছে বলে মনে পড়ল না রানার। কে মেয়েটা?

'কি ব্যাপার বলুন তো?' প্রথমে রানাই কথা বলল, 'আগুন লেগেছে নাকি?'

মেয়েটার সতর্ক খয়েরী চোখের দৃষ্টি রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল। একটা ধাক্কা খেল রানা। কোন মেয়ে যে এমন ঠাণ্ডা হিম চোখে তাকাতে পারে, ধারণা ছিল না ওর।

'একজন কয়েদী পালিয়েছে,' বলল মেয়েটা। সুরেলা কিন্তু বড় বেশি স্পষ্ট আর দৃঢ় লাগল কানে গলার আওয়াজটা। পাতলা ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল সে। সাবধান হয়ে গেল রানা। হাসিটার পিছনে অজানা একটা রহস্য। 'তাই অ্যালার্ম বাজছে।'

'তাই নাকি? কয়েদী পালিয়েছে? সামান্য ব্যাপার, আমার সাহায্য দরকার হবে না ওদের। ধন্যবাদ।' পিছিয়ে এসে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল রানা।

'তুমি রানা?' স্পষ্ট করে জানতে চাইল মেয়েটা। নিজের চোখের ভেতর তার দৃষ্টির খোঁচা অনুভব করছে রানা। ঠোঁটের হাসিটা দেখে মনে হচ্ছে রানাকে যেন তিন পুরুষ ধরে চেনে সে। 'তোমার কথা শুনেছি আমি।' ছোট্ট ব্লাউজটা শুধু পুরুষ্টু বুক দুটোকে কোনরকমে অর্ধেকটা ঢেকেছে, বুকের মাঝখানটা গভীর গিরিখাদের মত, সেখানে বাঁকা করা বুড়ো আঙুল দিয়ে টোকা দিল সে। 'আমি শিবানী। তোমার প্রতিবেশিনী।'

'ভাল,' দায়সারা গোছের একটা জবাব দিল রানা, এড়িয়ে যেতে চাইছে। কিভাবে যেন বুঝতে পারছে, এ মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 'পরে আবার দেখা হবে আমাদের।' বন্ধ করে দেবার জন্যে দরজার কবাটে হাত দিল ও।

'এত ব্যস্ততা কিসের?' তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম বেল-এর শব্দকে ম্লান করে দিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এলো চুলের খানিকটা কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে নিয়ে এল সে। আঙুলে চুলের ডগা জড়াচ্ছে, অলসভঙ্গিতে। তারপর দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'গান ভালবাসো?'

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল শিবানী, কিন্তু তার আগেই সিঁড়ির নিচের ল্যাণ্ডিং থেকে গর্জে উঠল একটা রিভলভার। চমকে উঠে ঝট করে তাকাল রানা। তিন লাফে

সিঁড়ির রেলিঙের সামনে গিয়ে পৌছুল ও। নিচে দেখা যাচ্ছে ফখরুলকে। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে সিঁড়ির ধাপে। মাথার ডান দিকটা বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে। এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে জল প্রপাতের মত রক্ত পড়ছে। ভারী একটা কোল্ট অটোমেটিক ধরা রয়েছে ফখরুলের হাতে।

বোরহান আর খাদেম নিচের হলঘরে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলতেই সিঁড়ির মাথায় রানাকে দেখতে পেল বোরহান। 'এখানে নেমে এসো।' চাবুকের বাতাস কাটার মত হিস হিস করে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

ইতিমধ্যে রানার পাশে শিবানীও এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পাশ কাটাল রানা। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। লাশটাকে টপকে বোরহানের সামনে এসে দাঁড়াল ও। 'আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল!' বলল রানা। ফখরুলের মৃত্যুতে মোটেও আঘাত পায়নি ও। 'এ তোমার ব্যর্থতা।'

'আমার জেরার মুখোমুখি হবার চেয়ে আত্মহত্যা করাটা ভাল মনে করে কেউ কেউ,' বলল বোরহান, প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে মুখের চেহারা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে, একটা পা পিছিয়ে আনল, লাথি মারল লাশের পাছায়।

'ওতে কোন লাভ হবে না,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আফরোজার ব্যাপারে কি করবে?'

'এই শালা তাকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করছিল,' বলল বোরহান, 'আমার হাতে ধরা পড়ে গেছে। আফরোজাকে এখানে নিয়ে আসা হবে। খাদেম যাচ্ছে...' ঝট্ করে খাদেমের দিকে ফিরল সে। 'সং সেজে দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? যাও! নঈমকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। যেতে আসতে যতটুকু সময় লাগে, তার বেশি দেরি হলে আস্ত রাখব না একজনকেও।'

'থামো,' ঘুরে দাঁড়িয়ে খাদেমকে রওনা হতে দেখে দ্রুত বলল রানা, তাকাল বোরহানের দিকে। 'মাথা ঠাণ্ডা করো। বোকার মত কাজ করলে আমরা সবাই ডুবব। আফরোজার ফ্ল্যাটে গিয়ে খাদেম তাকে নিয়ে আসবে, এটা তুমি ভাবতে পারলে কিভাবে? বিপদের কথা বাদ দাও, অসুবিধের কথাগুলো অন্তত ভেবে দেখা উচিত তোমার। খাদেমকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, বাড়ির লে-আউট জানা আছে তার। টপ-ফ্লোরে থাকে আফরোজা। কে নক করছে তা না জেনে দরজা খুলবে না সে। লেটার-বক্সের ফাটল দিয়ে বাইরেটা দেখা যায় পরিষ্কার। খাদেমকে দেখলে দরজা খুলবে, মনে হয়? চিৎকার করে লোক জড়ো করে ফেলবে। উঁহুঁ, এভাবে হবে না। কোনরকম গোলমাল না করে আনতে হবে তাকে। তা আনতে হলে আমাকে পাঠাতে হবে তোমার।'

কয়েক সেকেণ্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর কি মনে করে কাঁধ ঝাঁকাল সে, খাদেমের দিকে ফিরল। 'ঠিক বলেছে রানা।' রানার দিকে ফিরল আবার। 'বেশ, তুমিই সামলাও ব্যাপারটা।' আবার খাদেমের দিকে তাকাল। 'রানার সাথে যাও তুমি। ও যদি কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করে, গুলি করে মারবে। এটা আমার অর্ডার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল খাদেমের তামাটে মুখ। 'সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাব আমি,'

গম্ভীর, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সে।

'গোলাগুলি হবে না,' বলল রানা। 'কিন্তু এক শর্তে যাব আমি—গোটা ব্যাপারটা আমি সামলাব।'

'মেনে নেয়া গেল,' বলল বোরহান। 'খাদেম, কোন কুমতলব নেই বুঝতে পারলে ও যা বলবে তাই করবে তুমি। বুঝতে পারছ?' ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করে খাদেম জানাল, ঠিক আছে।

'ভ্যান নিয়ে যাচ্ছ তোমরা,' বলে চলেছে বোরহান, 'তোমার সাথে পিছনে বসবে রানা। গাড়ি চালাবে নঈম।'

আবার একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল খাদেম। হলঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'এটা পরে বাইরে বেরুনো কি উচিত হবে?' হাত-পাখা দিয়ে নিজের গায়ে বাতাস করার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সাদা স্যুটটা দেখাল রানা। 'তোমার কোন আপত্তি না থাকলে কাপড়টা বদলে আসি।'

'যাও,' বলল বোরহান। 'আর শোনো, কোনরকম ভুল যেন না হয়। মেয়েটাকে আমার চাই।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল রানা। করিডরে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে শিবানী। রানা ঘরে ঢুকতে, তার পিছু পিছু এসে দরজার সামনে দাঁড়াল সে। 'তুমি একজন নতুন সদস্য। তোমাকে এখনও কেউ বিশ্বাস করে না,' স্পষ্ট গলায়, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার ফাঁকে একটু ক্ষীণ বিরতি নিয়ে বলল। 'সে বিচারে খুব ভালই দেখাচ্ছ তুমি।' মুক্তোর মত ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে তার। 'তুমিই বোধ হয় ফখরুলকে ধরিয়ে দিয়েছ?'

তীব্র দৃষ্টি হানল রানা। 'ফখরুল নিজেই ধরা পড়েছে,' কঠিন সুরে বলল ও। শিবানীর মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

সাদা ট্রপিক্যাল স্যুট খুলে নিজের পোশাক পরে নিতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না রানার। একটা রিভলভার থাকলে ভাল হত। ভাবল ও। খাদেম আর নঈম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। আচ্ছা, আফরোজা এখন বাড়িতে আছে তো? রিস্টওয়াচ দেখল ও। ছয়টা বাজে। গিয়ে হয়তো পাওয়া যাবে না ওকে।

কামরা থেকে বেরিয়ে দেখল এখনও করিডরে দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। ঠাণ্ডা কোমল মায়াময় চোখে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে। 'অনেকদিন হলো গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমি,' গলাটা খাদে নামিয়ে বলল। 'বলতে পারব না কেন, তোমাকে দেখেই আবার আমার গাইতে ইচ্ছে করছে। সময় করে একদিন শুনবে নাকি?'

থামল না রানা, বলল, 'দেখা যাবে, যদি কখনও সময় হয়।' সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এল ও। মেয়েটার রূপের আকর্ষণ প্রচণ্ড, এড়িয়ে যাওয়া কঠিন, কিন্তু রানার অন্তর্ভেদী চোখে ধরা পড়েছে মেয়েটার মধ্যে বিপজ্জনক কি যেন আছে, ওর সাথে জড়িয়ে পড়া মানে আগুন নিয়ে খেলা করা।

সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো থেকে ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফখরুলের লাশ।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে দু'জন লোক ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে ধুচ্ছে সিঁড়ির ধাপগুলো, মেঝের কার্পেট থেকে মুছে ফেলছে রক্তের দাগ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বোরহান, কপালে চিন্তার রেখা।

'ভ্যান রেডি,' রানাকে বলল সে। 'কোনরকম চালাকি করো না।'

'ফ্ল্যাটে থাকলে ওকে আমি ঠিকই নিয়ে আসব,' বলল রানা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে খাদেম ওর নঈম, তাদের দিকে এগোল ও।

ভ্যানের পিছনে রানার সাথে চড়ল খাদেম। ড্রাইভ করছে নঈম।

অন্ধকার মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। 'মন দিয়ে শোনো,' বলল ও। 'কিভাবে কি করতে হবে বলছি। তুমি আর নঈম ভ্যানের ভেতর অপেক্ষা করবে। মেয়েটার ফ্ল্যাটে একা যাব আমি। ফ্ল্যাটে তাকে নাও পাওয়া যেতে পারে। যদি পাওয়া যায়, তাকে আমি বলব, ফখরুল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, আমি তাকে নিতে এসেছি। আমাকে চেনে ও, বিশ্বাস করে। কোন অসুবিধে হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তোমাদের চেহারা যেন কোনমতেই দেখতে না পায়। দেখতে পেলে ঘর থেকে বের করা যাবে না। বাইরে বের করে এনে তাকে আমি ভ্যানের দিকে ঠেলে দেব, তখন তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার। তোমরা তাকে ধরে তুলে নেবে ভ্যানের ভেতর। দেরি করা চলবে না, সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে নঈমকে। দরকার হলে মেয়েটার মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে রাখব। ওকে নিয়ে নেমে আসার পর রাস্তায় যদি লোকজন দেখি, ভ্যানের দিকে না গিয়ে মোড়ের দিকে যাব আমরা, নঈম যেন স্লো স্পীডে আমাদের পিছু পিছু আসতে থাকে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেলেই তাকে আমি ভ্যানের দিকে ঠেলে দেব, তারপর তোমার কাজ তুমি করবে। বুঝেছ সব?'

ঘড়ঘড় আওয়াজ করে খাদেম জানাল, বুঝেছে।

সারাটা পথ আর কোন কথা হলো না। একটানা তুমুল গতিতে প্রায় পৌনে একঘণ্টা গাড়ি ছোটার পর ড্রাইভিং সীটের পিছনের ফোকরে চোখ রেখে নঈম জানাল, 'মোহাম্মদপুরে চলে এসেছি। তাজমহল রোডে ঢুকছে ভ্যান।'

'স্কুলের শেষ মাথায় দাঁড় করাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'আমি আর খাদেম পায়ে হেঁটে ফ্ল্যাটবাড়ি পর্যন্ত যাব। আমাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেখার তিন মিনিট পর ধীরে ধীরে ভ্যান চালিয়ে এগোবে তুমি···ঘড়ি দেখে নিয়ো···বাড়িটার সামনে থামাবে ভ্যান। সাথে সাথে খাদেম উঠে পড়বে ওপরে, তোমরা দু'জনেই গা ঢাকা দিয়ে থাকবে যতক্ষণ না মেয়েটাকে নিয়ে ফিরি আমি।'

'তুমি কি বলো, খাদেম?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল নঈম।

'ঠিকই আছে। ব্যাপারটা ওকেই সামলাতে দেয়া হয়েছে। বস বলে দিয়েছেন, ওর কথায় চলতে হবে আমাদেরকে।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস চাপল রানা। খাদেম ভ্যানের ভেতর থাকবে এটুকু নিশ্চিতভাবে জানতে পারলে অর্ধেকের বেশি সমস্যা দূর হয়ে যায় ওর।

ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যান। দরজা খুলে ফেলল খাদেম। বিড়ালের মত লাফ দিয়ে একযোগে নামল ওরা প্রায় অন্ধকার, ভিজে রাস্তার ওপর। ঝমঝম করে

বৃষ্টি পড়ছে।

'কি করতে হবে মনে আছে তো?'

'আছে,' কর্কশ গলায় বলল খাদেম। 'যা করার তাড়াতাড়ি করো, ভিজে যাচ্ছি আমি।'

নির্জন রাস্তা ধরে এগোল ওরা। ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখা যাচ্ছে সামনে। সদর দরজা খোলা, ভেতরে আলো।

'এখানে অপেক্ষা করো তুমি,' বলল রানা। 'নঈম এলে গাড়িতে উঠে গা ঢাকা দিয়ো। ঠিক আছে?'

'মেয়েটা বাড়িতে আছে কিনা জানছ কিভাবে তুমি?' দু'চোখে সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল খাদেম।

'জানি না। না থাকলে সোজা ফিরে আসব।'

'দশ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে। তারপর সোজা ওপরে উঠব আমি,' ধীরে ধীরে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরল খাদেম। 'কোন রকম চালাকি নয়। বস কি বলেছে মনে আছে তো?'

হাসল রানা। 'চুপ থাকো। এই এক কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সব কাজ বড় বেশি সিরিয়াসলি নাও তুমি।'

সদর দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিল রানা, ধাপ ক'টা টপকে প্রথম বাঁকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, এখানে ওকে দেখতে পাচ্ছে না খাদেম। পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বল পয়েন্ট পেন দিয়ে খস খস করে কর্নেল শফির ঠিকানা লিখল তাতে। এনভেলাপটা হাতে নিয়ে একসাথে তিনটে করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল আবার।

টপ ফ্লোরে উঠে সবুজ রঙ করা দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। হাত তুলে চেপে ধরল কলিংবেলের বোতামটা।

রিস্টওয়াচের ওপর চোখ রেখে অপেক্ষা করছে ও। এখন থেকে সাড়ে সাত মিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে শুরু করবে খাদেম। আফরোজা কি বাড়িতে নেই? না থাকলে ডুববে সে। কারণ খাদেম জেদ ধরবে আফরোজা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আফরোজাকে সাবধান করে দেবার কোন সুযোগই পাবে না সে।

হঠাৎ খুলে গেল দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে আফরোজা। 'রানা তুমি?'

আবছাভাবে লক্ষ করল রানা, লাল সিল্কের সালোয়ার আর একই রঙের খাটো কামিজ পরে আছে আফরোজা। ছোট সুন্দর মুখে মেকআপ নেই, রানাকে দেখেই বিস্মিত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল রানা। শক্ত করে ধরে রাখল।

'কথা নয়—শোনো!' জরুরী ভঙ্গিতে ফিস ফিস করে বলল রানা। 'সাংঘাতিক বিপদে পড়ে গেছ তুমি। একটু ভুল করলে মারা পড়বে। তোমার ভাই যাদের হয়ে কাজ করে তাদের নজর পড়েছে তোমার ওপর। ওদের সংগঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জানো তুমি, সেটা ওদের নিরাপত্তার জন্যে একটা ঝুঁকি বলে মনে করছে ওরা।

দু'জন গুণ্ডাকে দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি ওদেরকে ডাবল-ক্রস করছি।' আফরোজার হাতটা জোরে একবার ঝাঁকাল ও। 'মন দাও। বাঁচার একমাত্র পথ বলে দিচ্ছি তোমাকে। ভুল করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা একমাত্র কর্নেল শফি করতে পারেন। তার কাছে যাবে তুমি, যা জানো সব তাঁকে খুলে বলবে। স-ব, কিছুই গোপন করবে না। এই নাও, এটা রাখো।' হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাতে এনভেলাপটা গুঁজে দিল রানা। 'কর্নেল শফির ঠিকানা এটা। ভয় পেয়ো না। আমার লোক তিনি। আমার কথা বললেই তোমার নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো তাঁকে। তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই তোমার সামনে। এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবে তুমি, আর ধরা পড়লে শুধু মরতে হবে তাই নয়, কষ্ট পেয়ে মরতে হবে। আমার সব কথা বুঝতে পেরেছ?'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে আফরোজা। 'কিন্তু রানা! ফখরুল কোথায়? কি হয়েছে তার? আমি তো এসবের কোন মানেই বুঝতে পারছি না…'

'মানে বোঝার দরকার নেই তোমার,' দ্রুত বলল রানা। 'এখন শুধু বাঁচতে চেষ্টা করো। নিচে অপেক্ষা করছে ওরা। কর্নেলের কাছে যাও! এবার শোনো, একটু অভিনয় করো। গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে দরজা বন্ধ করো তুমি। তারপর অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে পুলিসের ফোন নম্বর জেনে নাও, ওদেরকে জানাও তিনজন লোক জোর করে তোমার ফ্ল্যাটে ঢোকার চেষ্টা করছে। চিৎকার করতে শুরু করো। যাও! শুরু করো! এখুনি! সময় নেই! একটা সেকেণ্ড সময় নেই!'

চিৎকার শুরু করল আফরোজা।

মুহূর্তের জন্যে ভুল বুঝল রানা, মনে করল লোক জড়ো করে ওকেই বিপদে ফেলতে চাইছে আফরোজা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্য করে আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা।

সিঁড়ির মাথা থেকে পাঁচ ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে আছে খাদেম, তাকিয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে। হাতে একটা মাউজার পিস্তল। রানার পেটের দিকে তাক করা। রাবারের মত নিষ্প্রাণ ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে ভেতরে। 'কুত্তার বাচ্চা, এই নে, খতম কর খেলা!' ট্রিগারে চাপ দিল খাদেম।

খাদেমকে দেখেই বাঁ হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে আফরোজাকে হলের ভেতর ফেলে দিল রানা, নিজের শরীরের ঝাঁকিটাকে কাজে লাগিয়ে একপাশে স্যাঁত্ করে সরে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালে, সেখান থেকে আরেক ঝাঁকিতে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়েই ডাইভ দিল খাদেমের দিকে।

গুলির আওয়াজ শুনল ও। তীব্র জ্বালা শুরু হলো ডান হাতের কব্জিতে। আবার গুলি করল খাদেম, একই সময়ে তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল রানা। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওপর দিকে উঠে গেল। ঝুর ঝুর করে চুন বালি খসে পড়ল সিলিং থেকে।

খাদেমকে নিয়ে ল্যাণ্ডিঙের দেয়ালে পড়ল রানা। মোটা গলাটা ছাড়েনি ও। দেয়াল থেকে ল্যাণ্ডিঙের মেঝেতে পড়ল দু'জন। ধস্তাধস্তি করছে। ল্যাণ্ডিং থেকে গড়িয়ে নিচের ধাপটায় নেমে এল শরীর দুটো। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে। গড়াতে গড়াতে নামছে নিচের দিকে।

গলাটা ছাড়েনি রানা। শক্ত মাংসে দেবে বসছে আঙুলগুলো, বুড়ো আঙুল দুটো অর্ধেকের বেশি ঢুকে গেছে। প্রতিমুহূর্তে চাপ আরও বাড়াচ্ছে ও, জানে মরতে হবে খাদেমকে। বেঁচে থাকলে কথা বলবে, সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে তার।

হাত আর পা দিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করছে খাদেম। থাবা মেরে রানার চোখ দুটো উপড়ে আনার ইচ্ছে। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, রানার ওপর চড়ার সুযোগ পেলেই সিঁড়ির ধাপের সাথে ওর মাথাটা ঠুকে দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে। ভারী জুতো পরা পা দুটো দমাদম বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালের গায়ে। গলা ধরে কোনরকমে ঝুলে থাকল রানা, তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল মুখে আর গরম নিঃশ্বাসের আঁচ লাগছে না। একটু ঢিল দিয়ে গলাটাকে আরও ভাল করে ধরল ও, বুড়ো আঙুলের নিচে হাড়ের স্পর্শ পেল, পেয়ে চাপ বাড়াতে শুরু করল আবার। মট্ করে গলার অনেক ভেতর কি যেন ভেঙে গেল, সাথে সাথে অসাড় হয়ে গেল খাদেম।

হাঁপাচ্ছে রানা, শ্রান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মাঝপথে থেমে ঝুঁকে পড়ল। খাদেমের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল মাউজার। সেটা পকেটে ভরার সময় মুখ তুলে তাকাল ও। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আফরোজা।

'কর্নেলের কাছে যাও,' দ্রুত বাতাস গেলার ফাঁকে বলল রানা। 'বুঝতে পারছ আমি কি বলছি? কর্নেল শফির কাছে গিয়ে সব কথা বলো।' কথা শেষ করে চরকির মত আধপাক ঘুরেই দুদ্দাড় বেগে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ও। যে-কোন মুহূর্তে উঠে আসতে পারে নঈম, গুলির আওয়াজে বেরিয়ে আসতে পারে ফ্ল্যাটের লোকজন। ফোন করার বুদ্ধি নিশ্চয়ই কারও হয়েছে, পুলিসও বোধহয় রওনা হয়ে গেছে, তারা এসে পৌঁছুবার আগেই চম্পট দিতে চায় ও। ধরা পড়লে স্টেশনে ফেরা হবে না। কিন্তু ফিরতে ওকে হবেই।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নামতেই মুখোমুখি হলো নঈমের। হাতে পিস্তল নিয়ে ঝড়ের বেগে সিঁড়ির দিকে ছুটে আসছিল, ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল রানার সামনে।

'মরতে চাও? ইডিয়েট!' প্রচণ্ড রাগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'ভ্যান ছেড়ে কে আসতে বলেছে তোমাকে? ফিরে চলো! কুইক! পুলিসে খবর দিয়েছে মেয়েটা!'

'খাদেম কোথায়?' জানতে চাইল নঈম। হিংস্র চোখে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। পিস্তল তাক করে কাভার দিচ্ছে রানাকে।

'মেরে ফেলেছে আফরোজা। তুমি থাকো! আমি পালাচ্ছি! পুলিস! পুলিস আসছে!'

'মেরে ফেলেছে?' রানার মুখে কি যেন খুঁজছে নঈম। 'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। পালাবে? নাকি ধরা পড়তে চাও?' নঈমের দিকে না তাকিয়ে ছুটল রানা, নঈমকে একরকম ধাক্কা দিয়ে পেরিয়ে গেল দরজাটা। বাইরে বেরিয়ে নাক বরাবর ছুটছে। তার এই ব্যস্ততা সংক্রামিত হলো নঈমের মধ্যে, সে-ও অনুসরণ করছে তাকে। লাফ দিয়ে ভ্যানে উঠে বসল সে। নঈমও তাই করল। সাথে সাথে স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

'মারা গেছে?' গাড়ি চালাচ্ছে নঈম, হাঁপাচ্ছে সে। 'বিশ্বাস করতে পারছি না!' ঝড়ের গতিতে ছুটছে ভ্যান, সামনে বাঁক, কিন্তু গতি কমাল না সে।

'মাথায় গুলি করেছে আফরোজা। কুত্তীটা কোন সুযোগই দেয়নি খাদেমকে। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ ওই হারামজাদার। ঠিক যখন আমার সাথে আসার জন্যে রাজী হয়েছে মেয়েটা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সে। তাও খালি হাতে নয়। হাতে পিস্তল নিয়ে। দরজা খোলার আগে থেকেই একটা হাত পিছন দিকে লুকিয়ে রেখেছিল আফরোজা। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি ওর হাতে পিস্তল আছে। খাদেমকে দেখেই ব্যাপারটা টের পেয়ে যায় সে, সাথে সাথে গুলি করে। ধরে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু তাকে ছোঁবার আগেই আবার গুলি করে সে। আমার ডান হাতে লাগে সেটা। কি করব আমি? দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করছে, আমি পালিয়ে এসেছি।'

'...মারানী, ...মাগী, হারামজাদী...' অশ্রাব্য গালিগালাজ বেরিয়ে আসছে নঈমের মুখ থেকে।

'সব গালি শেষ করে ফেলো না, কিছু খাদেমের জন্যেও রাখো!' দাঁতে দাঁত চাপল রানা। 'নিজের মরণ নিজে ডেকে আনল শালা। চেহারা দেখাবার জন্যে একেবারে ছটফট করছিল। তুমিও কম দায়ী নও!' ঝট করে নঈমের দিকে ফিরল ও। 'তুমি ওকে ছাড়লে কেন?'

'আমি ভাবলাম বৃষ্টির জন্যে নিচের তলায় অপেক্ষা করতে যাচ্ছে ও।' গম্ভীরভাবে বলল নঈম।

'আমি কি সেই নির্দেশ দিয়েছিলাম? বলিনি ভ্যানের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে?'

'তুমি কি বলেছিলে তাতে আমি পেচ্ছাব করি!' খেঁকিয়ে উঠল নঈম।

'বেশ। দেখা যাক, কথাটা শুনে বোরহান কি বলে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'এখনই সবটুকু পেচ্ছাব করে ফেলো না, বোরহানের সামনে দরকার পড়বে। যাই হোক, দয়া করে স্পীড এবার কমাও। পুলিস আমাদেরকে খুঁজছে। এত জোরে ভ্যান ছুটতে দেখলে তাড়া করবে। আর তাড়া করলে নির্ঘাত ধরা পড়ব।'

ভ্যানের গতি কমিয়ে আনল নঈম। সোজা ছুটছে ভ্যান। শহর ছেড়ে এসেছে ওরা। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে স্থির হয়ে আছে কাঁটা। ফাঁকা রাস্তা। টঙ্গী খুব বেশি দূরে নয় আর। মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাতে পারছে না নঈম। উসখুস করছে সে, মুখের চেহারা বারবার বদলে যাচ্ছে, আড়চোখে তাকাচ্ছে রানার দিকে।

'মরেই যখন গেছে, ওর কথা ভেবে দুঃখ করে এখন আর লাভ নেই। দোষটা

ওর, আমার নয়। আমি ওকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথায় কান দেয়নি।'

'যা হবার হয়েছে, ভুলে যাও। তোমাকে যা করতে বলা হয়েছিল তুমি তা করেছ। ব্যস, তোমার ব্যাপারটা চুকে গেল। খাদেমের দোষে তোমাকে যাতে ভুগতে না হয় সে আমি দেখব।' ভ্যানের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে পিছনটা দেখল রানা। অনুসরণ করছে না কেউ। গুলির সাথে ভ্যানটার কোন সম্পর্ক আছে তা বোধহয় লক্ষ্য করেনি কেউ। আফরোজা কি কর্নেলের কাছে যাবে? হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে আফরোজাকে কিছু বলার সুযোগ পাওয়া যায়নি বলে খেদ অনুভব করছে ও। হঠাৎ ব্রেক কষে ভ্যান দাঁড় করিয়ে ফেলল নঈম।

'কি হলো?' জানতে চাইল রানা।

'ভ্যানের পিছনে গিয়ে বসো তুমি,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল নঈম। 'বস বলে দিয়েছেন, আমাদের স্টেশনের লোকেশন তোমাকে জানানো চলবে না।'

তর্ক করার ঝুঁকিটা নিল না রানা। হেডকোয়ার্টারটা কোথায় জানার জন্যে অদম্য কৌতূহল বোধ করছে ও। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে তা জানার চেষ্টা করলে ফলটা শুভ হবে না। নিঃশব্দে ভ্যান থেকে নেমে পিছন দিকে চলে এল ও। ওর সাথে সাথে নঈমও এল। পিছন দিক থেকে ভ্যানে চড়ল রানা, বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাতে তালা মেরে দিল নঈম।

গুলিটা কব্জির কিছুটা চামড়া তুলে নিয়ে গেছে, রুমাল দিয়ে জায়গাটা বাঁধল রানা। অন্ধকারে বসে গাড়ির গতিপথ টের পাবার চেষ্টা করছে ও।

ভ্যানের পিছনে ওঠার পর দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে মাত্র একবার বাঁক নিয়েছে নঈম। রানা আন্দাজ করল, পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটছে ওরা। তারপর হঠাৎ বিরাট একটা বাঁক নিল আবার। কেমন যেন সন্দেহ হলো রানার, ওকে ভুল ধারণা দেবার জন্যে রাস্তার ওপর শুধু শুধু গাড়ি ঘোরাচ্ছে না তো নঈম। হতে পারে। এখন আবার সোজা পথে এগোচ্ছে ভ্যান। তারপর আরেকবার বাঁক নিল। এবার ডান দিকে। এরপর মাইল খানেক এগোবার পর ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে এল ভ্যানের গতি। মোটামুটি পরিষ্কার একটা হিসাব করে নিয়েছে রানা। ভ্যানটা দাঁড়াবার পর হিসাবটা আরেকবার স্মরণ করল ও। যোগাযোগ করা সম্ভব হলে কর্নেলকে হিসাবটা জানাতে হবে। মোট কতবার বাঁক নিয়েছে ভ্যান, গড়পড়তায় কত মাইল গতিতে চলেছে, সব মনে আছে ওর।

দরজা খুলে দিল নঈম। লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা। তারপর নঈমকে অনুসরণ করে উঠন পেরিয়ে করিডরে উঠল, সেখান থেকে হলঘরে। একটা মেয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস পানি খেলো নঈম, তারপর রানার পিছু পিছু চলল বোরহানের অফিস কামরার দিকে।

ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে বোরহান। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সে। চেহারাটা কঠিন আর থমথমে। 'মেয়েটা কোথায়?' রানাকে কামরায় ঢুকতে দেখেই পায়চারি থামিয়ে হুংকার ছাড়ল সে।

'তোমার লোকেরা বাধ্য নয়, নির্দেশ মানতে চায় না,' তীব্র অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'খাদেমকে আমার সাথে পাঠানো উচিত হয়নি তোমার। ঠিক যা

করতে বারণ করেছি আমি, তাই করেছে। ফলে মেয়েটাকে আনতে পারিনি আমি।'

'কি ঘটেছে?'

'গা ঢাকা দিয়ে ভ্যানের ভেতর লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম খাদেমকে। টপ ফ্লোরে উঠে আফরোজার কলিংবেল বাজাই আমি। কিছু জিজ্ঞেস না করেই দরজা খুলে দেয় আফরোজা। কিন্তু একটা হাত পিছনে লুকিয়ে রাখে সে। ব্যাপারটা লক্ষ করি, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিইনি। তাকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বললাম, তোমার ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, আমার সাথে এখুনি তোমাকে যেতে হবে। সালোয়ার কামিজ পরে ছিল ও, বলল, দাঁড়াও, কাপড়টা পাল্টে নিই। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় আঁতকে উঠল ও, চিৎকার করতে শুরু করল। পিছন ফিরে দেখি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে খাদেম। গুলির শব্দ পেলাম। প্রথমে খাদেমকে গুলি করল আফরোজা, তারপর আমাকে। ফুটো হয়ে গেছে খাদেমের মাথা, কিন্তু ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি আমি।' রক্তাক্ত রুমালটা দেখাল ও, 'আমার হাতে লেগেছে বুলেট। আফরোজাকে ধরে ফেলার আগেই দরজা বন্ধ করে দেয় সে। বাঁচাও, বাঁচাও, পুলিস, পুলিস করে চেঁচাচ্ছে, এই সময় সিঁড়িতে এসে খাদেমকে পরীক্ষা করি আমি। মারা গেছে বুঝতে পেরে একছুটে নেমে আসি নিচে। ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল নঈম, তাকে নিয়ে সোজা এখানে আসছি।' একটু দম নিল রানা, তারপর আবার বলল, 'আমাদেরকে কেউ ফলো করেনি।'

ভয়ঙ্কর রাগে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে বোরহানের। ঠকঠক করে কাঁপছে সে। বিদ্যুৎ গতিতে নঈমের দিকে ফিরল। 'এসব সত্যি?'

'হ্যাঁ,' বলল নঈম। 'আমরা ভ্যানে ছিলাম, খাদেম বলল বাড়িটার নিচের তলায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে অপেক্ষা করবে সে। আমি নিষেধ করলাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলল না। ও চলে যাবার পর ভ্যানের ভেতর বসে অপেক্ষা করতে থাকি আমি। একটার পর একটা, দুটো গুলির শব্দ শুনতে পাই। ভ্যান থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকেছি, এই সময় ছুটে নেমে আসে রানা। ওর হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। নষ্ট করার মত সময় ছিল না, তাই সাথে সাথে ভ্যান নিয়ে চলে আসি আমরা।'

গনগনে আগুনের মত জ্বলছে বোরহানের চোখ দুটো। রানার দিকে তাকিয়ে তিন সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর চোখ কুঁচকে ঘৃণার সাথে বলল, 'প্রথম অ্যাসাইনমেন্টই ব্যর্থ, মরে যাওয়া উচিত!' হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেছে তার।

'তোমার মরে যাওয়া উচিত!' দৃঢ় প্রতিবাদের সুরে বলল রানা। 'তোমার লোক তোমার নির্দেশ অমান্য করে, সেটাই আমার ব্যর্থতার কারণ। আমি যদি একা যেতাম ওখানে, মেয়েটাকে এখন এই ঘরে দেখতে পেতে তুমি।'

'তুমি যাও,' নঈমকে বলল বোরহান। মুখটা ছোট হয়ে গেল নঈমের। দ্রুত বেরিয়ে গেল সে কামরা ছেড়ে। রানার দিকে ফিরল বোরহান। 'ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে তোমার?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'না। নঈম আমার কথা শুনেছে। খাদেম

শোনেনি।'

ডেস্কের পিছনের রিভলভিং চেয়ারটায় বসল বোরহান। একটা চুরুট ধরাল সে। 'একটা কাজও যদি ভালভাবে সারা যায়! এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে!' হঠাৎ নরম শোনাচ্ছে তার গলার আওয়াজ। 'কোথায় গেল মেয়েটা, কি হলো, খোঁজ-খবর সবই পাব আমি। তোমরা পৌঁছুবার আগেই ওর ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখার জন্যে লোক রেখেছিলাম। যেভাবে হোক আফরোজাকে এখানে চাই আমি।'

'তুমি কি আমার কাছ থেকে লিখিত রিপোর্ট চাও?'

'না।' মুখ তুলে তাকাল বোরহান। 'আমাদের এই সংগঠনে ব্যর্থতা সাংঘাতিক একটা অপরাধ। যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। বুঝতে পারছ তো, তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি না আমি। দোষ যা করার খাদেম করেছে। তদন্ত করে দেখছি আমি। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তোমার, যাও, ডিনার খেয়ে নাও গে।'

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা, পিছন থেকে বোরহান বলল, 'এব্যাপারে কাউকে কিছু বলো না। ড. সমুদ্র গুপ্ত যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবে, আমার কাছে রিপোর্ট করেছ তুমি। খাদেমের অবাধ্যতা প্রচার করব না আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা, দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। রহস্যটা বুঝতে পারছে ও। খাদেম বোরহানের লোক ছিল। খাদেম হুকুম অমান্য করেছে। এর দায়িত্বটা বোরহানের ঘাড়ে চাপছে। কিন্তু দায়িত্বটা ঘাড়ে নিতে রাজী নয় সে। ডাইনিং হলে যাবার পথে আপন মনে একটু হাসল রানা। বোরহানের দুর্বলতাগুলো একটা দুটো করে জানা হয়ে যাচ্ছে ওর। এগুলো কাজে লাগবে।

না, মোটামুটি ভালই এগোচ্ছে কাজ।

চার

ডাইনিং হলটা প্রায় খালি দেখল রানা। একটা টেবিল চারজন বিদেশী দখল করে বসে আছে, পরনে সাদা উর্দি, বয়স পঞ্চাশের ওপর। এরা বোধ হয় ফার্মে কাজ করে। আরেকটা টেবিলে একটা মেয়ে আর দুটো লোক বসেছে। রানা ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল ওরা। একজন লোক কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে পাশে বসা সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার দিকে। কফি খাচ্ছে, সিগারেট ফুঁকছে, অলসভঙ্গিতে গল্পগুজব করছে সবাই।

দেয়াল ঘেঁষা একটা টেবিলে বসল রানা। কামরার সবটুকু দেখা যায় এখান থেকে। ডিনার প্রায় শেষ করে ফেলেছে ও, এই সময় দেখতে পেল শিবানীকে। সরাসরি ডাইনিং হলে ঢুকল না সে, দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ, সজাগ দৃষ্টি চোখে, কামরার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে রানার,

মুখ তুলে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। আজও শাড়ি পরেছে শিবানী, সিঙ্গাপুরী জর্জেট, দুই বুকের মাঝখান দিয়ে পাকানো ফিতের মত উঠে গেছে সেটা, ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ারের নামমাত্র আবরণ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পীনোদ্ধত পয়োধর। অথচ তার যৌবন নয়, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে রানার। বিশ-পঁচিশ হাত দূর থেকে দেখছে ও, কিন্তু পরিষ্কার টের পাচ্ছে যে-কোন শক্তিশালী পুরুষের সমান বলিষ্ঠতা রয়েছে তার মধ্যে। সার্কাসের মেয়েদের মধ্যে কোমলতার অভাব দেখা যায়, কিন্তু শিবানীর মধ্যে যৌবন আর কোমলতার অঢেল প্রাচুর্য। চেহারাটা আগুনের মত, তবু একবার তাকালেই মনে হয়, এ সার্কাসের মেয়ে। ঢোক গিলল রানা। উঁহুঁ, একে সামাল দেয়া তার কর্ম নয় । মেয়েটার দু'চোখে কামনার আকণ্ঠ পিপাসা, স্পষ্ট বুঝল রানা— ইনস্যাশিয়েবল।

রানার সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল শিবানী। হাসিটা এত সুন্দর, বোকা হয়ে গেল রানা মুহূর্তের জন্যে। ওর টেবিলের সামনে এসে থামল সে। 'হ্যালো,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরটা মনোযোগ কেড়ে নিল রানার। স্পষ্ট, পরিস্কার, সুরেলা কিন্তু কোনরকম ঝংকার নেই গলায় । 'তোমার সাথে বসলে কিছু মনে করবে?'

হঠাৎ আবিস্কার করল রানা, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে ও। শিবানীকে দেখে এর আগেও পেশীতে টান অনুভব করেছে ও। নিজেকে ধমক লাগাল । একটা মেয়ে বৈ তো নয়, তাকে এত ভয় পাবার কি আছে! খেয়ে তো আর ফেলবে না! শিবানীর চোখে চোখ রেখে হাসল ও। 'বসো, আমার হয়ে এসেছে।'

'আমি তো সেই সন্ধে হতে না হতেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছি,' রানার সামনে একটা চেয়ারে বসল শিবানী। হাসছে। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিকমিক করছে দাঁতগুলো। 'হাতে কোন কাজ নেই, তাই সঙ্গ শিকার করতে বেরিয়েছি । তোমার সঙ্গ আমার বোধহয় ভালই লাগবে।'

ডাইনিং হলের চারদিকে তাকাল রানা। অবাক হয়ে গেল ও। ব্যাপারটা কি? এদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সবাই, দু'একজন উঠে চলে যাচ্ছে বাইরে। ভুলেও কেউ তাকাচ্ছে না শিবানীর দিকে। সবাই ওকে এড়িয়ে চলে? কারণ? পরমুহূর্তে নিজের কথা ভাবল। সে নিজেই বা কেন এড়িয়ে চলতে চাইছে শিবানীকে?

'হয়তো,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগবে কিনা, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়।' সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে এভাবে কেউ কথা বলে না, কিন্তু রানা উপলব্ধি করতে পারছে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে তাকে, প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুললে স্রেফ নিজের কবর খোঁড়া হবে সেটা।

ন্যাপকিনে হাত মুছে কফির কাপে চুমুক দিল রানা। কথা বলার পর প্রায় মিনিট খানেক পেরিয়ে গেছে, শিবানীর দিকে তাকায়নি আর। শিবানীও মুখ খোলেনি। উত্তরটা খুব কড়া হয়ে গেছে নাকি? অপমান বোধ করছে মেয়েটা ? কফির কাপ নামিয়ে রেখে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। তারপর তাকাল শিবানীর দিকে। টেবিলের ওপর কনুই, হাতের তালুতে চিবুক রেখে একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে শিবানী। কৌতুক আর কৌতূহল মেশানো অদ্ভুত একটা দৃষ্টি তার চোখে।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করছে রানা. পরিচ্ছন্ন, ফর্সা. গোল দুটো হাত টেবিলের ওপর লম্বা করে দিল শিবানী। একটা হাতের পাঁচটা আঙুল সাপের ফণার আকৃতি নিয়ে উঠে এল রানার মুখের কাছে। ওর ঠোঁট থেকে আলগোছে টেনে নামিয়ে নিল ফিলটার টিপ্‌ড সিগারেটটা । 'আমি তোমার সে-রকম মেহমান নই,' মুখ টিপে একটু হাসল শিবানী। 'কেউ যদি সাধতে ভুল করে, লজ্জায় চুপ করে থেকে ঠকতে রাজী নই।' টেবিল থেকে লাইটারটা তুলে নিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাল সে। আরেকটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে তুলেছে রানা, সেটাতেও আগুন ধরিয়ে দিল। 'তুমি এখানে আসার আগেই তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি, রানা। ডিউক ! ডিউক নাকি সেরা রংবাজ ! মাস্তানদের মাস্তান! একশো একটা খুন করেছে! সে আসছে শুনলেই মেয়েরা বেহুঁশ হয়ে যায়—ভয়ে! আরও কত কি! সব সত্যি, নাকি বেশির ভাগই বানোয়াট?'

'তোমার কি মনে হয়?' চেয়ারে হেলান দিল রানা। হাসির ভাবটুকু পর্যন্ত আনছে না চেহারায়।

'পরীক্ষা না করে কিছু মনে করি না আমি,' হালকাভাবে সিগারেটে টান দিল শিবানী। 'তোমাকে আমি যাচাই করতে চাই। এরই মধ্যে বোরহানকে জিজ্ঞেস করেছি তোমার সাথে কাজ করতে দেবে কিনা আমাকে। বলেছে, তার কোন আপত্তি নেই। কি মনে হচ্ছে তোমার? খুশি লাগছে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল রানা, 'খুশি হবার কারণ আছে? এখানে তোমার ভূমিকা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?'

ভুরু নাচিয়ে এমন একটা মুখভঙ্গি করল শিবানী, গা শির শির করে উঠল রানার। দু'চোখে নগ্ন আমন্ত্রণ, ঠোঁট সামান্য একটু ফাঁক করে হাসছে। 'আমার কথা শোনোনি তুমি? আমি একাই একশো, এ-কথা এখনও কেউ জানায়নি তোমাকে?'

'তাই নাকি?' বলল রানা। 'তুমি একাই একশো?'

'শোনো তাহলে,' সিগারেটের ফিলটারটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কথা বলছে শিবানী । 'আমার গায়ে কি রকম শক্তি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছি আমি, স্টেশনের যে-কোন দুজন পুরুষের সাথে একা আন-আর্মড কমব্যাটে জিতব। চ্যালেঞ্জটা বোকার মত গ্রহণ করেছিল খাদেম আর নঈম, এ্যায়সা শিক্ষা দিয়েছি, তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি ওরা। নঈম তো আমাকে দেখলেই এখন পিছন ফিরে পালিয়ে যায়। আর খাদেম··· তার কথা আর কি বলব! বেচারা কিভাবে যে মরল!' আড়চোখে রানার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। পরমুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল চোখ দুটো, কি যেন বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। 'যা বলছিলাম । শুধু প্রচণ্ড শক্তি রাখি গায়ে তাই নয়, ভাল পিস্তল চালাতে জানি আমি, লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আমার চেয়ে ভাল গাড়ি চালাতে জানে এমন লোক বোধহয় ঢাকায় একজনও নেই। পাহাড়ে চড়তে জানি। সাঁতার প্রতিযোগিতায় কখনও দ্বিতীয় হই না। বিস্ফোরক বুঝি। আমি একজন কেমিস্ট। জুডো, কারাতে জানি। কুংফু জানি। কুস্তী, তাও এক-আধটু

জানা আছে। শুধু একটা জিনিস জানি না। সেটা হলো··· কি বলো তো?' ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকাল সে। 'বলতে পারলে বুঝব তোমার বুদ্ধি আছে।'

'ভয়।'

'ওয়াণ্ডারফুল!' আনন্দে, উচ্ছ্বাসে প্রায় চিৎকার করে উঠল শিবানী। 'তোমার সত্যিই তুলনা হয় না। হ্যাঁ, ভয়। ওটাই শুধু জানা নেই আমার। তাছাড়া সবই জানি আমি। এমন কি, ফর গডস সেক, প্রেম,' ভুরু নাচাল শিবানী, 'হ্যাঁ, প্রেমও করতে জানি আমি। আর সব মেয়েদের মত স্যাঁতসেঁতে প্রেম নয়, ঢিলেঢালা প্রেম নয়, আমার সবকিছুর মত প্রেমটাও আঁটসাঁট, ঠাস বুননির। আগ্রহ বোধ করছ, রানা?' আবার সেই নগ্ন আমন্ত্রণ ফুটে উঠল তার চোখে।

'শুনতে ভালই লাগছে,' ক্ষীণ একটু তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রানা। 'বোরহান যদি চায় আমরা দু'জন একসাথে কাজ করব, নিজেই সে বলবে আমাকে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাধারণত কোন মেয়েকে সাথে নিই না আমি। ওদের ওপর ভরসা রাখা যায় না।'

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে হাসল শিবানী। 'আমার সাথে একবার কাজ করলেই বুঝবে, যে-কোন পুরুষের চেয়ে বেশি ভরসা রাখা যায় আমার ওপর। বোরহানকে জিজ্ঞেস করে দেখো। অকারণে কারও প্রশংসা করা ওর স্বভাব নয়। শুনলাম, আফরোজা নাকি তোমার হাত গলে বেরিয়ে গেছে। খাদেমটা বোকার হদ্দ ছিল। মরে গিয়ে ভালই করেছে। বোরহান তার ওপর বড় বেশি নির্ভর করত। ও মরে গিয়ে আমাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। খাদেমের জায়গাটা ভাবছি এখন আমি দখল করব।'

'ভালই হবে তোমার জন্যে,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঘরে যাচ্ছি আমি। কিছু মনে করো না।'

সাথে সাথে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল শিবানীও। 'আমিও ঘরে যাচ্ছি। একসাথে যেতে পারি আমরা।'

'ডাইনিং হলে এলে অথচ কিছু খেলে না যে?' শিবানীকে খসাবার চেষ্টা করছে রানা।

'কিছু খেতে আসিনি,' তির্যক দৃষ্টি হেনে বলল শিবানী, 'এসেছিলাম তোমাকে সঙ্গ দিতে। চলো, নির্জন কোথাও গা ঢাকা দিই।'

কড়া কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে রানা। দরজার কাছে পৌঁছে একপাশে সরে দাঁড়াল, আগে যেতে দিল শিবানীকে। করিডর ধরে যাবার সময় তার নিতম্বের দোলা দেখে ঢোক গিলল রানা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। গুন গুন করছে শিবানী। নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঠিক ওর পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছে শিবানী।

'তোমার ঘরে?' মৃদু গলায় জানতে চাইল সে।

'না,' বলল রানা। 'মেয়েদের সাথে ঘরের ভেতর কোন সম্পর্ক নেই আমার।'

'তাই? যা শুনেছি সব তাহলে ভুল? চেহারাটা লেডিকিলার, কিন্তু ভেতরটা ঠাণ্ডা বরফ?' হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল শিবানী। 'এই, চলো না! ঘাবড়াচ্ছ

কেন, অন্য কোন মতলব নেই আমার— তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। কই, এসো!'

'একটা মেয়ে এত বেহায়া হয় কি করে!'

'একটা ছেলে এত বোকা হয় কি করে!' পাল্টা জবাব দিল শিবানী। 'তুমি জানো না তুমি কি হারাচ্ছ। এখানে যারা আছে, আমার ঘরে ঢুকতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে তাদের, তা জানো? শুধু তোমার ভাগ্যেই দুর্লভ সুযোগটা জুটেছে। নেবে?'

'দুঃখিত,' নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা, চেহারা থেকে মুছে ফেলেছে রাগের ভাব। 'আমার ঘুম পেয়েছে।'

'তাহলে আগামীকাল, কেমন? কথা দাও।'

'হয়তো। কিন্তু কথা দিতে পারছি না। দুঃখিত।' কথা শেষ করে দরজা খুলে চৌকাঠ পেরোল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। দরজার কবাট বন্ধ করতে গিয়ে দেখল চৌকাঠের ভেতর দিকে একটা পা দিয়ে সেটা আটকে রেখেছে শিবানী।

'আজ নয় কেন?' প্রশ্ন করল সে। 'আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারি। শুনেছি, তুমি একটা টাফ ক্যারেক্টর। আমিও অঘটন ঘটন পটীয়সী। মিলবে ভাল। চমৎকার জুটি বাঁধব আমরা। কেমন মনে হচ্ছে? খোলাখুলি কথা বলা স্বভাব আমার, তুমি আবার কিছু মনে করছ না তো? সময়টা এখানে কাটতে চায় না, মাঝেমধ্যে সাংঘাতিক একা লাগে। আমাদের দু'জনের মধ্যে এত মিল রয়েছে, আমরা আবার পরস্পরের প্রতিবেশী, সুযোগ কি কাজে লাগানো উচিত নয়?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা স্বভাব নয় আমার,' মনে মনে প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও, তার পিছনে বোরহানই লাগিয়েছে শিবানীকে। তাকে পরীক্ষা করছে। সেজন্যেই মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে ও। 'আমি হয়তো একটু সেকেলে।'

'আচ্ছা!' চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে শিবানীর। 'আমার বেলায় এত অজুহাত, কিন্তু আফরোজার বেলায় ঠিক তার উল্টো। তখন স্বভাবটা বদলে যায়, তাই না? তাকে তো দেখামাত্রই প্রেম করতে। সে কি আমার চেয়ে বেশি সুন্দরী?'

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেও নিজেকে অতি কষ্টে শান্ত রেখেছে রানা, বুঝতে পারছে এ বড় ভয়ঙ্কর মেয়ে, সম্ভব হলে এর সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 'তবু দুঃখিত,' বলল ও। 'গুড নাইট।'

'আই সি!' রানার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট গলায় বলল শিবানী। 'বুঝেছি! এইজন্যেই বোধ হয় খুন হয়েছে খাদেম। আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! গুড নাইট, মাই ফ্রেণ্ড।' ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর পেরোল সে, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে বন্ধ করে দিল সেটা।

অনড় দাঁড়িয়ে আছে রানা, দরজাটা বন্ধ হবার পর আর কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। কপাল এবং হাতের তালুতে ঘাম দেখা দিয়েছে ওর।

এর খানিক পর, শুতে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছে রানা, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বোরহান।

'ও, তুমি এখানে। অথচ আমি তোমাকে নিচে খুঁজছিলাম,' বলল বোরহান। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সে। তার তীক্ষ্ণ, সরু মুখে শান্ত ভাব। 'কোথাও কোন চিহ্নমাত্র নেই মেয়েটার। একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'আফরোজা?'

'হ্যাঁ,' এগিয়ে এসে বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসল বোরহান। 'খানিক আগে রিপোর্ট পেয়েছি আমি । তোমরা চলে আসার কয়েক মিনিট পর পুলিস পৌঁছায় ওখানে, তারপর একটা অ্যামবুলেন্স। খাদেমের লাশ সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর হাজির হয় ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। তার সাথে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ে আফরোজা। ওদেরকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। সমস্ত পুলিস স্টেশনে খোঁজ নিয়েছি আমরা, কিন্তু কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি আফরোজাকে।'

'ভুল করছ তুমি,' বলল রানা। 'আফরোজাকে থানায় নিয়ে যাবে না ওরা। নিয়ে যাবে কর্নেল শফির কাছে। কিছু যদি জানে সে, তার কাছ থেকে সব আদায় করে নেবে শফি।'

'আফরোজা তাহলে কোথায় এখন?' সামনের দিকে ঝুঁকে রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল বোরহান।

'কোথায় জানতে চেয়ো না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'সে-জায়গার নাগাল পাবে না তুমি। উঁহুঁ, অসম্ভব। মগবাজারে, আমার আস্তানার কাছ থেকে মাইলখানেক দূরে একটা বাড়ি আছে। পাঁচতলা। বাইরে থেকে আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতই দেখতে লাগে। বাড়িটার নাম টাওয়ার। এই বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করা একটা সৈন্যবাহিনীর পক্ষেও সহজ নয়।' একটু থামল রানা, তারপর বলল , 'বারো নম্বরকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'তাহলে ? এখন উপায়?' রানার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে বোরহান। 'আমাদের দু'জনের জন্যেই সাংঘাতিক বিপদ এটা। ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়ে যায়, দু'জনের কেউই রেহাই পাব না। ব্যর্থতা ক্ষমা করেন না লীডার।'

এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল রানা, মনে মনে চাইছিল লীডারের প্রসঙ্গটা বোরহানের তরফ থেকে উঠুক। 'লীডার আমাকে দায়ী করবেন কিভাবে, আমাকে তো তিনি চেনেনই না!'

'চেনেন,' সংক্ষেপে বলল বোরহান। 'তাঁর অজান্তে কোন কাজ হয় না এখানে।'

মুখ হাঁড়ি করে বলল রানা, 'আমাকে দায়ী করলে লীডার অন্যায় করবেন । সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে দেখা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করব আমি।'

কটমট করে তাকাল বোরহান। 'লীডারকে তুমি পাচ্ছ কোথায় যে দেখা করবে?'

'কেন, এখানে তিনি আসেন না?'

'না,' রুক্ষ গলায় বলল বোরহান।

'মোটকথা যেভাবে হোক তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে,' দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল রানা। 'বিনা অপরাধে শাস্তি পাব, তা তো হতে পারে না।'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ধীর শান্ত গলায় বোরহান বলল, 'বোকার মত কথা বলছ তুমি, রানা। লীডারের সাথে যোগাযোগ করার ইচ্ছে থাকলে সেটা এক্ষুণি মন থেকে মুছে ফেলো । কেউ যদি সে চেষ্টা করে, সাথে সাথে মেরে ফেলার স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দেয়া আছে। অবশ্য, যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই। লীডারের পরিচয়, পেশা, চেহারা, বয়স, সামাজিক পদমর্যাদা, ঠিকানা···কিছুই জানা নেই কারও। আমি বোরহান, এই সংগঠনের জন্মের দিন থেকে এর সাথে জড়িত, বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে লীডারের বিশ্বাস অর্জন করেছি, সেই আমিও লীডারের সামনে আজ পর্যন্ত যেতে পারিনি। একবার মাত্র কথা বলার ভাগ্য হয়েছে, তাও টেলিফোনে···' বেশি কথা বলে ফেলছে বুঝতে পেরেই হঠাৎ চুপ করে গেল বোরহান।

ছোট্ট একটা তথ্য, কিন্তু সেটার মূল্যও কম নয়। টেলিফোনে কথা হয় লীডারের সাথে।

চেহারাটাকে আরও গম্ভীর করে তুলল রানা। বলল, 'যাই হোক, আমি মনে করি, অপরাধ করিনি অথচ শাস্তি দেবেন, এতটা অবিবেচক হতে পারেন না লীডার।'

'ভুলটাই তাঁর কাছে অপরাধ,' বলল বোরহান।

'ভুল? কার ভুল? কাজটা আমাকে সামলাবার সুযোগ দেয়া হয়নি। আমার নির্দেশ অমান্য করেছে খাদেম। তার ভুলের জন্যেই আফরোজা হাতছাড়া হয়ে গেছে। সেজন্যে আমি কেন ভুগব? বেশ, আমি না হয় লীডারের সাথে কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার হয়ে আর কেউ যদি বলে? দরকার হলে লিখিত রিপোর্ট দাখিল করব আমি। সেই রিপোর্ট আমি ড. সমুদ্র গুপ্তকে দেব। আমার বিশ্বাস, লীডারের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা আছে তার।'

'হুঁ,' কালো ছায়া পড়ল বোরহানের চেহারায়। 'নিজের গা বাঁচাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছ তুমি। আমার কি হবে সে-কথা একবারও ভাবছ না।'

'সেটা ভাবাও কি আমার দায়িত্ব?' মনে মনে হাসছে রানা। 'এ দুনিয়ায় কার জন্যে কে কি করে?'

'আমরা পরস্পরের কাজে লাগতে পারি, রানা,' বোরহানের মুখে জোর করা হাসি, ঠোঁটের কোণ কেঁপে গেল।

এই সুযোগটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল রানা। কোনরকম ইতস্তত না করে বলল, 'তা ঠিক। এখানে আমাকে শুধু তুমিই খানিকটা প্রভাবিত করেছ, তোমার মধ্যে কিছু গুণ আর এক-আধটু পৌরুষ দেখেছি। তোমার সাথে কাজ করতে পারলে খুশি হব। আমি নিজে সাহসী আর ফুর্তিবাজ লোক, আমার বন্ধু হতে হলে তাকেও ঠিক সেইরকম হতে হবে। অঢেল টাকা কামাতে চাই আমি, কাজ দেখালে তা কামানোও কঠিন কিছু নয়। তুমি যদি আমার বন্ধু হও, অগাধ টাকার মালিক হবার স্বপ্ন থাকতে হবে তোমার।'

'দলীয় স্বার্থ বজায় রেখে সব করতে পারি আমি,' আশ্বাস দিল বোরহান।

'ভেরি গুড। এখন বলো, তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে কি করতে

পারি আমি?'

'তুমি যে আফরোজার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে, তুমি আর নঈম ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তুমি যদি মুখ না খোলো, নঈমের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারি আমি।'

'শিবানী জানে।'

চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল বোরহানের। 'ঠিক জানো তুমি?'

'জানি। ও নিজেই বলেছে আমাকে। আফরোজা যে পালিয়েছে, তাও জানে। আমার সন্দেহ, খুব বেশি কথা বলে নঈম।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল বোরহান, তারপর বলল, 'শিবানীকে বিশ্বাস করতে হবে। ঠিক আছে, আমি ওর সাথে কথা বলব। এখন, মন দিয়ে শোনো···খাদেম আফরোজার ফ্ল্যাটে একা গিয়েছিল। বুঝতে পারছ? আমাদের নির্দেশ ভুলে গিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজটা সারতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেছে। এই কাহিনী নঈম আর শিবানী সমর্থন করবে, তার ব্যবস্থা আমি করছি। গোটা ব্যাপারটা থেকে তোমাকে যদি সরিয়ে রাখা যায়, বিপদটা কাটিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।'

খট্ করে লাইটার জ্বালল রানা। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো তুমি,' বলল ও। 'কিন্তু শিবানীর ব্যাপারে সাবধান! ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

হাসি ফুটল বোরহানের মুখে। 'ওর দুর্বলতার কথা জানা আছে আমার। আমি যা বলব বাপ বাপ বলে তাই করবে।'

বোরহানকে একটা সিগারেট সাধল রানা। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল বোরহান, তারপর রানার বাড়ানো হাতটা থেকে নিল সেটা।

'আমার জন্যে কিছু ভেবেছ নাকি?' হালকা সুরে, সহজ ভঙ্গিতে জানতে চাইল রানা। 'তোমাকে তো আগেও বলেছি, বেগার খাটতে রাজী নই আমি।'

'একটু ধৈর্য ধরো। বেকার বসিয়ে রাখা হবে না তোমাকে। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আমি কেউ নই। লীডার নিজে মাথা ঘামান। তবে, তোমাকে আমি এটুকু বলতে পারি—আমাদের সিদ্ধান্ত, কর্নেল শফিকে মরতে হবে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মারো শালাকে!'

'এখনও মনে করো কাজটা তুমি করতে পারবে?'

'আমাকে পুষিয়ে দিলে এর চেয়ে কঠিন কাজও করতে পারব আমি।

'ন্যায্য পাওনা তো পাবেই তুমি,' বলল বোরহান। 'তাছাড়া, কাজটায় যদি সফল হও, লীডারের কাছে আমি নিজে সুপারিশ করব তোমার জন্যে—তোমাকে যাতে বড় একটা পদ দেয়া হয়।'

'ব্যর্থতা কাকে বলে জানি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'প্রস্তুতির জন্যে এক হপ্তা সময় দরকার হবে আমার। আর দক্ষ তিন জন লোক চাই।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার মেনে নিতে হবে তোমাকে। তুমি এখানে পরীক্ষার মধ্যে রয়েছ, এখনও আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারোনি। কাজেই তোমাকে আমরা কোন ফায়ার আর্মস দিতে পারব না। প্ল্যানটা তোমার, কিন্তু কাজের বেলায় গুলি

করবে ঝানু দু'জন এজেন্ট। কিছু বলার আছে তোমার?'

'হাতে একটা অস্ত্র থাকলে ভাল হত, কিন্তু না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই,' বলল রানা। খাদেমের মাউজারটা হিপ পকেটে রয়েছে, হঠাৎ গরম আঁচ ছাড়তে শুরু করেছে সেটা, অনুভব করছে ও। 'তারিখ ঠিক করা হয়েছে?'

'আর বেশি দেরি নেই। এক হপ্তা আগে জানাব তোমাকে। তোমার সহকারী হিসেবে টিপু আর সগীরকে দেব—আমাদের সেরা টার্গেটম্যান ওরা। গাড়ি চালাবার জন্যে থাকবে শিবানী।'

'শিবানী? ওকে আমার পছন্দ নয়। আর কেউ নেই?'

'ওর মত? আর কেউ হতে পারে না। ওকেই সাথে নিতে হবে তোমার,' সিদ্ধান্ত ঘোষণার সুরে বলল বোরহান। 'যদি বিপদে পড়ো, ও সাথে আছে বলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হবে তোমার। গাড়ি চালাবার ব্যাপারে ও একটা প্রতিভা। ওর ওপর তুমি চটে আছ কেন?'

'নির্লজ্জ।'

চোখ টিপে হাসল বোরহান। 'তাতে চটার কি আছে? জিনিসটা তো তোফা। সুন্দরী মেয়েরা নির্লজ্জ হলে তা নাকি সোনায় সোহাগা...'

'ব্যক্তিগত রুচিতে বাধে,' বলল রানা। 'আমি বোধহয় একটু সেকেলে।'

'কিন্তু বাছবিচার করার অবকাশ এখানে তেমন নেই, রানা। শিবানী সংগঠনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আমাদের একটা সম্পদ ও। লীডার পর্যন্ত ওর প্রশংসা করেছেন। ওর খাঁই একটু বেশি, কিন্তু খেল ভালই দেয়, বিলিভ মি!' চোখ দুটো চকচক করছে বোরহানের। 'একবার না হয় চেখেই দেখো না।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'দূর, দূর! ও কি খেল দেবে তা আমার ভালই জানা আছে। তুমিও তো কুয়োর ব্যাঙ, খবর রাখো না কিচ্ছু। সেই দুটো মেয়ের কথা বলেছিলাম তোমাকে, মনে আছে? ওদের কাছে গেলে স্রেফ পাগল হয়ে যাবে তুমি। ধুস শা-লা, এই বন্দী জীবন আর ভাল লাগে না। যাবে নাকি ওদের কাছে? এ-হপ্তার মধ্যে গেলে ভাল হয়, তারপর তো বোধহয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। কথা দিতে পারি, মনে কোন খেদ থাকবে না তোমার।'

'কোথায় থাকে ওরা?' হালকাভাবে জানতে চাইল বোরহান, কিন্তু একটা ঢোক গিলে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে রানার দিকে।

'বনানীতে একটা ফ্ল্যাট আছে ওদের। টেলিফোনে ব্যবস্থা করা যায়। করব?'

'কিন্তু স্টেশন ছেড়ে বাইরে যাবার অনুমতি নেই তোমার,' বলল বোরহান। 'তবে আমি সাথে থাকলে তাতে কিছু এসে যাবে না। ঠিক আছে, একটা পুরস্কার হিসেবে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে।'

'কেউ কিছু জানবে না তো?'

'কিভাবে জানবে!'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ভেরি গুড। কাল রাতে হলে কেমন হয়?

'শনিবার,' বলল বোরহান। 'শনিবার রাতের কথা বলে রাখো ওদেরকে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা চেয়ার টেনে জানালার সামনে

বসে আছে রানা, সিগারেট ফুঁকছে। অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ, তারপর কাঁটাতারের বেড়া দেয়া উঁচু পাঁচিল দেখতে পাচ্ছে ও। ডান দিকে লেকের খানিকটা চোখে পড়ে। হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। সাদা উর্দি পরা একজন লোক দৌড়াচ্ছে, আড়াল থেকে বেরিয়ে সোজা লেকের দিকে ছুটে আসছে সে। অনেক দূর থেকে দেখছে রানা, তবু লোকটা যে শ্বেতাঙ্গ বুঝতে পারছে পরিষ্কার। এতক্ষণে একটা শোরগোলের আওয়াজ ঢুকল কানে। অনেক লোক একসাথে চিৎকার করছে। ব্যাপারটা কি? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, জানালার চৌকাঠ ধরে মাথাটা একটু কাত্ করে দিল একদিকে। দৌড়ের মধ্যে মস্ত একটা বাঁক নিচ্ছে লোকটা, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ডান দিকে। এই সময় দানবটাকে দেখতে পেল রানা। একটা ষাঁড়। সামনের দিকে বেঁকে আছে লম্বা শিং দুটো। মাথা নিচু করে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে লোকটার পিছু পিছু। এতবড় ষাঁড় খুব কমই দেখেছে ও। মানবিক কারণেই লোকটার কথা ভেবে আঁতকে উঠল ও।

সামনে লেক, লেকটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এলে বিল্ডিঙের নিশ্ছিদ্র দেয়াল, ডানদিকে খানিকটা মাঠ, তারপর উঁচু পাঁচিল, বাঁদিকে লেকের পাড়, আর পিছনে শিং বাগানো সাক্ষাৎ মৃত্যু। দ্রুত বাঁক নিল লোকটা, লেকের পাড় ধরে ছুটছে। কিন্তু বাঁক নিতে গিয়ে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড নষ্ট হয়ে গেল। আর মাত্র বিশ-বাইশ গজ পিছনে ষাঁড়টা, দু'চার সেকেণ্ডের মধ্যে নাগাল পেয়ে যাবে। লেকের পাড় ঘেঁষে, রানার ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা, তার পিছু পিছু ষাঁড়টাও। কিছু করার নেই, তাই একটু অসহায় বোধ করল ও। বুদ্ধি করে লোকটা যদি পানিতে লাফিয়ে পড়ে, একটুর জন্যে বেঁচে যাবার আশা এখনও আছে।

শোরগোলটা এখনও শুনতে পাচ্ছে রানা। কিন্তু হঠাৎ আর কোন শব্দ নেই, একসাথে চুপ করে গেছে সবাই। পরমুহূর্তে আবার সেই সম্মিলিত চিৎকার। দেখতে না পেলেও কি ঘটেছে অনুমান করতে পারছে ও। গেঁথে ফেলেছে শিং দিয়ে।

চেয়ারে বসে আবার একটা সিগারেট ধরাল রানা। এখনও তাকিয়ে আছে ফাঁকা মাঠের দিকে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। কাছে সরে আসছে যেন চেঁচামেচিটা? হ্যাঁ, তাই। পরমুহূর্তে চমকে উঠল ও। খাড়া হয়ে গেল গায়ের রোম।

রানার দৃষ্টিপথের আড়াল থেকে স্যাত্স্যাত্ করে বেরিয়ে এল আট-দশজন লোক। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল দু'জন। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা এক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলল। পিছনের লোকগুলো তার ঘাড়-গর্দান মাড়িয়ে ঘাসের সাথে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। এরপর লাফ দিয়ে তার ওপর এসে পড়ল ষাঁড়টা। প্রচণ্ড গতির মধ্যে হঠাৎ থামায় পিছনের পা দুটো মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল তার, সমস্ত শরীরের পেশী তীব্র ঝাঁকি খেল, তারপর মাথা নামাল সে। পিছিয়ে এল, তার এই পিছিয়ে আসার ভঙ্গির মধ্যে প্রচণ্ড একটা আক্রোশ ফুটে উঠল। তিন-চার পা পিছিয়ে থামল সে। এক সেকেণ্ড দেরি করল। শিং তাক করছে। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। চোখের

পলকে এগিয়ে গিয়ে গেঁথে ফেলল লোকটাকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে লোকটার পাঁজর থেকে শিংটা বের করে নিয়ে লাফ দিয়ে তাকে টপকে আবার ছুটছে।

বাকি লোকগুলো প্রাণপণে ছুটছে এখনও, কেউ কেউ পড়িমরি করে উঠতে চেষ্টা করছে গাছে। এই সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল রানার। দৃষ্টিপথের আড়াল থেকে ধীর, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল একটা ছেলে। অল্প বয়স, বড়জোর আঠারো উনিশ হবে। সাজ-পোশাকটাও অদ্ভুত। নীল ব্লেজার, মাথায় পেঁচানো রয়েছে সাদা পাগড়ী। সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ঘুরে গেছে ষাঁড়টা, আড়াআড়ি ভাবে সোজা ছুটে আসছে লেকের দিকে। ছেলেটাও ঘুরে গেছে, ঘোড়ার মত দুলকি চালে দৌড়াচ্ছে সে এখন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে রানা। ছেলেটার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারছে ও। খেপা ষাঁড়ের পিছনে আসতে চাইছে সে।

কাছাকাছি আর কোন প্রতিপক্ষ নেই দেখে গতি মন্থর করে এনেছে ষাঁড়টা। এই সময় হঠাৎ ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। দেখতে দেখতে ষাঁড়ের ঠিক পিছনে চলে এল সে।

হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ছেলেটা। ছুটতে ছুটতে ষাঁড়ের লেজটা ধরে টান মারল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল ষাঁড়। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কী! কার এমন স্পর্ধা! এই রকম একটা ভাব চেহারায়। পরমুহূর্তে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল সে। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিপক্ষকে দেখে নিচ্ছে ভাল করে।

সোজা হয়ে অটল দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গায় ছেলেটা। ভয়ের বা ব্যস্ততার কোন লক্ষণই দেখছে না রানা তার মধ্যে। দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা, কুছ পরোয়া নেহি ভাব। রুদ্ধ শ্বাসে দেখার মত একটা দৃশ্য। এখনও কিছু শুরু হয়নি, তবে প্রলয় ঘটে যাবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে ছেলেটা, এখন আর কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

ষাঁড়ের সমস্ত পেশীতে টান পড়ল। মস্ত একটা লাফ দিল সে। চার ভাগের এক ভাগ দূরত্ব এই এক লাফেই পেরিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে মাথা নিচু করল সে, তারপর বিদ্যুৎ বেগে সোজা ছুটল সামনের দিকে। শক্তি আর উন্মত্ততার এমন সমন্বয় এর আগে আর কোন জানোয়ারের মধ্যে দেখেনি রানা।

স্যাঁত্ করে একপাশে সরে গেল ছেলেটা, মানসচোখে দেখতে পেল রানা। কিন্তু কোথায়! নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে খানিকটা। হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আঁতকে উঠল রানা। এভাবে কেউ মরে নাকি! এতদূর থেকে শুনতে পাবে না, তা না হলে চিৎকার করে গালাগালি করত ও।

পৌঁছে গেছে ষাঁড়। প্রতিপক্ষ নড়ছে না দেখে শেষ মুহূর্তে মাথাটা একটু তুলল সে, অমনি বাড়ানো হাত দিয়ে শিং দুটো ধরে ফেলল ছেলেটা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সে-দুটো। ষাঁড়টার প্রচণ্ড গতি ঠেকাতে পারল না ছেলেটা। কিন্তু বাধা দিল বীরের মত। প্রথম ধাক্কাতেই পড়ে যাচ্ছিল সে, খেপা পশুটার দু'পায়ের ফাঁকে সেঁধিয়ে গিয়েছিল

আরেকটু হলে। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ষাঁড়টা। মাটিতে পা বাধাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছেলেটা। তার গায়ের জোর উপলব্ধি করে হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। খেপা একটা ষাঁড়কে বাধা দিয়ে প্রায় থামিয়ে দেয়া, তাজ্জব ব্যাপার! এখনও সামনে এগোচ্ছে ষাঁড়, দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে ছেলে, কিন্তু শিং দুটো ছাড়েনি সে। ষাঁড়ের গতিও আগের চেয়ে মন্থর হয়ে গেছে। আরও শ্লথ হচ্ছে ক্রমশ।

রুদ্ধ শ্বাসে তাকিয়ে আছে রানা। নিজের অজান্তে কখন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ও। শক্ত করে ধরে আছে জানালার চৌকাঠ। এখনও এগোচ্ছে ষাঁড়, কিন্তু এখন তাকে বেগ পেতে হচ্ছে। মাটিতে পা বাধাতে পারছে ছেলেটা, কিন্তু বাধিয়ে রাখতে পারছে না। পিছু হটার গতিটা কমেছে তার, সেই সাথে মুঠো করে ধরা শিং দুটোকে চাপ দিয়ে ঘোরাতে চেষ্টা করছে সে। মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দিল ষাঁড়টাকে, দুটো শরীর স্থির হয়ে থাকল এক সেকেণ্ডের জন্যে, কিন্তু তারপর বিপুল বিক্রমে আগে বাড়তে শুরু করল আবার ষাঁড়, এক ধাক্কায় পাঁচ গজ পিছিয়ে এল ছেলেটা। ক্রমশ বাড়ছে ষাঁড়ের গতি। দ্রুত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিপক্ষকে। জয়-পরাজয় স্থির হতে চলেছে। যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে ছেলেটা, সাথে সাথে সাঙ্গ হবে তার ভবলীলা।

অবস্থা শোচনীয়, বুঝতে পেরেছে ছেলেটাও। ষাঁড়টা বোকা নয়, বিপুল উদ্যম ফিরে পেয়েছে সে। হঠাৎ তার শিং ছেড়ে দিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল ছেলেটা একপাশে। ডিগবাজি খেয়ে সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল আবার। এরই মধ্যে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে ষাঁড়, তেড়ে আসছে শিং বাঁকা করে।

সেই আগের ভঙ্গিতে সোজা, অটল দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। শক্তি পরীক্ষায় এতক্ষণ যুঝেও ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই তার আচরণে। ষাঁড়টা আসছে দেখে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। শেষ মুহূর্তে ষাঁড়টা বুঝতে পারল আগের কায়দায় আবার তার শিং ধরা হবে, প্রতিপক্ষের বাড়ানো হাতের লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবার জন্যে প্রচণ্ড বেগে মাথাটা নাড়ল সে। তা করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাকে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা সফল হলো। শিঙে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেল হাত দুটো। একদিকে ঘুরে গেল ছেলেটা। দুই শিঙের মাঝখানে, ষাঁড়ের কপালের সাথে সেঁটে রয়েছে এখন তার শরীর।

মাটিতে পা বাধিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। ডান হাতের ওপর শরীরের সমস্ত ভার আর শক্তি চাপিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে ষাঁড়কে। সামনে বাড়তে পারছে না বুঝতে পেরে মাথা ঝাড়া দিল ষাঁড়, কিন্তু তার আগেই শিং দুটো মুঠোর ভেতর নিয়ে ফেলেছে প্রতিপক্ষ। শরীরটাকে সোজা করে নিয়ে শক্তি বাড়াচ্ছে ছেলেটা শিং-এর ওপর। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রানা। একচুল আর এগোতে পারছে না ষাঁড়। তীব্র বেগে ধুলো-বালি-ঘাস-মাটি ছুটছে পিছন দিকে, পিছনের পা ছুঁড়ে মাটিতে গভীর গর্ত সৃষ্টি করছে সে। তারপর এগোতে শুরু করল ছেলে। নীল ব্লেজারের বাইরে ফুটে উঠেছে তার মেদহীন শরীরের পেশী। প্রচুর সময় নিয়ে প্রতিপক্ষকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। এক পা এগোচ্ছে, দম নিচ্ছে, শক্তি সঞ্চয় করছে, আবার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক পা। ইতিমধ্যে ষাঁড়ের পিছনে ভিড় জমে

গেছে লোকজনের। দড়াম করে আছড়ে পড়ল ষাঁড়টা মাটিতে। আলগোছে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দেয়া হলো তার গলায়। বেঁধে ফেলা হলো সামনের পা দুটো। এর পরের দৃশ্যটা একেবারে বোকা বানিয়ে দিল রানাকে।

ফুলের মালা পরানো হচ্ছে ছেলেটাকে, সবাই মিলে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচানাচি করছে, এই রকম কিছু দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল রানা। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত। ষাঁড়টাকে ঘিরে ধরল সবাই। ওদের মধ্যে থেকে কেউ একজন এগিয়ে এসে ছেলেটার পিঠটা পর্যন্ত চাপড়ে দিল না। পিঠ চাপড়ানো তো দূরের কথা, কেউ একবার ফিরে পর্যন্ত তাকাল না তার দিকে। ছেলেটাও যেন ঠিক এটাই আশা করছিল। কারও দিকে না তাকিয়ে, কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা হেঁটে চলে যাচ্ছে। সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গি, মনে কোন খেদ বা দুঃখ আছে বলে মনে হচ্ছে না। রানার দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল সে। ষাঁড়টাকে বেঁধে নিয়ে আর সব লোকেরাও চলে গেল।

ফাঁকা, জনশূন্য মাঠের দিকে আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না ওর কাছে। কিন্তু আবছাভাবে কেন যেন মনে হচ্ছে, ঠিক এই ধরনের একটা এড়িয়ে যাবার ঘটনা কোথায় যেন চাক্ষুষ করেছে ও। কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না।

পিছিয়ে এসে ধীরে ধীরে চেয়ারটায় বসল রানা। সিগারেট ধরাল আবার। এখনও তাকিয়ে আছে ফাঁকা মাঠের দিকে।

দশ মিনিট পর নক হলো দরজায়।

'কাম ইন,' বলল রানা। ওর নিচে নামতে দেরি দেখে বোরহান বোধহয় ডাকতে এসেছে।

এখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। নরম পায়ের আওয়াজ কানে ঢুকতেই ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। শিবানী! নীল ব্লেজার, সাদা পাগড়ী! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'তুমি?'

'ভূত নই, একটা মেয়ে,' ঠাণ্ডা কোমল মায়াময় চোখে কৌতুক ঝিলিক মারছে শিবানীর। 'অমন আঁতকে উঠলে যে?'

'খানিক আগে ওই মাঠে...' জানালার দিকে ইঙ্গিত করল রানা, '...তুমি?'

'দেখেছ বুঝি? চিনতে পারোনি আমাকে?'

ধীরে ধীরে চেয়ারে আবার বসল রানা। 'না, চিনতে পারিনি,' বলল ও। 'আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। তোমার তুলনা হয় না।'

নিঃশব্দে রানার পিছনে এসে দাঁড়াল শিবানী। 'সত্যি? ভাল লেগেছে তোমার?'

অস্বস্তিবোধ করছে রানা। শিবানী পিছনে রয়েছে বলে শিরদাঁড়ায় কেমন যেন শিরশিরে একটা ভাব। উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ করল না ও। জানতে চাইল, 'কেন এসেছ?'

'কেমন মানুষ তুমি, এখনও ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না,' নিচু গলায় বলল শিবানী। 'পরিষ্কার বুঝতে পারি আমি, আমাকে দেখলেই কলজে শুকিয়ে যায়

তোমার। কেন, রানা?'

'বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আর কিছু বলার না থাকলে তুমি যেতে পারো।'

'কথাটা তাহলে স্বীকার করছ তুমি?'

'কি কথা?'

'আমাকে তুমি ভয় করো?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করি,' বলল রানা। 'আমি একা নই, নির্লজ্জ মানুষকে সবাই ভয় করে।'

'কি? কি বললে? আমি নির্লজ্জ?'

'তুমি এখন যেতে পারো, শিবানী।'

'তোমার দেমাক দেখে আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হই না,' হাসছে শিবানী। 'কারণ জানি, ওটা তোমার ভান। কি যেন মতলব আছে তোমার, সেটা ঢাকা দেবার জন্যে দেমাক, রাগ, গাম্ভীর্য দেখাতে হচ্ছে তোমাকে। খুব বড় কোন মতলব, সন্দেহ নেই, তা নাহলে সামনে এমন রাজভোগ দেখেও জিভ সামলে রাখতে হয়! এই-রে, ভুল হয়ে গেল, আবার না নির্লজ্জ বলে গালি খেতে হয়। ভাল কথা, বোরহান বলল, আমার সাথে কাজ করতে আপত্তি নেই তোমার, সত্যি নাকি?'

'বোরহানকেই জিজ্ঞেস করো, যাও।'

'আমি কিন্তু বোরহানকে জানিয়ে দিয়েছি, তোমার কাছে অস্ত্র থাকলে আমি তোমার সাথে যাব না।' পিছন থেকে বলল শিবানী। 'এবং আমার কাছে অন্তত একটা পিস্তল থাকতেই হবে।' ঘুরে দাঁড়াল শিবানী। দরজার কাছে গিয়ে থামল সে। 'আমার একটা শর্ত মেনে নিয়েছে বোরহান। আশা করি দ্বিতীয় শর্তটাও মেনে নেবে।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

পরবর্তী চার দিন ধীর গতিতে কাটল রানার। নিয়মিত ট্রেনিং দিচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার দু'জনকে। ওরা এখন চোখ বুজে ধ্বংস করে আসতে পারবে জেনারেটরগুলো। এছাড়াও পাঁচমিশালী ছাত্র-ছাত্রীদের একটা ক্লাস নেয় ও। ইনভিজিবল ইঙ্ক আর সাইফারের কৌশল শেখায়। নীরস, একঘেয়ে একটা কাজ, কিন্তু কৃত্রিম উদ্দীপনা দেখাতে কার্পণ্য করে না ও। ছাত্র-ছাত্রীরা যত বকা খাচ্ছে, ততই ভক্ত হয়ে উঠছে ওর। মাঝেমধ্যে ওর ক্লাসে এসে বসে ড. সমুদ্র গুপ্ত। রানার পাণ্ডিত্য আর শেখাবার আগ্রহ দেখে একাধারে বিস্মিত এবং খুশি হয়।

বিকেলটা শিবানীকে এড়িয়ে যাবার কাজে ব্যয় হয় ওর। সমুদ্রের সাথে কাচ্চু খেলে। লোকটা এরই মধ্যে ওকে পাঁচ-লাখ বলে ডাকতে শুরু করেছে। একা তাকে খুব কমই দেখা যায়, সাথে দু'একজন বিদেশী আছেই।

তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, উপলব্ধি করতে পারে রানা। সন্দেহটা ধীরে ধীরে কমছে ওর ওপর থেকে। সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে ও। এ ব্যাপারে ওর ছাত্র-ছাত্রীরাই সবাইকে পথ দেখাল। সাধারণ সদস্যদের শ্রদ্ধা-ভক্তি পেতে শুরু করেছে ও। ওর চলাফেরায় কোন বাধা নেই, বাড়িটার যে-কোন জায়গায় যেতে পারে ও। শুধু বাইরে বেরুনো নিষেধ। ফার্মেও গিয়েছিল

একদিন।

ফার্মটা বেশ বড়। এখানে দেশী কোন পশুপাখি নেই। মুরগী-হাঁস-গরু-ছাগল সব বিদেশী। লেবার ছাড়া আর যারা কাজ করছে তারাও সবাই বিদেশী। কিছু জিজ্ঞেস করলে হাসে তারা, হাতের ঘড়ি দেখিয়ে এদিক ওদিক মাথা দোলায়। তার মানে বলতে চায়, কথা বলার সময় নেই। 'নো অ্যাডমিশন' লেখা কিছু জায়গা আছে, কাছাকাছি যাবার আগেই হাত নেড়ে দূরে সরে থাকতে বলা হয়েছে তাকে। মেইন গেটের দিকেও যেতে দেয়া হয়নি।

শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় ওর কামরায় এল বোরহান। গাঢ় রঙের একটা লাউঞ্জ স্যুট পরেছে সে, দাড়ি কামিয়েছে এইমাত্র। তার চোখে গভীর একটা ঘোর ঘোর ভাব দেখে টিনার জন্যে দুঃখ হলো রানার। বোরহানকে যাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ও তাদের একজনের নাম টিনা, অপর মেয়েটার নাম রিটা। দু'জনেই সুন্দরী। কিন্তু রিটার চেয়ে টিনা এক কাঠি সরেস। টিনার চেয়ে রিটার আবার বুদ্ধি বেশি। মাস কয়েক আগে এদের সাথে পরিচয় হয়েছে রানার। দু'জনেই ইউনিভার্সিটির ছাত্রী, ইংরেজিতে অনর্গল ফটফট করতে পারে, আলাদা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একসাথে থাকে দুই বান্ধবী। যতটা না পয়সা তার চেয়ে অ্যাডভেঞ্চার আর কিক্-এর লোভ বেশি ওদের। গোনাগুনতি কিছু বাছাই করা লোক অতিথি হিসেবে নেয় ওরা, আর কারও প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। রানার বিশেষ অনুরোধে বোরহানকে মেনে নিতে রাজী হয়েছে ওরা।

'রেডি?' একটু অধৈর্যের সাথে জানতে চাইল বোরহান।

'হ্যাঁ,' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই পরছে রানা। ব্রেস্ট পকেটে ভাঁজ করা রুমালটা ভরে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'পিছন দিকে একটা গাড়ি আছে,' বলল বোরহান। 'আমি আগে যাব। কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছ, বলবে বোরহানের কাছে যাচ্ছি।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল রানা। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বোরহান কামরা ছেড়ে। এক মিনিট অপেক্ষা করার পর রানাও বেরুল। বেরিয়েই দেখল নিজের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। ঠাণ্ডা দৃষ্টি বুলিয়ে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে। 'কোথাও যাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'কোথায় জানতে পারি?'

'ছাদে,' বলল রানা। 'পায়রাগুলোকে ছোলা খাওয়াব।

'আমিও আসছি তোমার সাথে,' পিছন থেকে বলল শিবানী। 'তোমাকে আমি অন্য এক জিনিস খাওয়াব।'

'ছাদে যদি তোমাকে দেখি, লাফ দিয়ে নিচে পড়ব আমি,' সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে রানা। দড়াম করে শব্দ হলো দরজা বন্ধ করার। পিছন ফিরে শিবানীকে দেখতে না পেয়ে হাঁফ ছাড়ল একটা।

কালো একটা টয়োটার ড্রাইভিং সীটে বসে আছে বোরহান। উঠে তার পাশে বসল রানা। ব্র্যাণ্ডির কড়া ঝাঁঝ ঢুকল নাকে।

'কেউ দেখেছে তোমাকে?'

'শুধু মিস সিঙ্গাপুরী।'

'কি বলেছ?'

'নিজের চরকায় তেল দিতে।

'এখানে সবাই যমের মত ভয় করে শিবানীকে,' বলল বোরহান। 'অসাধারণ সুন্দরী তো, লোভ সামলাতে না পেরে প্রথম দিকে কেউ কেউ হাত বাড়িয়েছিল ওর দিকে। সব ক'টা হাত ভেঙে দিয়েছিল সে। একটা মেয়ের গায়ে এত জোর থাকতে পারে, কল্পনা করা যায় না। যাই হোক, আশ্চর্য কড়া প্রকৃতির মেয়ে, ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, তোমাকে কাছে টানার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে একেবারে। ব্যাপারটা কি বলো তো? কি দেখেছে তোমার মধ্যে?'

'আমি বোধহয় ওর সন্দেহ দূর করতে পারিনি,' বলল রানা। 'প্রথম থেকেই আমাকে অবিশ্বাস করছে ও। আরও কাছ থেকে দেখতে চায়।'

দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে বোরহান। 'অসম্ভব নয়। সংগঠনের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না ও। যাই হোক, তোমার উচিত ওর সাথে ভাল একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'রক্ষে করো!' আঁতকে উঠল রানা। 'আমাকে চুষে ছিবড়ে বানাবার সুযোগ ওকে আমি দিচ্ছি না।' খানিক পর আবার বলল, 'আচ্ছা, ভাল করে ভেবে বলছ, ওর ওপর ভরসা রাখা যায়?'

'হ্যাঁ,' বলল বোরহান। হেডলাইটের আলোয় দু'জন গার্ডকে দেখতে পেয়ে গাড়ির স্পীড কমাচ্ছে সে।

গার্ডদের সাথে কথা বলল বোরহান, তাকে দেখে আগেই তারা খুলে দিয়েছে গেট।

রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আছে রানা, এলাকাটা চেনার জন্যে আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যা উতরে গেছে, চারদিকে গাঢ় হয়ে নেমেছে অন্ধকার, ভাল করে কিছু দেখতেই পাচ্ছে না ও। কি মনে করে কে জানে, গেট থেকে বেরিয়ে এসেই হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছে বোরহান, শুধু পার্কিং লাইটগুলো জ্বলছে। মাইলস্টোনগুলো স্যাত্‌স্যাত্‌ করে পাশ ঘেঁষে পিছিয়ে যাচ্ছে, একটাও পড়তে পারছে না রানা। তবে আন্দাজ করল, পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা। রাস্তাটা মোটামুটি ভাল, গাড়ির স্পীড ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে বোরহান। সামনে অন্ধকার, কিন্তু তবু আবছাভাবে একটা বাঁক দেখতে পেল রানা। টয়োটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল বোরহান। রানার দিকে আড়চোখে তাকাল একবার। কিছুই যেন বুঝতে পারেনি বা বোঝার চেষ্টা করছে না রানা, অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাচ্ছে ও। কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে যা দেখবার দেখে নিচ্ছে পরিষ্কার। সামনে চৌরাস্তা। যা অনুমান করেছিল, তাই। পুব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা। গাজীপুরের দিক থেকে আসছে, বাঁক নিয়ে পড়ছে ঢাকার রাস্তায়। চৌরাস্তার মাথায় পাথরের বিরাট মূর্তিটা সমস্ত রহস্য ফাঁক করে দিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক এই মূর্তি। বাঁ হাতে রাইফেল আর ডান হাতে গ্রেনেড নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলার মেয়ে। চট করে

স্পীডোমিটারে তাকাল রানা। পঞ্চাশ মাইল গতিতে ছুটছে টয়োটা। মনে মনে একটা হিসাব কষল ও। খুব জোর পনেরো মাইল দূরত্ব পেরিয়েছে ওরা। তার মানে, এদের স্টেশনটা গাজীপুর বা তার আশপাশে কোথাও হবে। বুকের ভেতর পুলক অনুভব করছে ও। এলাকাটা অন্তত সনাক্ত করা গেছে।

বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে গাড়ি। স্পীড আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বোরহান। কিন্তু কয়েক মিনিট পর শহর এলাকায় এসে গতি কমাতে বাধ্য হলো সে।

টোপ গিলেছে বোরহান, তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে এখন রানা। কি করবে ভাবছে। মাথায় একটা ঘা বসিয়ে দিয়ে অজ্ঞান বোরহানকে হাজির করা যায় কর্নেল শফির কাছে। গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে কথা আদায় করার টেকনিক জানা আছে কর্নেলের। কিন্তু বোরহান জানে কতটুকু সেটাই হলো প্রশ্ন। বেশি কিছু যদি না জানে, এত কষ্টের আয়োজন সমস্তটাই মাঠে মারা যাবে। রানার কাজ লীডারের পরিচয় ভেদ করা, কিন্তু বোরহান লীডারের পরিচয় জানে কিনা বলা মুশকিল।

সংগঠনের ভেতর নিজের একটা জায়গা করে নিচ্ছে রানা। সবার বিশ্বাস অর্জন করতে যাচ্ছে ও। প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোয় উতরে গেছে, এখন দু'একটা কাজ দেখাতে পারলেই সবাই ওর ওপর নির্ভর করতে শুরু করবে। বোরহান এরই মধ্যে ভরসা করতে শুরু করছে ওর ওপর। এদের সাথে থাকলে, একদিন না একদিন লীডারের সাথে দেখা করার সুযোগ পাওয়া যাবেই। উহুঁ, বোরহানকে কর্নেলের কাছে নিয়ে গিয়ে সম্ভাবনাটার ইতি ঘটানো উচিত হবে না। লীডারের দেখা পেতে হলে সংগঠনের ভেতর থাকতে হবে তাকে। ওদের সবার পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে টেলিফোনে বা অন্য কোনভাবে কর্নেলের সাথে যোগাযোগ করা কঠিন হবে না। তার আগে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই ভাল। বোরহানের মাথায় বাড়ি না মেরেও কর্নেলের সাথে কথা বলার একটা সুযোগ পেতে যাচ্ছে আজ ও।

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে বোরহান, কিন্তু বনানীর কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ জানতে চাইল, 'মেয়ে দুটোকে বিশ্বাস করা যায় তো?'

'আমাদের সম্পর্কে জানছেই বা কি যে ওদেরকে বিশ্বাস করতে হবে?' বলল রানা। 'যে কাজে যাচ্ছি সেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব, বেশি কথা না বললেই হবে। তবে, এরা খুব ভাল মেয়ে, কারও সাতে পাঁচে থাকে না। আমোদ ফুর্তি ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নয়। ডানদিকে বাঁক নাও।'

বাঁক নেয়া শেষ করে বোরহান বলল, 'জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি—কত লাগবে?'

'লাগবে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো?' বলল রানা। 'এটা ওদের ব্যবসা নয়, বোরহান। তোমাকে তো আগেই বলেছি, ওরা আমার বান্ধবী। আমি অনেক করে অনুরোধ করেছি বলে তোমাকে ওরা মেনে নিতে রাজী হয়েছে। টাকার কথা ভুলেও মুখে এনো না, রেগে গিয়ে যদি পুলিস ডাকে তাতেও আশ্চর্য হব না আমি—ওদের আত্মসম্মান জ্ঞান সাংঘাতিক প্রখর।'

'খুব কড়া মেজাজের হলে অসুবিধে না?' খানিক ইতস্তত করে বলল

বোরহান।

'কড়া মেজাজ? দূর ছাই, তুমি দেখছি ভুল বুঝছ আমাকে! শোনো তবে, বলি, কি রকম খাতির করবে ওরা তোমাকে।' টিনা আর রিটা তাদের ছেলে-বন্ধুদেরকে নিয়ে কিভাবে কি করে তার বিশদ বর্ণনা দিতে শুরু করল রানা। ওর গল্প শেষ হতে দেখা গেল বোরহানের চোখ দুটো অবিশ্বাসে বিস্ফারিত আর লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে।

হাসছে রানা। 'আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখেই দেখো,' বলল ও। 'গাড়ি থামাও, পৌঁছে গেছি আমরা।'

নক করতেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল রিটা। রানাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা, লাফিয়ে উঠে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা। তারপর চুমো খাওয়ার জন্যে টানল নিচের দিকে।

দৃঢ় ভঙ্গিতে সরিয়ে দিল তাকে রানা। 'আরে, রসো!' হাসিমুখে বলল ও। 'দম আটকে মারা যাব যে! আছ কেমন?' বোরহানকে দেখাল ইঙ্গিতে। 'এ আমার বন্ধু। কায়েস বলে ডেকো। টিনা কোথায়, দেখছি না যে?'

'এই যে আমি,' দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টিনা। বোরহানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'বন্ধুকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে এসেছ নাকি? ভেতরে ঢোকো। এই রিটা, সরে দাঁড়া।'

রিটা একটু বেঁটে, কিন্তু শরীরটা যেন পাথরে খোদাই করা। ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামলা বলা যেতে পারে তাকে। কিন্তু টিনার গায়ের রঙ দুধে-আলতায় মেশানো। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে দু'ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে সে। অপরূপ সুন্দরী, ডানাকাটা পরী বললেও হয়।

সিটিংরুমে ঢুকল বোরহান। তার পিছু পিছু রানা। অচেনা বাড়িতে নবাগত বিড়ালের মত লাগছে বোরহানকে। ঘুর ঘুর করছে চারদিকে। ওরা চারজন ছাড়া ফ্ল্যাটে আর কেউ আছে কিনা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। নিজের হাতে দরজাগুলো খুলল সে, উঁকি দিয়ে তাকাল বেডরুমে, বাথরুমগুলো পরীক্ষা করল, কিচেন থেকেও ঘুরে এল একবার।

রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে মেয়ে দুটো বোরহানের কাণ্ড দেখেও না দেখার ভান করছে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে ওরা, গ্লাসে বিয়ার ঢালছে। ফিরে এসে একটা সোফায় আরাম করে বসল বোরহান।

'পরিবেশটা পছন্দ হয়?' জানতে চাইল রিটা। গ্লাস ভর্তি বিয়ার নিয়ে এগিয়ে এল টিনা, বসল বোরহানের সোফার হাতলে। বোরহান গ্লাসটা ধরার জন্যে হাত বাড়াতেই এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে।

'উঁহুঁ,' মুখে দুষ্টামিভরা হাসি টিনার। গ্লাসটা বোরহানের ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল সে। 'এভাবে।'

টিনার হাতে ধরা গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে রিটার দিকে তাকাল বোরহান। দেখল, রানার উরুর ওপর বসে আছে সে। বলল, 'হ্যাঁ, পরিবেশটা খুব ভাল।' তারপর টিনার দিকে মনোযোগ দিল সে।

টিনার কোমরটা একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানল বোরহান। খিল খিল করে হাসছে টিনা। হঠাৎ ঝট্ করে রিটার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল বোরহান, 'ওটাই কি তোমাদের একমাত্র টেলিফোন?'

মৃদু একটা চিমটি দিয়ে রিটাকে সাবধান করে দিল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল রিটা, চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তুলেছে সে। 'কেন? কোথাও ফোন করবেন আপনি?'

'না,' বলল বোরহান। 'এমনি জানতে চাইলাম।' টিনার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'এই, ব্র্যাণ্ডি নেই ঘরে? কিংবা হুইস্কি? এই বিয়ারে পোষায় নাকি?'

রানার দিকে তাকাল টিনা। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা। সোফার হাতল থেকে উঠে চলে গেল টিনা। কিচেন থেকে ফিরে এল একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে।

'আর কেউ ছোঁবে না,' ঘোষণার সুরে বলল বোরহান, 'এটা আমার বোতল।' সবাই ওরা হেসে উঠল।

বোরহানের গ্লাসটা খালি হতে দিচ্ছে না টিনা, তার আগেই ভরে দিচ্ছে সে। মিনিট কয়েক গল্পগুজব করল বোরহান, তারপর অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করল তার আচরণে।

'ওদেরকে এখানে রেখে আমরা অন্য কোথাও গেলে হয় না?' বোরহানের কানে কানে কথা বলছে টিনা। 'ওদের ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। একেই তো পাবলিক নুইসেন্স বলে, তাই না? রিটার কাণ্ড দেখেছ, ছি, এভাবে কেউ চুমো...'

সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ল বোরহান। কিন্তু সোফা ছেড়ে উঠতে ইতস্তত করছে সে।

আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করছে রানা। বুঝতে পারছে, টেলিফোনটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বোরহানকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'পাশের কামরায় যাচ্ছি আমরা,' বলল ও। 'রিটা ওর অ্যালবামটা দেখাতে চাইছে আমাকে। খানিক পরে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল বোরহানও। 'পাশের কামরা? আমি আগে দেখব ওটা!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বলল, 'রিটা, কামরাটা দেখিয়ে আনো ওকে। ওর ধারণা আমি বোধহয় পালিয়ে যাব। শেষে টিনার হাত থেকে ওকে উদ্ধার করার কেউ থাকবে না!'

হেসে উঠল সবাই। বোরহানও।

'কেন?' অবাক বিস্ময়ে বোরহানের দিকে তাকাল রিটা। 'কি করে ভাবতে পারলেন ওকে আমি পালাতে দেব? পাশের ঘরে মজা করবে টিনা, আর আমি বসে বসে আঙুল চুষব বুঝি?'

একটা দরজা খুলে দিল রিটা। এগিয়ে গিয়ে পাশের বেডরুমে উঁকি দিল বোরহান। বেডসাইড টেবিলের নিচের শেলফে রাখা টেলিফোন সেটটা চোখে

পড়ল না তার। এটা আলাদা কোন টেলিফোন নয়, একই নম্বরে প্যারালেল লাইন। নিজেদের সুবিধের জন্যে দুটো সেট ব্যবহার করে ওরা। একটা সুইচ টিপলেই রিটা কার সাথে কি বলছে শুনতে পাবে না টিনা।

কামরাটায় একটা মাত্র দরজা দেখে সন্তুষ্ট হলো বোরহান, পিছিয়ে এসে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তোমাদেরকে আর দেরি করিয়ে দেব না, যাও।'

রিটার কাঁধে হাত রেখে পাশের কামরায় ঢুকল রানা। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হাত পাতল রিটার সামনে, 'চাবি দাও।'

'সেকি, কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রিটা।

'সময় নেই, যা বলছি করো!' তাড়া লাগাল রানা।

চাবিটা খুঁজে বের করে রানার হাতে তুলে দিল রিটা। 'ব্যাপার কি বলো তো?'

দরজায় তালা লাগিয়ে রিটার হাত ধরল রানা, তাকে টেনে এনে বসাল বিছানার ওপর। কিন্তু কিছু বলার আগে রিটাই মুখ খুলল, 'এসব আমার ভাল লাগছে না, ডিউক। তোমার ওই বন্ধুটি কে? কিছু মনে করো না, চেহারা দেখে ওকে কিন্তু মানুষ বলে মনে হয়নি আমার।'

'কে, তা জানতে চেয়ো না,' নিচু গলায় বলল রানা। 'ঠিক ধরেছ, জানোয়ারই ও। শোনো, আমার কথায় মন দাও। আর খুব নিচু গলায় কথা বলো, একটা শব্দও যেন বাইরে না যায়।'

অস্বস্তির ছায়া পড়ল রিটার চেহারায়। 'কোন বিপদে পড়ব না তো, ডিউক?'

গম্ভীর হলো রানা। 'আমি তোমাদেরকে বিপদে ফেলব বলে মনে হয়?'

'আহা, রাগ করছ কেন!' তাড়াতাড়ি বলল রিটা। 'লোকটাকে তেমন সুবিধের মনে হলো না, তাই বলছি। তোমাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বলো কি বলবে?'

'আমি শুধু তোমার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে চাই,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'ব্যক্তিগত একটা ঝামেলায় হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছি, টেলিফোনে এক ভদ্রলোকের সাথে যোগাযোগ না করলেই নয়। তোমাদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয় জানি বলেই এখানে আসতে হয়েছে আমাকে।' দরজার দিকে একটা আঙুল তুলল ও। 'ও ব্যাটা একা কোথাও যেতে দেয় না আমাকে। ওর অজান্তে টেলিফোনটা করতে হবে।' একটু থেমে হাসল রানা। 'এতে তোমাদের জন্যে কোন বিপদ নেই, তবু আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। তোমরা সাহায্য করছ বলে নগদ দু'হাজার টাকা পাবে। শুধু তাই নয়, এর চেয়ে বড় আর এর চেয়ে ভাল এলাকায় একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাদের জন্যে। এখানে যা ভাড়া দিচ্ছ তার চেয়ে অনেক কম ভাড়ায়, কোন অ্যাডভান্সও লাগবে না। খুশি?'

'মাই গড! এসব তুমি সত্যি বলছ, ডিউক?' আনন্দে চিক চিক করছে রিটার চোখ। 'নাকি স্বপ্ন দেখছি আমি? ফ্ল্যাটটা বদলাবার জন্যে কত চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু অ্যাডভান্সের টাকা যোগাড় করতে পারছি না বলে…'

'দিলাম তো সব সমস্যার সমাধান করে,' বলল রানা। 'আরও কথা আছে,

শোনো। আমরা চলে যাবার পর আজ রাতেই একজন সরকারী লোক আসবে তোমাদের কাছে। দু'হাজার টাকা আর নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানা দেবে সে। বাড়ি বদল করার যাবতীয় ঝক্কিও সামলাবে সে। ঠিক আছে?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রিটা। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সে।

আবার দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রানা, বলল, 'ওই লোকটা সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ। কী-হোলে একটা চোখ রেখে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখো তুমি। যদি দেখো, রিসিভারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে লোকটা, আমাকে সাবধান করে দেবে। বুঝতে পারছ?'

'আর যদি কী-হোলে চোখ রাখে লোকটাও?'

'তাই তো!' একটু চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'এর একমাত্র সমাধান, যখন দেখবে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে ও, সাথে সাথে সিধে হয়ে দাঁড়াবে তুমি, তারপর দরজার দিকে পিছন ফিরবে, কী-হোল দিয়ে ওদিক থেকে তোমার পিঠ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।'

'পিঠ দেখবে, না শাড়ি দেখবে?' মুচকি একটু হাসল রিটা।

'শাড়ি দেখলে চলবে না,' বলল রানা। 'পিঠ দেখাতে হবে। উপায় নেই, কাপড়চোপড় খুলে কী-হোলে চোখ রাখো তুমি।'

'কি!'

'যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, জলদি করো!' চাপা গলায় ধমকে উঠল রানা। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। টেবিলের দিকে এগোচ্ছে। 'আর, টেলিফোনে আমি কি বলি না বলি সেদিকে কান দিয়ো না। তোমার নিরাপত্তার জন্যেই বলছি কথাটা।'

দ্রুত কাপড় ছাড়ছে রিটা। 'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা! কানে তুলো গুঁজে রাখব।'

টেবিলটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল ও। একবার রিঙ হলো, তার পর মুহূর্তে কর্নেল শফিকুর রহমানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।

'আমি রানা রিপোর্ট করছি,' নিচু গলায় দ্রুত বলল রানা। 'অনেক কথা বলার আছে আমার, সব রেকর্ড করা দরকার। আপনার পার্সোন্যাল সেক্রেটারিকে নোট নেবার জন্যে ডাকবেন?'

'তোমার সাড়া পেয়ে খুব খুশি লাগছে আমার, রানা,' আন্তরিকভাবে বললেন কর্নেল শফি। 'ভয়ানক দুশ্চিন্তায় ছিলাম। ওদিকের খবর কি?'

আড়চোখে তাকিয়ে রিটাকে দেখল রানা। ওর দিকে পিছন ফিরে, সামনের দিকে ঝুঁকে কী-হোলে একটা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'খবর ভাল, কর্নেল,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে দারুণ উপভোগ করছি সময়টা। সমস্ত খরচ আপনার। নগদ দু'হাজার টাকা, এবং নয়শো টাকার মধ্যে তিন কামরার অ্যাটাচড় বাথরুম সহ একটা আধুনিক ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। আজ রাতেই। ঠিকানা দিচ্ছি, একজন লোক পাঠিয়ে মেয়ে দুটোকে ওই নতুন ফ্ল্যাটে মালামাল সহ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। সম্ভব?'

অপর প্রান্তে কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপর কর্নেল বললেন, 'মেয়ে দুটোর নিরাপত্তার কথা ভাবছ তুমি, তাই না?'

উত্তর না দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা।

'সম্ভব,' বললেন কর্নেল। 'আর কিছু?'

'আফরোজার সাথে কথা বলেছেন?'

'বিশেষ কিছু জানে না সে,' বললেন কর্নেল। 'তবে তাকে আমরা দৃষ্টি আর নাগালের বাইরে রেখেছি। ওরা নিশ্চয়ই খুঁজছে তাকে?'

'হ্যাঁ। আপনার ভাগ্নীকে দিয়ে তাকে জানান, তার ভাই মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। বোরহান তাকে জেরা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা এড়িয়ে যাবার জন্যে ওই রাস্তাটা বেছে নিয়েছে সে। আপনার সেক্রেটারিকে দিন, আমার হাতে সময় নেই...'

'আফরোজাকে খবরটা জানানো হবে,' বললেন কর্নেল। 'খাদেমকে না মারলেই কি হত না তোমার? তোয়াব খান সাংঘাতিক চটে গেছে তোমার ওপর।'

'সে যদি আমার পজিশনে থাকত, খাদেমকে তো খুন করতে পারতই না, নিজেই খুন হয়ে যেত অনেক আগে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এছাড়া কোন উপায় ছিল না। ওকে বাঁচতে দিলে আমার আর ফেরা হত না হেডকোয়ার্টারে। এটাকে লোকসান বলা চলে না।'

'হয়তো। তবু, ঠিক আছে। দেখি কিভাবে ধামা চাপা দেয়া যায় ব্যাপারটাকে। এ নিয়ে চিন্তা করো না তুমি। ছাড়ছি, কেমন?'

কয়েক সেকেণ্ড পর একটা মেয়ের গলা শোনা গেল। 'হ্যাঁ, বলুন।

মুচকি হাসল রানা। রূপার গলা কিন্তু ও যে চিনতে পেরেছে তা বলল না। ডিক্টেট করতে শুরু করল ও। সংক্ষেপে, দ্রুত বলে যাচ্ছে। রূপার ফ্ল্যাট ছাড়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার কিছুই বাদ দিচ্ছে না। আফরোজার ফ্ল্যাট থেকে স্টেশনে যাবার ঘটনাটা বিশদভাবে উল্লেখ করল ও। ড. সমুদ্র গুপ্ত আর বোরহানের চেহারার বর্ণনা দিল। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার কথা বলল। চেহারার বর্ণনা দিল ইঞ্জিনিয়ারদের। সবশেষে বলল, 'এখানে একটা মেয়ে আছে, সিঙ্গাপুরী, নাম শিবানী, আমার প্রেমে পড়ে গেছে, কি করা যায় বুঝতে পারছি না—এনি সাজেশন, রূপা?'

'সাজেশন? আছে। ওর ক্রীতদাস হয়ে যাবেন না,' গম্ভীর গলায় বলল রূপা। 'আর...নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন। কর্নেলের সাথে কথা বলুন।'

'রানা?' কর্নেলের গলা।

'সময় নেই...'

'রিপোর্টটা ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে,' বললেন কর্নেল। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।

'আপনাকে খুন করার প্ল্যান করেছে ওরা,' দ্রুত বলল রানা। 'অপারেশনটার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হবে। যে-কোন দিন ঘটতে পারে ঘটনাটা, কাজেই এখন থেকে চোখ খোলা রাখবেন। দিন তারিখ স্থির হলে আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব, কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, আমি আমার সাধ্য মত চেষ্টা করব

আপনি যাতে আহত না হন। যাই ঘটুক না কেন, সাথে সাথে রটাতে হবে আপনি মারা গেছেন। অপারেশনটা সফল হওয়া না হওয়ার ওপর আমার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। সফল হলে সংগঠনের একজন সদস্য করে নেয়া হবে আমাকে, আর ব্যর্থ হলে আমাকে ওদের দরকার হবে না, জানিয়ে দিয়েছে আগেই। তার মানে, আমাকে ওরা মেরে ফেলবে।'

'ঠিক আছে,' বললেন কর্নেল। 'ঘটনাটা কিভাবে ঘটবে সে-সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'রাতে আপনি বাড়ি থেকে রোজই একবার বেরোন,' বলল রানা, 'ওই সময়টাকেই বেছে নেবার চেষ্টা করব আমি। আমার সাথে দু'জন রিভলভারধারী থাকবে, আর থাকবে শিবানী নামে একটা মেয়ে, গাড়ি চালাবার জন্যে। রিভলভারধারীরা নিজেদের কাজে পাকা ওস্তাদ। কাজেই সাবধান। এখন থেকে সাথে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করুন।'

'ঠিক,' বললেন কর্নেল। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'রিপোর্টে হেডকোয়ার্টারের এলাকা সম্পর্কে বলেছি আমি। জায়গাটা চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। সহজ কাজ। কিন্তু সাবধান, কাউকে ভেতরে পাঠাবার ঝুঁকি নেবেন না। একবার ঢুকলে বেঁচে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।'

'খুঁজে বের করে ফেলব। সাবধানে থেকো, রানা, মাই ডিয়ার বয়। তোমার কাজে আমি মুগ্ধ।'

'সো লং,' বলল রানা, ক্রাডলে রেখে দিল রিসিভারটা। মুখ তুলতেই দেখল রিটা দরজার দিকে পিছন ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। 'কি হলো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

একটু হেসে আশ্বস্ত করল রানাকে রিটা। 'কিছু না,' নিচু গলায় বলল সে। 'টিনাকে নিয়ে সাংঘাতিক ব্যস্ত তোমার বন্ধু। কী-হোলে চোখ রাখার বা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াবার মত সময় নেই তার।'

'কিন্তু তোমাকে কি বলেছিলাম আমি?'

'কী-হোলে চোখ রাখতে,' অম্লান বদনে বলল রিটা। 'কিন্তু ওরা যা করছে, তা দেখে স্থির থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস না হয়, এসো, নিজের চোখেই দেখো।'

পাঁচ

দু'দিন পরের ঘটনা।

ক্লাস-রুমে যাচ্ছে রানা, পথে দেখা হয়ে গেল ড. সমুদ্র গুপ্তের সাথে।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম,' বলল সমুদ্র গুপ্ত। বড় বড় হলুদ দাঁত বের করে হাসল সে। 'দশ মিনিট পর আমার অফিসে মীটিং। তুমি এলে খুশি হব আমি।'

'নিশ্চয়ই আসব,' বলল রানা। 'ক্লাসটা বসিয়ে দিয়েই আসছি আমি।

'তোমার কাজে আমরা সবাই খুব খুশি, রানা,' বলল গুপ্ত। 'বোরহান তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ আমরা জানি তার মত লোককে সন্তুষ্ট করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

হাসিটা গোপন করল রানা। ওর ওপর সন্তুষ্ট হবার মস্ত কারণ রয়েছে বোরহানের। টিনার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ায় রানাকে সে নিজেই বলেছে, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আবার টিনার সাথে দেখা করার জন্যে ভাদুরে কুকুরের মত হন্যে হয়ে উঠেছে সে। আগামী শনিবারে আবার কিভাবে টিনার কাছে যাওয়া যায় তাই নিয়ে গবেষণা করছে।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কঠিন একটা কোড ডিসাইফার করতে দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল রানা। সমুদ্র গুপ্তের অফিসে যাবার পথে দেখা হয়ে গেল শিবানীর সাথে, সে-ও ওর সাথে মীটিঙে যোগ দিতে যাচ্ছে।

'আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি একসাথে কাজ করতে যাচ্ছি,' রানাকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল শিবানী।

'একটা খবর বটে,' বলল রানা। 'আনন্দে আটখানা হওয়া উচিত আমার?'

'না,' রানার চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি রাখল শিবানী। 'দুঃখে মাথার চুল ছেঁড়ো।'

শিবানীর মাথার দিকে একটা হাত বাড়িয়েও সেটা ফিরিয়ে নিল রানা, বলল, 'থাক, পরে ছিঁড়ব। এখনও সময় হয়নি।'

'সময় হলে দেখা যাবে কারটা কে ছেঁড়ে।' হাসল শিবানী। স্বতঃস্ফূর্ত, আত্মবিশ্বাসে ভরাট হাসি, মনটা কেমন যেন দমে গেল রানার।

সমুদ্র গুপ্তের কামরার দরজায় নক করল শিবানী, ঠেলে উন্মুক্ত করল কবাট দুটো, বিলোল কটাক্ষ হেনে রানাকে আহ্বান জানাল ভেতরে ঢোকার, তারপর নিজে পা বাড়াল সামনের দিকে। তাকে অনুসরণ করে অফিস কামরায় ঢুকল রানা।

ডেস্কের পিছনে, রিভলভিং চেয়ারে ড. সমুদ্র গুপ্ত নয়, অন্য একজন লোক বসে রয়েছে। সুদর্শন, সুপুরুষ, ব্যাকব্রাশ করা চুল, গায়ের রঙটা পাকা আপেলের মত, ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়েস। আর কারও দিকে তাকাবার অবসর পেল না রানা, নবাগত এই যুবক তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। কোথায় যেন দেখেছে, অত্যন্ত চেনা চেনা লাগছে কিন্তু স্মরণে আনতে পারছে না। ডেস্কের পিছনে আরেকটা চেয়ার, তাতে বসে রয়েছে ড. সমুদ্র গুপ্ত। হাত নেড়ে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে যেতে বলল শিবানীকে সে। দরজার পাশে, দেয়াল ঘেঁষে তিনটে চেয়ার, দুটো আগেই দখল হয়ে গেছে, বাকিটায় বসল শিবানী।

'বসো, রানা,' ডেস্কের সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল গুপ্ত। 'তোমার সাথে জরুরী কথা আছে আমাদের।'

ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। কিন্তু বসল না। কামরায় আর যারা রয়েছে তাদের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল একবার। নিঃশব্দ পায়ে পায়চারি করছে বোরহান। খোলা একটা জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যোন কাপালা। হাত দুটো পকেটে ঢোকানো।

ডেস্কের পিছনে বসা নতুন লোকটার দিকে আবার তাকাল রানা। মুঠো করা হাতের আঙুলে ফিলটার টিপড সিগারেট। সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া টানছে। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল লোকটার পরিচয়। পরিষ্কার চিনতে পারছে, কিন্তু এখন আবার আরেক সমস্যা! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। অসম্ভব, এ লোক এখানে আসে কিভাবে!

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' ভরাট, কর্তৃত্বের সুরে বলল নবাগত। 'বসুন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি।'

একচুল নড়ল না রানা। অস্বাভাবিক গম্ভীর সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনার পরিচয়?'

চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল নবাগতের।

'ওনার পরিচয় জানার কোন দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল গুপ্ত। 'উনি লীডারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। যা জিজ্ঞেস করবেন, উত্তর দাও।'

পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে বোরহান। এক পা এগিয়ে এসেছে শ্যেন কাপালা।

গুপ্তের চেহারায় উদ্বেগের ছায়া।

আরও এক পা এগোল রানা। ডেস্কের ওপর হাত দুটো রেখে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। মুঠো করা হাতটা মুখের সামনে থেকে নামাল নবাগত। চোখে অস্বস্তি, কপালে ভ্রূকুটি।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' জলদগম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আমি জানতে চাই, কে এখানে আসতে বলেছে আপনাকে?'

'রানা!' আঁতকে উঠল সমুদ্র গুপ্ত। 'চুপ করো! জানো কার সাথে কথা বলছ তুমি?'

'আপনি চুপ করুন!' প্রায় গর্জে উঠল রানা। সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, বুকে হাত বাঁধল। আবার তাকাল নবাগতের দিকে। 'এখানে কোন্ বুদ্ধিতে এসেছেন আপনি?'

কামরার ভেতর জমাট স্তব্ধতা। পরমুহূর্তে ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল রিভলভিং চেয়ার। উঠে দাঁড়িয়েছে নবাগত যুবক। অপমানে টকটকে লাল হয়ে গেছে মুখের চেহারা।

'মি. খান, আপনি উত্তেজিত হবেন না, প্লীজ,' নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সমুদ্র গুপ্তও। ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল সে। 'রানা, তুমি এখন যেতে পারো। সাংঘাতিক অপরাধ করেছ তুমি, সেজন্যে শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।' বোরহানের দিকে তাকাল সে। 'রানাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, বোরহান।'

মৃদু শব্দে হাসল রানা। 'আমাকে না হয় আপনি শাস্তি দেবেন, কিন্তু এই ভদ্রলোক যে অন্যায় করেছেন, তার বিচার কে করবে?'

'তুমি হেঁয়ালী করছ, রানা,' গম্ভীর গলায় রানার ঠিক পিছন থেকে বলল বোরহান। 'যদি কিছু বলার থাকে তোমার, অল্প কথায় পরিষ্কার করে বলো।'

নবাগতের দিকে তাকাল আবার রানা, ডেস্কের ওপর হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল

সামনের দিকে। 'আপনি একটা টেকনিকালার সাইনবোর্ড, কথাটা বোঝেন না? পিঠে এই সংগঠনের লীডারের পরিচয় লেখা সাইনবোর্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জানেন না?'

'মানে?' রাগ নয়, লোকটার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'এই সংগঠনের লীডার কে?' প্রশ্নটা করে থামল রানা, 'তা আমার জানার কথা নয়, আপনাকে দেখার আগ পর্যন্ত তা আমি জানতামও না। কিন্তু এখন তা আমি জানি। কিভাবে জানলাম, অনুমান করতে পারেন?'

'এসব কি বলছ তুমি, রানা?' পিছন থেকে চাপা কণ্ঠে বলল বোরহান, কিন্তু সবাই তার কথা শুনতে পেল।

'আপনি মনসুর উদ্দীন খান,' বোরহানের কথায় কান না দিয়ে বলে চলেছে রানা, 'একটা ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। আপনার সংগঠনের একটা রাজনৈতিক আদর্শ আছে। কয়েকটা রাজনৈতিক দলের আদর্শের সাথে আপনার সংগঠনের আদর্শ হুবহু মিলে যায়। আপনি এখানকার এই সংগঠনের সাথে জড়িত, এ-কথা জানার পর লীডারের পরিচয় জানতে আর বাকি থাকে কারও? আমার মত আরও অনেক লোক আছে এখানে, যাদেরকে লীডারের পরিচয় জানানো হয়নি। এদের মধ্যে আপনাকে যারা দেখেছে আজ, তারা এই সংগঠনের লীডারের পরিচয় জেনে ফেলেছে, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। কে দায়ী এর জন্যে?'

কামরার ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা।

ছাত্রনেতার দিকে আরও একটু ঝুঁকল রানা। তার চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বলল, 'গোলাম রসুল, মওলানা দস্তগীর, খান আবদুর রউফ, নিশ্চয়ই এই তিনজনের মধ্যে একজন আমাদের এই সংগঠনের নেতা, অস্বীকার করতে পারেন?'

স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করল না মনসুর উদ্দীন খান, কিন্তু তার চোখের পাতা ঘন ঘন কয়েকবার ওঠানামা করতে আর মুখে কালো ছায়া পড়তে দেখে পুলক অনুভব করল রানা, বুঝে নিল, তার অনুমান মিথ্যে নয়। 'এবার বুঝতে পেরেছেন, এখানে এসে কত বড় ভুল করেছেন আপনি? লীডারের পরিচয় এখন আর গোপন কোন ব্যাপার নয়। এখন যদি বলি, আপনাদের বোকামির জন্যে এই সংগঠনের সাথে জড়িত প্রত্যেকটি মানুষ ডুববে, লীডার ধরা পড়বে—আমরা সবাই মারা পড়ব, সেটা কি অন্যায় বলা হবে?'

ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল মনসুর খান। সিগারেট ধরাচ্ছে সে, হাত দুটো কাঁপছে। কামরার ভেতর নিঃশ্বাস পতনের শব্দও নেই। নিস্তব্ধতা ভাঙল ড. সমুদ্র গুপ্ত, 'তোমার ওটা অনুমান, রানা, সত্যি নাও হতে পারে...'

'কিন্তু রানার কথায় যুক্তি আছে,' গুপ্তকে বাধা দিয়ে বলল বোরহান। 'সংগঠনের ভালর জন্যেই এত কথা বলছে ও। আরও সাবধান হওয়া উচিত আমাদের। মি. খানকে এখানে আমাদের ডেকে পাঠানো উচিত হয়নি। এসব কথা লীডার যদি জানতে পারেন, তার পরিণতি কি হতে পারে তা আমরা সবাই জানি। লীডার বোকামি বা অযোগ্যতা ক্ষমা করেন না।'

'ধন্যবাদ, মি. রানা,' কাঁপা গলায় বলল মনসুর খান। 'আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। যা হবার হয়ে গেছে, এ-ধরনের ভুল আর যাতে না হয় সেদিকে আমরা সবাই এখন থেকে নজর রাখব। বসুন। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি। আজ আপনার পরিচয় পেলাম। আপনার মত লোক পেয়ে আমাদের সংগঠন গর্বিত। লীডারকে আমি আপনার কথা বলব।' উঠে দাঁড়াল সে। 'এখানে আর কোন কাজ নেই আমার। আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, মি. রানা, আমার বিশ্বাস আপনি তা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন,' ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এল সে। দাঁড়াল রানার সামনে। হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। রানার হাতটা ধরে আন্তরিকভাবে ঝাঁকিয়ে দিল সে। একটু হাসি ফুটল মুখে। বলল, 'খোদা হাফেজ।'

আর কারও দিকে না তাকিয়ে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মনসুর খান।

সবাই নড়েচড়ে উঠল এতক্ষণে। নিজের রিভলভিং চেয়ারটায় বসল ড. সমুদ্র গুপ্ত। আবার পায়চারি শুরু করল বোরহান। পিছিয়ে গিয়ে জানালার পাশে, দেয়ালে হেলান দিল শ্যেন কাপালা। শুধু দেয়াল ঘেঁষে বসা অপরিচিত লোক দু'জন আর শিবানীর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে ওরা।

ধীরে ধীরে ডেস্কের সামনের একমাত্র চেয়ারটায় বসল রানা। এতক্ষণে অপরিচিত লোক দুটোর দিকে লক্ষ দিল ও। প্রথম লোকটার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, একটু বেঁটে, রোগা-পাতলা, শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে আছে মাথার চুল, চোখে স্টীল রিমের চশমা। নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমাটা, ফ্রেমের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। দাড়ি কামিয়েছে লোকটা, কিন্তু অযত্নের চিহ্ন হিসেবে মুখের এখানে সেখানে কয়েক রোঁয়া এখনও রয়ে গেছে। পরনে ফ্লানেলের একটা স্যুট, সুতো বেরিয়ে পড়েছে।

তার সঙ্গীর বয়স কম, আঠারো-উনিশ বছরের যুবক। এর চেহারাতেও নোংরা, আগোছাল ভাব রয়েছে। চুলগুলো লম্বা, একদিকের কপালসহ বাঁ দিকের একটা চোখ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। দীর্ঘকায়, গড়নটা একহারা, ছুঁচোর মত সরু মুখ। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, নাকটা খাড়া। বয়স অল্প হলে কি হবে, তার চেহারায় ইঁচড়ে পাকা একটা ভাব দৃষ্টি এড়াবার নয়। এখানকার এই পরিবেশের সাথে দু'জনের একজনকেও মানাচ্ছে না। ড. সমুদ্র গুপ্তের কামরায় এরা করছেটা কি?

'এবার কাজের কথা শুরু হোক,' বলল গুপ্ত। 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কর্নেল শফিকে মারতে হবে। কাজটা এখনও তুমি করতে চাও, রানা?'

মাথা কাত করল রানা। 'অবশ্যই।'

'তাহলে আজ থেকে দশদিন পর। বিশ তারিখে। তোমার শর্ত আমরা মেনে নিয়েছি। পাঁচ লাখ টাকাই দেয়া হবে তোমাকে। কিন্তু কাজটা শেষ হবার পরই শুধু টাকা পাবে তুমি, তার আগে...'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'তাতে আমি রাজী নই। অর্ধেক টাকা কাজ শুরু

করার আগেই দিতে হবে আমাকে।'

'তুমি কি আমাদেরকে অবিশ্বাস করো?'

'প্রশ্নটা আমিও তো করতে পারি!' বলল রানা। 'কিন্তু তা আমি করছি না। এটা আমার পেশা। নিজস্ব কিছু নিয়মে আমি চলি। আমাকে দিয়ে কাজ করাতে হলে আমার নিয়ম ধরেই এগোতে হবে আপনাদেরকে।'

'ঠিক আছে, এ নিয়ে এত তর্কাতর্কির কোন দরকার নেই,' অধৈর্যের সাথে বলল বোরহান। 'কাজের কথা শেষ হোক, তারপর একটা আপোষ রফায় আসা যাবে।'

'আমাদের এখন জানার বিষয় একটাই,' বলল গুপ্ত, 'কাজটা তুমি করতে পারবে তো?'

হাসল রানা। 'আমি না পারলে আর কেউ পারবে না।'

'কিভাবে করতে চাও, আমাদেরকে একটু শোনাও,' বলল শ্যেন কাপালা। 'এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই অনেক চিন্তা ভাবনা করেছ তুমি? তোমার কাজের মেথডটা কি হবে?'

'করেছি,' বলল রানা। 'মেথডটা পানির মত সহজ। কঠিন আর বিপজ্জনক হলো সেটাকে কাজে রূপ দেয়া।'

'এরা তিনজন তোমাকে সাহায্য করবে,' বলল সমুদ্র গুপ্ত, হাত নেড়ে শিবানী আর তার পাশে বসা লোক দু'জনকে দেখাল সে। 'এর নাম সগীর,' চশমা পরা বেঁটের দিকে একটা আঙুল তুলল। তারপর অল্প বয়েসীটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম টিপু। দু'জনেই রিভলভার চালাতে ওস্তাদ। এ লাইনে এদের চেয়ে ভাল আর কাউকে পাবে না তুমি। আর শিবানী তোমাদের সাথে থাকবে গাড়ি চালাবার জন্যে।'

সগীর আর টিপুর দিকে ফিরে ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। দু'জনের কারও চেহারাতেই ভাবের লেশমাত্র নেই। রানার মাথা নাড়ার উত্তরে সগীর তবু যাই হোক একবার পাল্টা মাথা নেড়ে সাড়া দিল, কিন্তু টিপু স্বীকৃতির কোন আভাস পর্যন্ত দিল না।

'কিন্তু এদের তিনজনকেই পরীক্ষা করব আমি,' বলল রানা। 'এরা যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে তবেই, তা নাহলে অন্য লোক চাইব আমি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর ভয়ঙ্কর প্রকৃতির কাজ এটা, কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। কারও কোন আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কিসের?' বলল বোরহান। 'কাজটার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তোমার, কাজেই কাকে তুমি নেবে আর কাকে নেবে না তা ঠিক করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তোমার। এদের ব্যাপারে আমরা অবশ্য গ্যারান্টি দিতে পারি তোমাকে, কিন্তু তুমি যদি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাও, তাতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই।'

'গুড,' বলল রানা। 'আজ বিকেলেই এদেরকে পরীক্ষা করব আমি।'

'তোমার পরিকল্পনাটা জানতে চাই আমি,' বলল শ্যেন কাপালা। 'কাজটা

তুমি কিভাবে করতে চাইছ?'

শিবানী, সগীর আর টিপুর দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'এদেরকে আমি নিই কি না নিই তা এখনও ঠিক হয়নি, তাই প্ল্যানটা আমি এদের সামনে আলোচনা করতে চাই না। বাইরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করুক এরা।'

সাথে সাথে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সগীর, পা বাড়াল দরজার দিকে। কিন্তু শিবানী আর টিপু ইতস্তত করছে। ড. সমুদ্র গুপ্তের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। অপেক্ষা করছে রানার হুকুমের ওপর তার কিছু বলার আছে কিনা শোনার জন্যে।

'গেট আউট!' গর্জে উঠল বোরহান। 'রানার কথা কানে যায়নি তোমাদের?'

'থামো!' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। 'সমস্ত ব্যাপারটা এখুনি আমি বুঝে নিতে চাই। এরা তিনজন সম্পূর্ণ আমার অধীনে থাকবে। আমি যা করতে বলব তাই করতে হবে, আমার কথার ওপর কথা বলা চলবে না। এটা যদি মেনে নিতে পারে ওরা, তবেই এতবড় একটা দায়িত্ব মাথায় নেব আমি। আমার নির্দেশই চূড়ান্ত, এমন কি কেউ কোন প্রশ্ন তুললেও শাস্তি পেতে হবে তাকে।'

'হ্যাঁ,' বলল শ্যেন কাপালা। 'তোমার সাথে আমরা একমত।' তিনজনের দিকে তাকাল সে। 'বুঝতে পারছ তো? রানার কথায় চলতে হবে তোমাদেরকে।'

হাসল শিবানী। চেহারায় সবজান্তার একটা ভাব। বাকি দু'জন নিষ্প্রাণ পাথরের মত তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ঠিক আছে,' ওদের তিনজনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা এবার বাইরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

নিজের চেয়ারে বসল রানা। 'প্ল্যানটা বলছি,' বলল ও। 'শশীভূষণ লেনের একটা বাড়িতে থাকে কর্নেল শফি। নিউমার্কেট ওভারব্রিজ থেকে পায়ে হেঁটে দু'মিনিটের রাস্তা। শশীভূষণ লেনে মাত্র বারোটা বাড়ি আছে, এক এক দিকে ছ'টা করে। উত্তর প্রান্তটা মিলেছে গোলাপ কুঁড়ি লেনে, আর দক্ষিণ প্রান্তটা মিলেছে বাদশা লেনে। শশীভূষণ লেনটা নির্জন, পরিচ্ছন্ন। দোকান-পাট বা আর কোন ঝামেলা নেই। বাদশা লেন থেকে ঢোকার সময় দ্বিতীয় বাড়িটাই কর্নেল শফির।' ডেস্ক থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল তুলে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। 'নকশা এঁকে দেখাচ্ছি।' দ্রুত একটা স্কেচ আঁকল। শ্যেন কাপালা আর বোরহান এগিয়ে এসে ওর দু'পাশে দাঁড়াল স্কেচটা দেখার জন্যে। 'রোজ রাত দশটার সময় বাড়ি ছেড়ে একবার বেরোয় শফি, রাতের খাবারটা যাতে হজম হয় তার জন্যে একটু হাঁটাহাঁটি করে। এটা তার অনেক দিনের পুরানো অভ্যাস।'

'অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা অভ্যাস, সন্দেহ নেই,' ঘন ভুরু সামান্য একটু তুলে বিস্ময় প্রকাশ করল সমুদ্র গুপ্ত।

'তা ঠিক বলা যায় না,' বলল রানা। 'খুব কম লোককে বিশ্বাস করে শফি, তাদের মধ্যেও মাত্র দু'একজন জানে তার বাড়ির ঠিকানা। তাছাড়া, নিজেকে রক্ষা করতে জানে শফি।'

'ঠিক কি বলতে চাইছ?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল শ্যেন কাপালা।

'শফির চেয়ে ভাল পিস্তল চালাতে জানে এমন লোক দেশে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ,' বলল রানা। 'ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী লোক, তেমনি সাবধানী। এক মাইল দূর থেকে বিপদের গন্ধ পায়। তুমি চোখের পাতা ফেলার আগেই পিস্তল টেনে গুলি করতে পারে। ভেব না বাড়িয়ে বলছি আমি। শফিকে আমি চিনি, সেজন্যেই বলছি, কাজটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। কাজটা শেষ করে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, যদি ঘড়ির কাঁটা ধরে খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ করা না হয়। তবু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি না আদৌ কেউ ফিরে আসতে পারব কিনা।' একটু বিরতি নিল ও, তারপর আবার বলল, 'অন্তত কেউ না কেউ মারাত্মকভাবে জখম তো হবই।'

'কিন্তু আমরা যদি অকস্মাৎ আক্রমণ করি...' শুরু করল শ্যেন কাপালা।

হেসে উঠল রানা। 'অকস্মাৎ, আচমকা, এসব কোন ব্যাপারই নয় শফির কাছে—কিছুই অপ্রত্যাশিত নয় তার কাছে। জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি থাকে সে। একজন তার দৃষ্টি এবং গুলি আকর্ষণ করবে, অপরজন তার খুলি উড়িয়ে দেবে, এখানেই আমাদের একমাত্র আশা। কিন্তু এ বিষয়ে টিপু বা সগীরের সাথে আলোচনা করার দরকার নেই। তবে, তোমরা ধরে নিতে পারো, দু'জনের একজন ফিরে আসছে না।'

'শফি মারা যাবার বদলে সেটা তেমন কিছু নয়,' নির্দয় হাসি দেখা গেল বোরহানের ঠোঁটে। 'দু'জনের একজনও যদি ফিরে না আসে, তাতেও আমার কিছু এসে যায় না।'

'তখন আবার বলো না যে আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিইনি,' সিগারেট ধরাল রানা। 'আমি শুধু একটা ব্যাপারে তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারি, শফি নির্ঘাত মারা যাবে। কিন্তু তার মৃত্যুর বদলে আমরা হয়তো একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না। তবে, শিবানীর কথা আলাদা। সে তো গাড়িতে থাকবে। এবার স্কেচটার দিকে তাকাও। এই যে, এখানে এটা শফির বাড়ি। বাড়িটার সদর দরজা থেকে কয়েক গজ দূরে এটা একটা পিলার বক্স, রাস্তার উল্টো দিকে। এই বক্সের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে টিপু। শফির বাড়ির দিকে এটা একটা টেলিফোন-এর পোল, এই পোল বেয়ে এর মাথায় উঠে বসে থাকব আমি, ছেঁড়া তার জোড়া লাগাবার ভান করব। সাথে এক সেট রিসিভার থাকবে। ওখান থেকে গোটা রাস্তা আর বাড়িটার ওপর পরিষ্কার নজর রাখতে পারব আমি। টিপু বা সগীর শফিকে চেনে না। কিন্তু কোনরকম ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি থাকলে চলবে না। বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে এলেই সঙ্কেত দেব আমি। সগীর গা ঢাকা দেবে এই গাছটার পাশে। শফি তাকে পুরোপুরি দেখতে পাবে। তার ভাগ্য খারাপ, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাকে দেখে শফি সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে বুঝে নেবে, এই আমি চাই। শফির সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকবে সগীরের ওপর। আমি আশা করছি, টিপুকে শফি দেখতেই পাবে না। প্রথমে গুলি করবে সগীর। অবশ্য সে-সুযোগ যদি তাকে দেয় শফি। প্রায় ধরেই নেয়া যায়, প্রথম গুলি শফির পিস্তল থেকেই বেরুবে। যাই হোক, শফির মনোযোগ যখন সগীরের দিকে নিবদ্ধ, এই

সুযোগে কাজ হাসিল করবে টিপু। দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া যাবে না। টিপু ব্যর্থ হলে আমরা সবাই ডুবব। সেজন্যেই ওদের লক্ষ্যভেদ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছি আমি।'

'লক্ষ্যভেদে ওরা অব্যর্থ,' বলল বোরহান। 'তবু নিজের সন্তুষ্টির জন্যে ওদেরকে তুমি যেভাবে খুশি পরীক্ষা করে নাও।'

'বেশ। কিন্তু পালিয়ে আসার কথা কি ভেবেছ তুমি?' প্রশ্ন করল গুপ্ত।

স্কেচটার ওপর টোকা মারল রানা। 'গাড়ি নিয়ে গোলাপ কুঁড়ি লেনের মুখে থাকবে শিবানী,' বলল ও। 'হেডলাইট অফ করা থাকবে গাড়ির। গোলাগুলি শেষ করে আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠব, গোলাপ কুঁড়ি লেন থেকে বেরিয়ে আমাদেরকে এলিফ্যান্ট রোডে নিয়ে আসবে শিবানী। বলাকার সামনে আরেকটা গাড়ি চাই আমি। এলিফ্যান্ট রোডের মোড়ে শিবানীর গাড়ি থেকে নেমে পড়ব আমরা, ছড়িয়ে পড়ব চারদিকে। আবার আমরা মিলিত হব বলাকার সামনে দ্বিতীয় গাড়িতে। কেউ যদি অনুসরণ করে, তাহলে আমি শুধু একা দ্বিতীয় গাড়িতে উঠব, বাকি সবাই যে যেদিকে পারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। শিবানী চলে যাবে উল্টোদিকে, পিজি হাসপাতালের মোড়ে অপেক্ষা করবে সে। টিপু অপেক্ষা করবে ঢাকা ক্লাবের গেটের কাছে। আর সগীর দাঁড়িয়ে থাকবে প্রেস ক্লাবের সামনে। আসার পথে ওদেরকে আমরা তুলে নেব।' বোরহানের দিকে তাকাল ও। 'দ্বিতীয় গাড়িটা তুমি চালাবে?'

'অবশ্যই।' কাজটার মধ্যে নিজেরও একটা ভূমিকা পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে বোরহান।

'কিন্তু আমি ভাবছি,' বলল শ্যেন কাপালা, 'সগীর শিবানীর গাড়িতে থাকলে ভাল হত না? গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে মারা পড়বে সে। গাড়ি থেকে গুলি করলে কিছুটা আড়াল পাবে···'

নির্দয় একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'সগীরকে হারাতে যাচ্ছি, এটা ধরে নিয়েই কাজে হাত দিতে হবে আমাদেরকে,' বলল ও। 'বাড়ির সামনে একটা পার্ক করা গাড়ি দেখলে হয় শফি বাইরেই বেরুবে না, নয়তো গুলি করতে করতে বেরিয়ে আসবে—তার মানে, কোনভাবেই তাকে গুলি করার কোন সুযোগ সগীর পাচ্ছে না। তাছাড়া, পার্ক করা গাড়িটা বাধা হয়ে দেখা দেবে টিপুর জন্যে, গুলি করার কোন সুযোগই পাবে না সে। শফি একটা আড়াল পেয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছে ও,' অধৈর্যের সাথে বলল বোরহান। 'প্ল্যানটা নিখুঁত। এর চেয়ে ভাল আর কিছু আশা করা যায় না। আমি এটা অনুমোদন করি।'

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় সায় দিল গুপ্ত।

শেষ পর্যন্ত খানিক ইতস্তত করে সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল শ্যেন কাপালাও। 'বেশ, ঠিক আছে। আমিও সন্তুষ্ট। কবে নাগাদ তৈরি হচ্ছ তুমি?'

'এক হপ্তা সময় লাগবে আমার। এই কদিন ট্রেনিং দেব ওদেরকে আমি। রিহার্সেলের ব্যবস্থা করতে হবে। যাকে ইচ্ছে সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারব তো?'

'যা ভাল মনে হয় করো,' রুমাল দিয়ে নাকের ডগা মুছছে গুপ্ত।

'ওই জায়গাটা নিজের চোখে দেখা দরকার ওদের,' বলল রানা। 'বাড়ি আর রাস্তাটা দেখার জন্যে ওদেরকে যদি আলাদা আলাদাভাবে পাঠাই, কোন আপত্তি নেই তো?'

'নেই,' বলল শ্যেন কাপালা।

'কিন্তু তোমরা বোধহয় আমাকে ওখানে যেতে দেবে না একা?'

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল গুপ্ত। 'কিছু মনে করো না, রানা,' নরম গলায় বলল সে। 'এই অ্যাসাইনমেন্টটা সাফল্যের সাথে শেষ করো, তোমার ওপর থেকে সব রকম বাধা-নিষেধ তুলে নেয়া হবে। আমার মনে হয় তুমিও একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে শফি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমাকে একা ছেড়ে দেয়া আমাদের জন্যে একটু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'রাস্তাটা আমি ভাল করে চিনি, ওখানে যাবার আমার কোন দরকার নেই।' আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। 'এখন শুধু আমার ফী সম্পর্কে একটু আলোচনা। কি কথা হয়েছিল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ লাখ টাকা চেয়েছিলাম। আপনারা তাতে রাজী হয়েছেন। আড়াই লাখ এখুনি দিতে হবে আমাকে, বাকি আড়াই লাখ কাজ শেষ হলে।'

'উঁহু,' দ্রুত বলল শ্যেন কাপালা। 'কাজ শেষ হলে পেমেন্ট। দুঃখিত, রানা। এ-ধরনের ব্যাপারে তোমার বদনাম আছে, আমরা ঝুঁকি নিতে পারি না। অর্ধেক টাকা নিয়ে কেটে পড়ার...'

'কিন্তু,' বলল গুপ্ত, 'রানাকে আমরা একটু কনসিডার করতে পারি। এরই মধ্যে আমাদের অনেক ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে যথেষ্ট উপকার করেছে ও। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, ওকে আমরা এই সংগঠনের একজন সদস্য বলে মেনে নিয়েছি। ও যদি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারে, আমাদেরও উচিত ওকে বিশ্বাস করা।'

'আমি একমত,' বলল বোরহান।

কিন্তু শ্যেন কাপালা এখনও ইতস্তত করছে।

'এখানে আমার একটা কথা বলার আছে,' বলল রানা। 'ঝুঁকিটা তোমরা কেউ নিতে যাচ্ছ না, ঝুঁকি নিচ্ছি আমি। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সাথে সারাক্ষণ একজন লোক দিচ্ছ তোমরা। তারপরও কিসের এত ভয় তোমাদের, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল শ্যেন কাপালা। 'দিয়ে দাও টাকা।'

'পরশু দিন আড়াই লাখ টাকা ক্যাশ দেব তোমাকে আমি,' বলল গুপ্ত। 'ঠিক আছে তো?'

'চলবে। সাথে যদি কেউ থাকে, টাকা জমা দেয়ার জন্যে আমার ব্যাংকে যেতে পারব তো আমি?' ঘাড় ফিরিয়ে বোরহানের দিকে তাকাল রানা।

'তোমার সাথে আমি যাব,' দ্রুত বলল বোরহান।

অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এসে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল বোরহান।

'ব্যাংকের কাজ সেরে অনায়াসে টিনাদের বাড়িতে যেতে পারি আমরা, তাই না?'

খানিক ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'হাতে যদি যথেষ্ট সময় থাকে, আর...'

'আর?'

হাসল রানা। 'টিনারা যদি বাড়ি থাকে তবে তো?'

'আজই ফোন করে ওদেরকে বাড়ি থাকতে বলে দিলে হয় না?'

'তা হয়,' দ্রুত চিন্তা করছে রানা। 'কিন্তু এখান থেকে ফোন করাটা কি উচিত হবে?'

রানার কাঁধ চাপড়ে দিল বোরহান। 'আরে, তাই তো! এখান থেকে ফোন করলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। না। ঠিক আছে, পরশুদিন সরাসরি ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠব, তারপর দেখা যাবে কপালে কি আছে। কি বলো?'

'হ্যাঁ,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'সেটাই ভাল।' টিনারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে দেখে বোরহানের কি প্রতিক্রিয়া হবে তাই ভাবছে ও।

একটা মডেল নিয়ে রানার কামরায় ঢুকল সগীর। টেবিলের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে বলল, 'এই নিন। চেক করে দেখুন ঠিক এই রকমই চেয়েছিলেন কিনা।'

মডেলটা নেড়েচেড়ে দেখল রানা। ঠিক এই জিনিসই চেয়েছিল ও।

মীটিঙের পর তিনদিন পেরিয়ে গেছে। গতকাল ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়েছিল ও। ব্যাংকের একজন পরিচিত কেরানীকে ত্রিশ টাকা বখশীশ দিয়ে পপির নামে বোর্ডিং স্কুলে এক হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে বোরহান।

তাড়াহুড়ো করে একটা ব্যাখ্যা দেবার জন্যে তাকে রানা বলেছে, 'কানিজের ওই মেয়েটা আসলে আমারই। কানিজ যখন বেঁচে নেই, দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হচ্ছে।'

হো হো করে হেসেছে বোরহান। 'কানিজ বলল আর তুমিও সেই কথা বিশ্বাস করে বসে আছ? দেখো গে যাও, তোমার মত আরও অনেকে মনে করছে পপি তাদের বাচ্চা।'

'সে যাই হোক, মাসুম একটা বাচ্চাকে কিছু টাকা দিলে আমি তো আর ফকির হয়ে যাব না।'

ব্যাংক থেকেই টিনাদের বাড়িতে ফোন করার অভিনয় করেছিল রানা। বিধি মত ডায়াল করেছিল ও। ভেবেছিল রিসিভার তুলবে না কেউ। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, বোরহানকে বলবে টিনারা বাড়িতে নেই। কিন্তু অপর প্রান্তে রিসিভার তুলল একজন লোক। 'আমি ডিউক বলছি, টিনা বা রিটাকে চাই,' বলেছিল রানা।।

অপর প্রান্ত থেকে লোকটা বলল, 'ওরা এখানে কেউ নেই। আপনি কে বলছেন?'

'ডিউক,' আবার বলল রানা। লোকটার গলা চিনতে পেরেছে। কর্নেলের প্রতি

কৃতজ্ঞতা অনুভব করল ও। খালি বাড়িতে অফিসের একজন লোককে মোতায়েন রেখেছেন তিনি। 'শোনো, রিটা, আমি আর আমার সেই বন্ধু তোমাদের বাড়িতে আসছি।··· কি বললে? পাড়ার বখাটে ছেলেরা টের পেয়ে গেছে? ওরা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, গোলমাল পাকাবে?···আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেই ভাল···হোটেলেই। কোন্ হোটেলে··· গোল্ডেন সান, হ্যাঁ। টিনাকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে যাও তুমি। আমরাও রওনা হচ্ছি···হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুটো কামরা ভাড়া নিচ্ছি আমরা। রাখলাম।' এন.এস.আই-এর লোকটাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল রানা। বোরহানের দিকে ফিরে বলেছিল, 'টিনাদের বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না, গোল্ডেন সানে আসছে ওরা।' বোরহানের প্রতিক্রিয়াটা ভাল করে লক্ষ করেনি ও। ভাবছিল, কর্নেল শফির লোকটা বুদ্ধি করে টিনাদেরকে খবরটা পৌঁছে দেবে কিনা।

গোল্ডেন সানে পৌঁছে আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওদেরকে। টিনা আর রিটা একসাথেই পৌঁচেছিল। হোটেল থেকে কর্নেল শফিকে ফোন করতে কোন অসুবিধেই হয়নি রানার। হত্যা-ষড়যন্ত্রের গোটা প্ল্যানটা হুবহু বলে গেল রানা, কিছুই বাদ দেয়নি। সতর্ক না হলে বিপজ্জনক একটা কিছু ঘটতে পারে, বার বার মনে করিয়ে দিল কথাটা। তবে, কর্নেলকে এতটুকু বিচলিত বলে মনে হলো না। নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অটল আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাঁর।

'তুমি টিপুর দিকে নজর রেখো,' রানাকে তিনি বলেছেন। 'আমি সগীরের ওপর নজর রাখব।'

'কাছেপিঠে পুলিস কার রাখার ব্যবস্থা করবেন,' বলেছে রানা। 'শিবানীকে অবহেলা করবেন না। শুনেছি, ওর মত ঝানু ড্রাইভার আর হয় না। ও যদি পালিয়ে যায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

কর্নেল ওকে জানিয়েছেন, তাঁর দিকের সমস্ত ব্যাপার সুচারুভাবে সামলাবেন তিনি, রানা যেন নিজের দিকটা সামলায়।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার নিয়ে শিবানীর সাথে গোলমাল দেখা দিয়েছে রানার। সিদ্ধান্ত হয়েছে, গাড়িতে থাকবে শিবানী। সিদ্ধান্তটা মেনে নিয়েছে শিবানী। কিন্তু গোঁ ধরেছে, তার কাছেও একটা রিভলভার থাকতে হবে। কড়াভাবে প্রতিবাদ করেছে রানা। যদিও বোরহান বা গুপ্তের কানে শিবানীর এই আবদার এখনও পৌঁছায়নি। ব্যাপারটা নিয়ে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় আছে রানা। শিবানীর হাতে অস্ত্র থাকলে সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে ওর।

টিপু আর সগীরকে পরীক্ষা করে মনে মনে সামান্য দমে গেছে রানা। বোরহান ঠিকই বলেছিল, লক্ষ্য ভেদে অব্যর্থ ওরা। তবে, আশার কথা এইটুকু যে দু'জনের একজনও কর্নেলের মত অতটা নিখুঁত বা দ্রুত নয়। বোরহানকে অবশ্য ঠিক উল্টো কথা বলেছে রানা। আসল ভয় ওর শিবানীকে নিয়ে। টিপু আর সগীরের চেয়ে অনেক ভাল রিভলভার চালায় সে। আর এমনভাবে গাড়ি চালায়, তুলনা হয় না। টয়োটার মত মাঝারি আকারের একটা গাড়িকে সত্তর মাইল স্পীডে সরু গলির ভেতর দিয়ে অনায়াসে, হাসতে হাসতে চালাতে দেখে মাথার চুল খাড়া হয়ে

গিয়েছিল রানার। দূরত্বের হিসাব অনুমান করতে তার জুড়ি মেলা ভার। পুরানো শহরের আঁকাবাঁকা গলি থেকে ষাট মাইল স্পীডে বাঁক নেয়া কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব, ভাবতে পারে না রানা। 'কিভাবে টিকটিকি খসাতে হয় জানো?' কথা শেষ করে ওয়ান ওয়ে রাস্তার পাশের আইল্যাণ্ড টপকে উল্টো দিকের রাস্তায় একাধিক বার চলে এসেছে শিবানী। অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেছে রানা। পিছনের সীটে বসে খিকখিক করে হেসেছে বোরহান। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনের মস্ত আইল্যাণ্ডটাকে ষাট মাইল স্পীডে বারবার চক্কর মেরে আরেকবার চমকে দিয়েছে শিবানী ওকে। মতিঝিলের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে জানতে চেয়েছে, 'বলো, তো, কতবার চক্কর মারলাম আইল্যাণ্ডটাকে?'

'পাঁচবার,' ঢোক গিলে বলেছে রানা।

বোরহান আর শিবানী দু'জনেই হেসে উঠেছে রানার কথা শুনে। ওর ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছে বোরহান। 'উহুঁ, পাঁচবার নয়। সাতবার।'

শিবানী অবিশ্বাস্য! তার তুলনা হয় না। পুলিস তাকে কিভাবে আটকাবে তাই নিয়ে যত দুশ্চিন্তা এখন রানার। কর্নেলকে সাবধান করে দিয়েছে ও, কিন্তু তবু সংশয় দূর হচ্ছে না মন থেকে।

শশীভূষণ লেনের একটা মডেল চেয়েছিল রানা। রাস্তাটার কোথায় কি আছে সব নখদর্পণে রাখার জন্যে দরকার ওটা। সগীর যেচে পড়ে মডেল তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিল। মাত্র দু'দিনের মধ্যে জিনিসটা তৈরি করে এনেছে সে। নেড়েচেড়ে দেখে জিনিসটার প্রশংসা করল ও। মুখে কিছু বলল না সগীর, কিন্তু তার চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠতে দেখল রানা।

এদের মধ্যে সগীরকে তবু যা হোক একটু সহ্য করতে পারে রানা। কিন্তু তিনজনের মধ্যে সেই আবার সবচেয়ে বিপজ্জনক ফ্যানাটিক। টিপুকে পছন্দ করে না ও। বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারে নেই, আছে শুধু খুন করার ভয়ঙ্কর লালসা। চোখ দুটো সব সময় চক চক করছে, চেহারায় পৈশাচিক উল্লাসের ছাপ। ফার্মের পিছন দিকের ফাঁকা মাঠে টার্গেট প্র্যাকটিস করে সময় কাটে তার, আর যখন প্র্যাকটিস করে না, এক ঝটকায় বেল্ট থেকে রিভলভার টেনে বের করাই তার একমাত্র কাজ। সারাটা দিন এ-ই করছে সে।

মডেলটা পাবার পর জোরেশোরে রিহার্সেল শুরু করেছে রানা। কর্নেল শফির ভূমিকায় নঈমকে দাঁড় করিয়েছে ও। রিভলভার ছোঁড়ার ব্যাপারে সগীর বা টিপুর চেয়ে কম যায় না সে, প্রথম গুলি বেশ কয়েকবার তার রিভলভার থেকেই বের হলো। রিহার্সেলের ব্যাপারটা জানাজানি হতে খুব বেশি সময় নেয়নি, প্রতিদিনই দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে। বিদেশী কিছু সুটেড বুটেড লোকও রিহার্সেল দেখতে আসে। এদেরকে আগে কখনও দেখেনি রানা, কিন্তু আচার-আচরণ দেখে বুঝতে পারে বোরহান বা ড. সমুদ্র গুপ্তের চেয়ে বড় পদের অধিকারী এরা। এদের সাথে প্রায়ই হয় বোরহান বা গুপ্ত থাকে। কিন্তু তারা কেউ রানার সাথে এদের পরিচয় করিয়ে দেয় না, রানাও কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করে না। পরিচয় করিয়ে না দিলেও, এদের অনেকের নাম জেনে ফেলেছে ও, সেই সাথে চেহারাগুলো মনে

গেঁথে রেখেছে। কেউ চাইলেই এদের ছবি তৈরি করে দিতে পারবে ও আইডেন্টি কিটের সাহায্যে।

ফার্মের পিছন দিকে কাঠ, ইঁট ইত্যাদি দিয়ে নকল একটা শশীভূষণ লেন তৈরি করেছে রানা। রাস্তার ওপর পিলার বক্স, টেলিফোনের পোল এবং গাছ আছে। কর্নেল শফির বাড়ির সদর দরজা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাগানের একটা গেট।

হত্যানুষ্ঠানের দৃশ্যটা বারবার মঞ্চস্থ করছে রানা। পোলের ওপর চড়ে দেখে নিচ্ছে পিলার বক্সের আড়ালে কিভাবে গা ঢাকা দিয়ে আছে টিপু। গোটা অপারেশনের মধ্যে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কর্নেলকে গুলি করার কোন সুযোগ টিপুকে দিতে চায় না রানা, তার আগেই সচল করে দিতে হবে ছোকরাকে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে শিবানী। গাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার ভূমিকাটা পছন্দ নয় তার, বারবার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ধমক মেরে তাকে নিরাশ করার চেষ্টা করেছে রানা, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। আশ্চর্য একটা অস্থিরতা লক্ষ করছে রানা তার মধ্যে।

আজও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো।

পিলার বক্সের আরও বাঁ দিকে টিপুকে সরে আসার জন্যে বলল রানা, তাকে যাতে ভাল করে দেখতে পায় ও, ঠিক এই সময় গাড়ি থেকে নেমে সোজা হেঁটে এসে ওর সামনে দাঁড়াল শিবানী। ভুরু কুঁচকে তাকাল ও।

'গাড়ি ছেড়ে কে আসতে বলল তোমাকে?'

রানার চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ হাসল শিবানী। 'আমার একটা সাজেশন আছে।'

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল বোরহান, এগিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিল সে। 'কি ব্যাপার?'

'টিপুকে কাভার দিতে চাই আমি,' সরাসরি, স্পষ্ট গলায় বলল শিবানী। 'প্রথম গুলি সগীর করবে। তারপর টিপু। সব শেষে গাড়ি থেকে আমি গুলি করতে চাই। আইডিয়াটা ভাল নয়?'

'না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'তোমার কাজ গাড়িটা চালানো, তুমি শুধু ওই ব্যাপারে মাথা ঘামাবে। টিপুকে কাভার দেবার কোন দরকার নেই। গাড়ি ছেড়ে নামা চলবে না তোমার, ইঞ্জিন চালু রেখে সজাগ থাকাই তোমার কাজ।'

রাগে লাল হয়ে উঠল শিবানীর চেহারা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না সাথে সাথে। বোরহানের দিকে তাকাল সে। কিন্তু বোরহান তাকে কোন উৎসাহ দিল না। কাঁধ ঝাঁকাল শিবানী। 'বেশ। কিন্তু এই যে তোমরা আমার কথা শুনছ না, এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাদেরকে। আমি এখনও মনে করি, আমার হাতে একটা রিভলভার থাকার দরকার আছে।'

'নেই,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'তুমি এখন গাড়িতে ফিরে যেতে পারো।

ঘুরে দাঁড়াল শিবানী। নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছে। পিঠটা আড়ষ্ট।

'এত করে যখন চাইছে, ওকে কাজে লাগালে হত না?' শিবানী একটু দূরে

যাবার পর প্রশ্ন করল বোরহান। 'তোমার কথা মত সত্যি যদি অতটা ভয়ঙ্কর হয় শফি, দুটোর জায়গায় তিনটে রিভলভার হলে ভাল হত না?'

'ওর কাজ গাড়ি চালাবার দিকে মনোযোগ দেয়া,' বলল রানা। কর্নেলের বিরুদ্ধে তিনজন প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতে দেবে না ও। ধড়ফড় করছে বুক। 'এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবার ওপর নির্ভর করবে আমাদের জীবন-মৃত্যু। গোলাগুলিতে অংশগ্রহণ করলে গাড়ি চালাবার সময় মাথা ঠিক রাখতে পারবে না ও, শুধু ওর ব্যর্থতার জন্যে সব ক'জন মারা পড়ব আমরা। উহুঁ, এতবড় ঝুঁকি নিতে রাজী নই আমি।'

'গুলি না হয় নাই করল,' বলল বোরহান, 'ওর সাথে একটা রিভলভার থাকলে ক্ষতি কি? গত দু'দিন থেকে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে ও…'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'অসম্ভব। সাথে রিভলভার থাকলে হুঁশ থাকবে না ওর, আমার নির্দেশ অমান্য করে বেরিয়ে আসবে গাড়ি থেকে।'

'বেশ,' বলল বোরহান, 'তোমার ব্যাপার, তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো।'

সন্ধ্যা।

আরাম কেদারায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা, কোলের ওপর খোলা একটা বই। নক হয়নি, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল ও। দোরগোড়ায় শিবানীকে দেখে গম্ভীর হলো।

'কি চাও?' রূঢ় গলায় জানতে চাইল ও। 'নক না করে দরজা খুললে কেন?'

দরজাটা বন্ধ করে কামরার ভেতর ঢুকল শিবানী। 'বড় একা একা লাগছে,' বংকিম কটাক্ষ হেনে হাসল সে। 'তোমার সাথে গল্প করে মনটা একটু হালকা করতে চাই। কিছু মনে করবে নাকি?'

'বেরিয়ে যাও,' মৃদু গলায় বলল রানা।

কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না শিবানীর আচরণে। গোলাপী জর্জেটের শাড়িটা উন্নত দুই বুকের মাঝখান দিয়ে প্যাচানো ফিতের মত উঠে গেছে, শাড়ির সাথে ম্যাচ করা একই রঙের ব্লাউজটা সাইজে ব্রা-র চেয়ে সামান্য একটু বড়। ব্লাউজের ভেতর থেকে সোনালী একটা সিগারেট কেস বের করল সে। এগিয়ে এসে টেবিল থেকে তুলে নিল রানার লাইটারটা। সিগারেট ধরিয়ে ফুস্‌স্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ল রানার মুখের দিকে। বলল, 'কর্নেল শফি মারা গেলে তুমি দুঃখ পাবে, না?'

বইটা বন্ধ করল রানা, হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে ওর। মাথা গরম করা নিতান্ত বোকামি হয়ে যাবে, বুঝতে পারছে। 'না,' বলল ও। 'কি মনে করে জানতে চাইছ?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল শিবানী, 'পিস্তলের গুলি চালাতে শফি একজন এক্সপার্ট, তাই না?'

'মোটামুটি ভালই চালাতে জানে। কেন?'

'মিথ্যে কথা বলো না,' হাসছে শিবানী। 'আমার যতটুকু জানা আছে, শফির মত ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে এমন লোক এদেশে আর একজনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

তথ্যটা শিবানী জানল কিভাবে? অবাক হয়ে গেছে রানা। 'কিন্তু এখন শফির বয়স হয়েছে,' সাবধানে, ভেবে চিন্তে কথা বলছে ও।

'অথচ তবু তুমি চাও না আমার কাছে একটা রিভলভার থাকুক। তবু তুমি চাও না টিপুকে কাভার দিই আমি। কেন, রানা? তোমার মতলবটা কি বলো তো?'

'কি বলতে চাও?' ধমকে উঠল রানা। বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। 'শফি কি রকম গুলি চালাতে পারে তার সাথে তোমার কাছে রিভলভার থাকা বা না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার কাজ গাড়ি চালানো, তুমি তাই চালাবে। এবার তুমি আসতে পারো।'

'হুঁ,' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল শিবানী। 'বুঝেছি। আচ্ছা, তোমার কাছেও তো কোন অস্ত্র থাকবে না, তাই না?'

'ব্যাপারটা কি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা। 'ঠিক কি বলতে চাও তুমি?'

'টিপু আর সগীর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' হাসল শিবানী। 'তাতে অবশ্য আমার কিছু এসে যায় না। আমার কাছে ওদের এক কানাকড়ি মূল্য নেই। যাই হোক, আরেকটা কথা···কর্নেল শফি মারা যাবে, এ-ও আমি বিশ্বাস করি না।'

ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকল রানা। তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। হাঁটছে। দরজার কাছে পৌঁছে থামল। কবাট খুলে বেরিয়ে এল করিডরে। দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়াল বোরহানের কামরার সামনে। নক করল দরজায়। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে বোরহান, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, সামনে একরাশ ফটো। মুখ তুলে তাকাল সে, রানাকে দেখে হাসল। 'এসো এদিকে, দেখো···' ন্যুড ছবিগুলোর দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু এমনভাবে হাত নাড়ল রানা, সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'কি হয়েছে, রানা?'

'আমার ঘরে এসো,' বলল রানা। 'কথা বলো শিবানীর সাথে। কি সব বলছে, তোমার শোনা দরকার।'

থমথমে হয়ে উঠল বোরহানের চেহারা। 'কি বলছে?'

'ওর মুখ থেকেই শুনবে চলো।'

পিছনে বোরহানকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। ওরা ঢুকছে, শিবানী তখন বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছে। বোরহানকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চেহারায় নেকড়ের মত হিংস্র একটা চাপা ভাব।

'এইমাত্র আমাকে যা বলেছ, শোনাও বোরহানকে,' বলল রানা।

ইতস্তত করছে শিবানী? ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে বোরহান।

'কই, কি বলেছি আমি?' অবশেষে মুখ খুলল শিবানী। 'তাছাড়া, তার সাথে বোরহানের কোন সম্পর্ক নেই।'

'বলো ওকে!' গর্জে উঠল রানা।

নগ্ন ঘৃণা ফুটে উঠল শিবানীর চোখের দৃষ্টিতে। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত

দেখে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল রানা, কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে একটা মোচড় দিয়ে হাতটা সাথে সাথে ছাড়িয়ে নিয়েই আবার দরজার দিকে ছুটল সে।

'থামো!' হুংকার ছাড়ল বোরহান।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবানী। 'কিছুই বলিনি···' শুরু করল সে।

'বলেছ,' শান্ত গলায় বলল রানা। বোরহানের দিকে তাকাল ও। 'ওর বিশ্বাস সগীর আর টিপু প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে না। আর শফি বেঁচে যাবে।'

শিবানীর দিকে তাকাল বোরহান। 'কেন বলেছ এ কথা?'

আবার ইতস্তত করছে শিবানী। বুঝতে পারছে রানা, বিপদটা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় খুঁজছে সে।

'আমি···আমি ঠাট্টা করছিলাম,' ঢোক গিলে বলল শিবানী। 'রানা আমাকে ভুল বুঝেছে।'

চোখের পলকে ছুটে এল বোরহানের ডান হাতটা। বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড শব্দ হলো একটা। সাথে সাথে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল শিবানীর গালে। ছিটকে গিয়ে পড়ল সে দেয়ালের গায়ে, সেখান থেকে মেঝেতে।

'এসব ব্যাপারে আর কখনও ঠাট্টা করো না,' গম্ভীর গলায় বলল বোরহান। 'যাও, দূর হও এখান থেকে।'

ধীরে ধীরে উঠে বসল শিবানী। কারও দিকে তাকাল না। ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে। নিঃশব্দে হেঁটে গেল দরজা পর্যন্ত। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে বাম গাল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সরু একটা রক্তের ধারা নেমে আসছে। তীব্র ঘৃণায় কুঁচকে রয়েছে চোখের চারদিক। ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

শিবানীর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। করিডর পেরিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল সে, বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'লাই পেয়ে একেবারে মাথায় চড়ে বসেছিল,' বলল বোরহান। 'মাটিতে পা পড়বে এবার।'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। 'গায়ে হাত না তুললেও পারতে তুমি,' বলল ও।

হাসল বোরহান। 'এটাই একমাত্র ভাষা যা মেয়েমানুষ আর কুকুর বোঝে।' সিগারেট ধরাল সে। 'ওকে নিয়ে আর কোন অসুবিধে হবে না তোমার।'

তাহলে তো কথাই ছিল না, মনে মনে ভাবল রানা।

বোরহান বিদায় নিয়ে চলে যাবার আরও অনেক পরে, রানা যখন ধারণা করল এখন কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসবে না, নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করল ও। খাদেমের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা পরিষ্কার করবে। ওর প্ল্যানের মধ্যে এই পিস্তলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রয়েছে।

দেরাজ খুলতেই সাদা স্যুটটা দেখতে পেল রানা। এটার নিচে লুকিয়ে রেখেছে পিস্তল। স্যুটটা তুলল ও। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। নেই!

ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। থমথম করছে মুখের চেহারা। চোখ দুটো

কঠিন। শিবানীকে একা রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল ও, মনে পড়ল কথাটা একটা পিস্তলের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল সে। কাজটা তারই, সন্দেহ নেই।

চোখে অন্ধকার দেখার মত অবস্থা হয়েছে রানার। পিস্তলটা ছাড়া কর্নেলকে বাঁচাতে পারবে না ও।

খালি দেরাজটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে আছে রানা। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। পায়চারি শুরু করল। যেভাবে হোক একটা রিভলভার বা পিস্তল যোগাড় করতে হবে তাকে। এই শেষ মুহূর্তে কিছু করতে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঝুঁকির ব্যাপার, কিন্তু কর্নেল শফিকে বাঁচাতে হলে একটা অস্ত্র ওকে যোগাড় করতেই হবে।

ছয়

ঢং ঢং। হলঘরের ঘড়িতে রাত দুটো বাজল।

রানার কামরা। অন্ধকার। গত তিন ঘন্টা ধরে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারায় বসে আছে রানা, তাকিয়ে আছে নিচের মাঠের দিকে। আকাশে চাঁদ নেই, চারদিকে ঘনঘোর অন্ধকার, অলস ভঙ্গিতে ভারি কালো মেঘ ভেসে যাচ্ছে জ্বলজ্বলে তারাগুলোকে আড়াল করে। অনেক আগেই চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে ওর, ইতিমধ্যে দু'জন মানুষ আর তিনটে কুকুরকে দেখেছে ও। প্রতি আধঘন্টা অন্তর জানালার ঠিক নিচে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওরা।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুতে হবে তাকে। গেট থেকে মাইল খানেক দূরে একটা বাড়ি আছে, বোরহানের সাথে বাইরে যাবার সময় টেলিফোনের তার দেখেছে সেখানে, ওখান থেকে ফোন করবে কর্নেল শফিকে। কর্নেল যদি একটা রিভলভারের ব্যবস্থা করতে পারেন, সব হয়তো আগের মতই ঠিক থাকবে। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা, তারপর আবার ফিরে আসা, ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকির ব্যাপার। কিন্তু সামনে আর কোন পথ খোলা নেই ওর। কর্নেলকে বাঁচাতে হলে সব কিছু বাজি ধরতে হবে এখন ওকে!

এখনই সময়। এর পরে দেরি হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে উঠল রানা। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার হাতলের পিছনে ঠেক্ দিয়ে রাখল চেয়ারটাকে, বাইরে থেকে কেউ ঘোরাতে চেষ্টা করলেও ঘুরবে না হাতলটা। এই শেষ রাতের দিকে তার কামরায় কেউ আসবে বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই।

কুকুরগুলোর কথা মনে পড়লেই গা ছমছম করছে ওর। গার্ডগুলোকে পরোয়া করে না, ওদেরকে কিভাবে ফাঁকি দিতে হয় জানা আছে ওর। যত ভয় কুকুরগুলোকে নিয়ে। হিংস্র আর প্রচণ্ড শক্তিশালী ওগুলো। অথচ ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও স্টীলের একটা কাঁটা চামচ ছাড়া আর কিছু পায়নি ও। উপায় কি, এই চামচটাকেই কাজে লাগাতে হবে। বাঁ হাতে একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে নিল ও, শক্ত

গিট দিয়ে বাঁধল সেটা। কুকুরের দাঁতের কবল থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে এটা দিয়ে। আক্রান্ত হলে জখম এড়িয়ে যেতে চায় ও।

জানালার কাছে ফিরে এল। কয়েক মিনিট পর আবার দেখতে পেল দু'জন গার্ড আর তিনটে কুকুরকে। ওর ঠিক নিচে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। কুকুরগুলো আগে আগে। একজন গার্ড সিগারেট খাচ্ছে, কথা বলছে নিচু গলায়। দু'জনের একজনকেও সতর্ক বলে মনে হলো না রানার। তারা অদৃশ্য হয়ে যাবার সাথে সাথে নিঃশব্দে জানালার ওপর চড়ে বসল ও, বেরিয়ে এল বাইরের কার্নিসে। পানির পাইপটা নাগালের মধ্যেই, সেটা বেয়ে তর তর করে নামছে ও। মাটিতে পা দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কাছ থেকে বাগানটা আরও ভাল দেখতে পাচ্ছে ও। পাঁচ হাত দূরেই কংক্রিটের সরু একটা রাস্তা। নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও। এক পা এগিয়ে থামল। পায়ের দাগ পড়েছে মাটিতে, সেগুলো মুছে ফেলার জন্যে উবু হয়ে বসল।

কংক্রিটের রাস্তায় উঠে এসে আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। সাবধানে এগোতে শুরু করল। দশ গজ এগিয়ে নেমে এল ঘাসে ঢাকা লনে। সামনে ফাঁকা জায়গা। দ্রুত, নিঃশব্দে ছুটল ও। রডোডেনড্রনের ঝোপ ক্রমশ কাছে চলে আসছে। কাছাকাছি পৌঁছে ঘাড় ফেরাল একবার, তাকাল বাড়িটার দিকে। গাঢ় অন্ধকার ঢেকে রেখেছে বাড়িটাকে, দেখা যাচ্ছে না কিছু। গাড়ি চলার পথের দু'পাশে, সেই গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে রডোডেনড্রনের ঝোপ। চওড়া, খোলা পথে বেরুবার ঝুঁকিটা নিচ্ছে না ও। ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে। গেটে পৌঁছুতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে, তা যাক, কিছুটা অন্তত নিরাপদ বোধ করছে ও।

ছায়ার মত নিঃশব্দে পা ফেলছে রানা। কয়েক পা এগিয়েই একবার করে থামছে, কোথাও কোন শব্দ হয় কিনা কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে। এভাবে বেশ খানিকক্ষণ এগোবার পর ঝোপের ফাঁক দিয়ে একবার দেখতে পেল গাড়ি চলার পথটা। পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। নিমেষে পাথর হয়ে গেছে ও। পথের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক। একহারা, লম্বা কাঠামোটাকে দেখেই চিনতে পেরেছে রানা। নঈম। একচুল নড়ছে না সে। মাথাটা সামান্য একটু কাত করা, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে।

দম নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। ডান হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে আছে কাঁটা-চামচ।

ধীরে ধীরে, আশ্চর্য সতর্কতার সাথে নড়ে উঠল নঈম। ধড়াস করে উঠল রানার বুক। সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসছে!

কালো ঝোপের ভেতর ওকে দেখতে পাচ্ছে না নঈম, জানে রানা। কিন্তু একচুল নড়লেই টের পেয়ে যাবে সে। হালকা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে নঈমের নিঃশ্বাস, সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছে ও। হঠাৎ মৃদু জ্বালা অনুভব করল চোখ দুটোয়। কিন্তু পাতাগুলো নাড়ছে না ও। সময় যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুধু সচল রয়েছে নঈম, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সে এখনও।

ঝোপের ভেতর ঢুকছে নঈম। না থামলে ধাক্কা খাবে রানার সাথে। তিন গজ দূরে থাকতে স্থির হয়ে গেল সে। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আছে সে, টান পড়েছে পেশীতে, কোন শব্দ হয় কিনা শোনার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। দূর থেকে এল আওয়াজটা, কিন্তু উৎসের দিকে তাকাল না নঈম। গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে রানার। ওকে দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু মনে হচ্ছে সে যেন সরাসরি ওর চোখে তাকিয়ে আছে। ভোঁ ভোঁ করতে করতে রানার কানের পাশ দিয়ে মুখের সামনে চলে এল একটা মশা, আরেকটু হলে চোখের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। নিজের অজান্তে বাঁ চোখের পাতাটা একটু কেঁপে গেল ওর। পাপড়ির জালে আটকে গেল মশাটা।

'কে ওখানে?' আচমকা হুংকার ছাড়ল নঈম।

ঘাড়ের পিছনে সড় সড় করছে চুলগুলো, অনুভব করছে রানা।

'বেরিয়ে এসো, তোমাকে আমি দেখতে পেয়েছি,' হিংস্র গলায় বলল নঈম। 'তা নাহলে গুলি করছি আমি!'

পাপড়ির ফাঁদে আটকে পড়া মশাটা দ্রুত পাখা ঝাপটে ফরফর শব্দ করছে, যে-কোন মুহূর্তে চোখের ভেতর ঢুকে যেতে পারে সেটা। সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করছে রানা। কিন্তু সম্পূর্ণ মনোযোগ ওর নঈমের দিকে। একচুল নড়ছে না ও।

'গুলি করছি!' আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল নঈম।

তবু নড়ছে না রানা।

'নঈম? কোথায় তুমি? কি হয়েছে?' রাস্তার দিক থেকে অন্য একটা গলা ভেসে এল।

দু'পা পিছিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেল নঈম। তার পাশে আরেকটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

'ঝোপের ভেতর কিসের যেন শব্দ শুনলাম,' বলল নঈম। 'কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। টর্চ আছে? ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে...'

'কোত্থেকে কে আসবে যে দেখতে পাবে তুমি?' লোকটা বলল। 'ছুঁচো, ছুঁচো। লক্ষ লক্ষ ছুঁচো আছে এই ফার্মে। এসো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

খানিক ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়াল নঈম, লোকটাকে অনুসরণ করে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

দুই আঙুল দিয়ে পাপড়িতে আটকে থাকা মশাটাকে আলতোভাবে ধরল রানা, সেটাকে নামিয়ে এনে নিঃশব্দে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। স্বস্তির একটা চাপা হাঁফ ছাড়ল ও। রুমাল বের করে মুছে নিল কপাল আর ঘাড়ের বিন্দু বিন্দু ঘাম। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, তারপর আবার পা বাড়াল সামনের দিকে। এবার আগের চেয়ে শ্লথ গতিতে। এতটুকু শব্দ যাতে না হয় সে-ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক।

সামনে পাতলা হয়ে এসেছে ঝোপটা, তারপর একটা বাঁশ ঝাড়, এরপর আবার শুরু হয়েছে রডোডেনড্রনের ঝোপ। এই ঝোপের ভেতর ঢুকে খানিক দূর এগোবার পর কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পেল রানা। এটার কথাই তাকে বলেছিল সমুদ্র গুপ্ত। ইলেকট্রিফায়েড তার। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বেড়াটা পরীক্ষা করল ও। দশ ফুট উঁচু, আর তারগুলো যা মোটা, দেখেই বোঝা যায়

ভয়ঙ্কর ভোল্টেজ বয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও, সুবিধে মত গাছ খুঁজছে একটা। বেড়াটার পাশ ঘেঁষে খানিক দূর হেঁটে এল ও। একটা বাঁশ ঝাড়ের সামনে দাঁড়াল। লম্বা একটা বাঁশ বেছে নিল ও। তরতর করে প্রায় মাথার কাছে উঠে এসে তাকাল বেড়াটার দিকে। কয়েক ফুট নিচে দেখা যাচ্ছে সেটা। বেড়ার দিকে পিছন ফিরে দুলতে শুরু করল সামনে পিছনে। ক্রমেই বাড়ছে দোল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সুযোগের সন্ধানে আছে। হঠাৎ, গাছটা আবার যখন ইলেকট্রিফায়েড বেড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল, বাঁশ ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে লাফ দিল ও।

জুডোর ভঙ্গিতে ব্রেক ফলের জন্যে তৈরি হয়ে গেল শূন্যে থাকতেই। বেড়াটাকে টপকে এল, মাটিতে প্রথমে পড়ল পায়ের গোড়ালি দুটো, তারপর পিছনটা, দুই হাতে চাপড় দিল মাটিতে পতনটাকে দুর্বল করার জন্যে, তারপর ডিগবাজি খেয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল। এবার আট ফুট উঁচু একটা পাঁচিল। এই পাঁচিলটাই গোটা ফার্মটাকে ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে। এটাকে টপকাতে এক মিনিটের বেশি লাগল না ওর। পাঁচিলের এপারে সরু, কিন্তু গভীর একটা নালা। শুকনো। রাস্তার পাশ ঘেঁষে বেশ খানিক দূর এগিয়ে গেছে।

রাস্তায় উঠে আসার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল রানা। কোথাও কিছু নড়ছে না। ধীরে ধীরে উঠে এল নালা থেকে। রাস্তার কিনারা ধরে এগোচ্ছে। একমাইল দূরে বাড়িটা। ফোনটা ভাল থাকলে হয়। এই শেষ রাতে নক করলে বাড়ির লোকেরা দরজা খুলবে কিনা সেটাও একটা দুশ্চিন্তার কথা। আর বাড়িটা যদি বোরহানদেরই কারও হয়? কথাটা আগে কেন মনে হয়নি ভেবে নিজের ওপর একটু রাগ হলো রানার, কিন্তু তারপরই ভাবল, মনে হলেও বিকল্প কিছু ছিল না তার। চান্স নিয়ে দেখতে হতই।

নালা থেকে উঠে এসেছে ত্রিশ সেকেণ্ডও হয়নি, এই সময় পিছন থেকে একটা মেয়েলি গলা শুনতে পেল ও।

'কিছু টাকা চাই আমার।'

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। 'কে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'হ্যালো, রানা। তুমিই কিনা ভাবছিলাম।' রানার পাশে এসে দাঁড়াল রূপা।

'মাই গড!' নিচু গলায় বলল রানা। 'তুমি! এখানে কোত্থেকে?'

'রাজপুত্র,' রাবীন্দ্রিক নাটকের সুরে শুরু করল রূপা, 'আমার দুঃখের কথা কি আর বলব তোমাকে! রাস্তার ওপারে ওই পর্ণকুটিরে একা আমার দিন কাটে। রাজপুত্র কোথায় বন্দী হয়ে আছে জানার পর থেকেই ওখানে আছি আমি। দু'চোখে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই, ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে রাতদিন অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকি রাক্ষসদের আস্তানার দিকে, মনে আশা, একবার যদি চোখের দেখাও দেখতে পাই তাকে! আমার সাথে তোয়াব খান নামে এক দেহরক্ষীও আছে, রাজপুত্র। ছি, কি লজ্জা, হতভাগিনী শুধু নিজের দুঃখের পাঁচালীই গাইছি। রাজপুত্র, কেমন আছ তুমি? তোমার সব খবর ভাল তো?'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। হঠাৎ রূপার মুখটা দেখার সাংঘাতিক একটা লোভ

জেগে উঠেছে মনে। কিন্তু অন্ধকারে তা সম্ভব হচ্ছে না। 'আমি ভাল আছি, চণ্ডালিনী,' বলল ও। 'রাজাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'খবরদার!' কোথায় কাব্য, কোথায় কি, তিক্ত চাপা গলায় হুমকির সুরে বলল রূপা। 'আমি চাঁড়ালনী, না?' ফোঁস করে উত্তপ্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'বারে! তুমিই তো শুরু করলে,' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'এক চণ্ডালিনীর প্রেমে পড়েছিল না রাজপুত্রটা?'

'ভুল করে ফেলেছি,' গম্ভীর গলায় বলল রূপা। 'বাঁদরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে, কথাটা মনে ছিল না। এসো, ঘরে যাই। তোমার সাথে কথা আছে আমার।' ঘুরে দাঁড়াল সে। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল।

দ্রুত অনুসরণ করল রানা। রূপার পাশে চলে এল। 'বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি,' বলল ও। 'এভাবে বেরিয়ে এসে ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকি নিয়েছি, কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না। আমার পিস্তলটা চুরি হয়ে গেছে। তোমার কাছে আছে নাকি, দিতে পারবে একটা?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রূপা। 'কি বললে? তোমার পিস্তল চুরি হয়ে গেছে? খাদেমের কাছ থেকে যেটা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে অন্য কোনরকম বিপদ হবার ভয় আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস শিবানী চুরি করেছে ওটা, কিন্তু কাউকে বলবে না। কথা ছিল, কর্নেলকে মারার জন্যে যেদিন যাব আমরা সেদিন আমাকে আর ওকে কোন অস্ত্র দেয়া হবে না। কিন্তু ওর একই জেদ, আত্মরক্ষার জন্যে একটা অস্ত্র ওর কাছে থাকা দরকার। চেয়ে পাচ্ছে না বলে স্রেফ চুরি করেছে।'

'ওর অস্ত্র লাগবে কেন?'

'বিশ্বাস করে না ও আমাকে। ওর বিশ্বাস, আত্মঘাতী কিছু ঘটতে চলেছে। ওই দিন মরবে না কর্নেল শফি।'

'তুমি ঠিক জানো কাউকে বলবে না শিবানী?'

'তার মনের ভেতর তো আর ঢুকিনি,' বলল রানা। 'মেয়েরা সে অধিকার কোন পুরুষকে দেয় বলে শুনিওনি কখনও।'

উত্তর করল না রূপা। রাস্তা পেরিয়ে একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। গেট খুলে সরু পথ ধরে এগোচ্ছে। পিছনে রানা।

'কিভাবে আস্তানা গাড়লে এখানে?' জানতে চাইল ও।

বারান্দায় উঠে একটা দরজা খুলল রূপা। তার পিছু পিছু ছিমছামভাবে সাজানো একটা আলোকিত ঘরে ঢুকল রানা। চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। টেবিলের নিচে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, তৈজসপত্র, গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট, কনডেনস্‌ড মিল্কের ক্যান ইত্যাদি রয়েছে।

'কর্নেল সব ব্যবস্থা করেছেন,' দরজাটা বন্ধ করে বলল রূপা। ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল রানার দিকে। 'কিছু খাবে?'

নিঃশব্দে রূপার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। 'শুধু চা,' মৃদু গলায় বলল ও। 'কিন্তু তার আগে একটা কথা। কিছু যদি মনে না করো।'

'মনে করব,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল রূপা। 'কারণ, কি বলতে চাইছ তুমি,

তা আমি জানি।'

'জানো?' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল রানার চোখে। 'অসম্ভব! বলো তো, কি?'

'আমি খুব সুন্দর, এই তো?'

বিস্ময়ে প্রায় চমকে উঠল রানা। ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিল সে।

'কি, ঠিক বলিনি?' হাসছে রূপা। 'অমন বোকার মত তাকিয়ে রইলে যে?'

'কিন্তু বুঝলে কিভাবে?'

আবার হাসল রূপা। 'এর উত্তর এক কথায় দেব?' কিন্তু এবারের হাসিটা অন্যরকম, পরিষ্কার গর্বের হাসি।

'দাও।'

'মাসুদ রানা সম্পর্কে আমি একজন বিশেষজ্ঞ,' কথাটা বলে পিছন ফিরল রূপা। বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। টেবিলের তলা থেকে স্টোভটা বের করে জ্বালছে। 'আর একটাও ফালতু কথা নয়। কাজের কথা শুরু করো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'তোয়াব খানকে দেখছি না যে?'

'গত দু'দিন থেকে এখানে আছি আমরা,' বলল রূপা। স্টোভে চায়ের পানি চড়িয়ে দিয়েছে। 'প্রথম দিন তোয়াব খান ছিল আমার সাথে। আজ তাকে জোরজার করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, বলেছি আমি একাই থাকব। কর্নেলের ভাগ্নী হিসেবে বিশেষ খাতির সহ্য হয় না আমার। কাল আবার আসবে।' উঠে দাঁড়াল সে। পাশের ঘরে ঢুকে ফিরে এল তখুনি আবার। হাতে একটা প্লেট, তাতে দু'টুকরো কেক। 'ঘরে আর কিছু নেই,' চেহারাটা একটু ম্লান দেখাল।

'সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন কর্নেল,' বলল রানা। 'এই বাড়িটা দখল করতে নিশ্চয়ই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে।'

'তোমার খোঁজ পাবার পরপরই তিনি নিজে এখানে এসেছিলেন,' বলল রূপা। 'সব ব্যবস্থা করে তবে ফিরেছেন। সত্যি তোমার সব খবর ভাল?'

বিছানার ওপর বসল রানা। 'এখনও ভাল। কিন্তু ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটছি। সামনে মস্ত সঙ্কট। আর তিন দিন বাকি। ওই দিনই ফাটবে বেলুন। কর্নেলের জায়গায় আর কেউ প্রক্সি দিলে বোধহয় ভাল হত। তাঁর আহত হবার সম্ভাবনা আছে।'

'তাঁর জায়গায় আর কেউ থাকলেও সেই একই কথা,' বলল রূপা। 'বিপদ দেখে পিছিয়ে যাবার কিংবা নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার মানুষ তিনি নন। তাঁকে সে-কথা বলাই যাবে না। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এই চাকরিটা তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছি আমি, এটা হারাতে চাই না। মেজর জেনারেলের নির্দেশ, এই কাভারটা যেন অটুট থাকে।'

'কর্নেল কিছু সন্দেহ করেননি তো?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল রানা। 'তোমার বা আমার ব্যাপারে?'

'তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখেন তিনি,' বলল রূপা, 'কিন্তু তুমি যে বি-সি-আই-এর লোক হতে পারো সেটা তাঁর কল্পনারও বাইরে, আমার ব্যাপারেও তাই।'

'কর্নেলকে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেয়াই উচিত হবে…'

'উঁহুঁ,' বলল রূপা। 'চীফ তা মনে করেন না। সোহেল আহমেদ, সোহানা চৌধুরী আর আমি ছাড়া কেউ কিচ্ছু জানে না। মনে হয় তোমাকে দিয়ে আরও কিছু কাজ করিয়ে নেয়ার মতলব আছে ওঁর। উনি চান না আসল ব্যাপার জানাজানি হোক।'

প্লেট থেকে একটা কেক তুলে নিয়ে কামড় বসাল রানা।

'কর্নেল নিজেই প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন,' রানার হাতে পানির গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল রূপা, 'বললেন, রানা যখন আছে, তখন আর কিছু চিন্তা করি না। ওর হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হুঁ,' বলল ও। 'কারও ওপর এতটা আস্থা রাখা বোধহয় ভাল নয়। যাই হোক, একটা পিস্তল বা রিভলভার পেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। অস্ত্র ছাড়া কিছুই করতে পারব না। ওরা দু'জনেই দারুণ এক্সপার্ট। এখন মনে হচ্ছে সামলাতে হবে তিনজনকে।'

চেহারাটা কালো হয়ে গেল রূপার। 'কিন্তু রওনা হবার আগে ওরা তোমাকে সার্চ করতে পারে। তোমার কাছে রিভলভার পেলে তোমাকে হয়তো ওরা…' চুপ করে গেল সে।

'হুঁ,' বলল রানা। 'কথাটা আমার মাথায় আসেনি। হ্যাঁ, সার্চ করতে পারে ওরা। এক কাজ করবে তোমরা। পরশু দিন বিকেলে একটা ব্যাগ আর এক সেট পোর্টেবল টেলিফোন যন্ত্র নিয়ে এখান থেকে রওনা হবে বোরহানের দু'জন লোক। ওরা শশীভূষণ লেনে রেখে আসবে ওগুলো। ওরা ওখানে পৌঁছুবে সন্ধ্যার পরপর। কর্নেলের বাড়ি থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে ওদের ওপর। ওরা চলে আসার পর কোন এক সময় টেলিফোনের পোলের ওপর আমার জন্যে টেপ দিয়ে আটকে রাখতে হবে একটা রিভলভার। রাস্তা থেকে তাকালে যেন দেখতে পাওয়া না যায়। ঠিক আছে?'

রানার হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল রূপা। 'ঠিক আছে।' রানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল সে। চুমুক দিল নিজের কাপে। 'কর্নেলকে জানাব আমি।'

'আরেকটা কথা জানাতে হবে কর্নেলকে,' বলল রানা। 'বলবে, ছাত্রনেতা মনসুর উদ্দীন খান এদের সাথে জড়িত। প্রভাবশালী সদস্য সে, সম্ভবত লীডারের সাথে ওঠাবসা করে। তিনজন রাজনৈতিক নেতার নাম বলছি, এদের ওপর সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। গোলাম রসুল, মওলানা দস্তগীর আর খান আবদুর রউফ।'

'সে কি!' আঁতকে উঠল রূপা। 'তুমি কি এঁদের সন্দেহ করছ? অসম্ভব!'

'দুনিয়াতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই,' বলল রানা। 'না, এঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা প্রমাণ, কিছুই নেই আমার হাতে। তবে, সন্দেহ করছি, এঁদের মধ্যে কেউ একজন লীডার হতে পারেন।' শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার আমাকে যেতে হয়। নতুন কিছু রিপোর্ট করার নেই আর। বৃহস্পতিবার রাত দশটায়। কর্নেলকে সতর্ক করে দিয়ো, পুলিস যেন অবশ্যই কড়া নজর রাখে শিবানীর ওপর। তার মত গাড়ি চালাতে আমি কাউকে দেখিনি। সে যদি পালিয়ে

যেতে পারে, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, আর আমি তো ডুববই। টিপু আর সগীরকে সামলানো তেমন কঠিন হবে না, সমস্যা দেখা দেবে শিবানীকে নিয়ে। কাজেই সতর্ক থাকতে হবে পুলিসকে।'

'ঠিক আছে।'

'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি,' বলল রানা, 'কিন্তু তোমাকে এখানে পাঠানো উচিত হয়নি কর্নেলের। এরা ভয়ঙ্কর একদল ফ্যানাটিক, তিনি জানেন না?'

হাসল রূপা। 'দোষটা পুরোপুরি কর্নেলের নয়। আমিই তাঁকে প্ররোচিত করেছি। আমার জেদের সাথে তিনি পারবেন কেন!'

'এরকম বোকার মত জেদ ধরা উচিত হয়নি তোমার।'

'আমাদের চীফ কিন্তু আমার বিপদের কথা ভেবে চিন্তিত নন,' শান্ত ভাবে বলল রূপা। 'তিনি তোমার ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন।'

'মেজর জেনারেল?' ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার। 'যোগাযোগ হয়েছে তোমার সাথে?'

'শুধু একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন,' বলল রূপা। 'তোমার ওপর বিশেষ নজর রাখার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে। এখানে আমার আসার কথা যদি বলো, আমি তাঁর সেই নির্দেশ পালন করছি মাত্র, তার বেশি কিছু না।'

'ও, আচ্ছা,' মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে রানা। তাঁর বা বি-সি-আই-এর সাথে কোনরকম যোগাযোগ রাখা চলবে না, পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন রাহাত খান। ওর ক্যামোফ্লেজের জন্যেই সেটা দরকার। অথচ তিনি নিজে ঠিকই যোগাযোগ রেখে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে রূপাকেও বি-সি-আই থেকে সরে গিয়ে এন-এস-আইতে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওর প্রতি কতখানি যত্ন আর স্নেহ রয়েছে বুড়োর ভাবতে গিয়ে গভীর একটা কৃতজ্ঞতা বোধ জাগে রানার বুকের ভেতর।

রানার একটা হাত ধরল রূপা। শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল রানার।

'কি ভাবছ?' হাসছে রূপা। তারপর একটু হেঁয়ালি করে বলল, 'ওই গুণ আছে বলেই তাঁর কথায় আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি আগুনে; আমরা সবাই ভালবাসার ক্রীতদাস। তাই না?'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। অবাক হলো রূপার উপলব্ধির গভীরতা দেখে।

'বিপদ দেখলে জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলো,' বলল রূপা। 'হয় আমি নয়তো তোয়াব খান রোজ রাতে টহল দিই রাস্তায়। দু'জনেই মোর্স কোড পড়তে পারি আমরা।'

'আগে জানলে কাঁটাতারের ওই বেড়া টপকাতে হত না আমাকে,' বলল রানা। 'এখন আবার ভেতরে ঢোকার জন্যে নতুন একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।'

'তার কোন দরকার নেই। তুমি পালিয়ে আসতে চাইতে পারো ভেবে প্রথম দিন থেকেই রোজ রাতে বেড়ার ইলেকট্রিসিটি কেটে দিই আমরা।'

'তার মানে শুধু শুধু বাঁশ গাছে চড়তে হয়েছে আমাকে! এটাও কি কর্নেল শফির মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল রূপা। 'হ্যাঁ। সমস্ত ব্যাপারে লক্ষ আছে ওরও।'
'যাই তাহলে,' বলল রানা। 'কিন্তু একটা কথা ভাবছি।'
'কি?'
'আমরা কিসের যেন চাকর-চাকরানী বলছিলে···এই যে একটু আগে! ওহ্-হো, ভালবাসার। কই, তার প্রমাণ কোথায়?'
'প্রমাণ?'
'এই একটু জড়াজড়ি, একটু ধস্তাধস্তি··· নিদেন পক্ষে এক-আধটা চুমো-টুমো···'
হাসল রূপা। 'বেশ তো, মাঠে চলো। ঘরের চেয়ার-টেবিল ভেঙে লাভ কি? জুডো না কারাতে—কোন্ নিয়মে ধস্তাধস্তি করবে?'
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ।
'নাহ্! মানুষ করা গেল না তোমাকে। একদিন গলবে তুমি লৌহ-মানবী—সেদিন হয়তো থাকব না আমি।'
'ছিঃ!' কথাটা শুনেই তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো রূপার মধ্যে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মুখের হাসি। 'এমন অলক্ষুণে কথা বলতে হয় না।'
একটু অবাক হলো রানা। কিন্তু বুঝল, নিছক সংস্কারবশেই কথাটা বলেছে রূপা। ওর মধ্যে দুর্বলতার ছিটেফোঁটাও নেই। আশ্চর্য এক মেয়ে! পিছন ফিরে রওনা হলো সে।
'দাঁড়াও,' পিছন থেকে ফিসফিস করে ডাকল রূপা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।
'নিজের দিকে লক্ষ রেখো,' রানার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রূপা, নিচু গলায় বলল, 'একটু সাবধান থেকো। আমি চাই না তোমার কোন অমঙ্গল হোক।'
'থ্যাঙ্কিউ, রূপা। অসংখ্য ধন্যবাদ!' বলেই আর দাঁড়াল না রানা, দ্রুত বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

বেড়ার তার গলে ভেতরে ঢুকল রানা। সাথে সাথে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। লম্বা কালো একটা আকৃতি বুলেটের মত ছুটে আসছে ওর দিকে। তোয়ালে জড়ানো হাতটা শুধু নাড়ার সময় পেল রানা, চোখের পলকে এসে পড়ল অ্যালসেশিয়ান একটা কুকুর।
লাফ দিয়ে রানার ওপর পড়ল কুকুরটা, প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পিঠ দিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল ও কুকুরটার সাথে। পরমুহূর্তে দেখল প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের কাজে আশ্চর্য মগ্ন, হাঁক ছেড়ে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রানার।
হিংস্র ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল কুকুরটা, ঝট্ করে গলা বাড়িয়ে কামড়ে ধরার চেষ্টা করল রানার কণ্ঠনালী। বিদ্যুৎ বেগে ওর মুখের ভেতর ব্যাণ্ডেজ করা হাতটা পুরে দিল রানা। সেই সাথে বুকে একটা লাথি মারল। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল জানোয়ারটা। কিন্তু রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার ওর ওপর এসে পড়ল সে, একটুর জন্যে কামড় বসাতে পারল না কাঁধে। ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে, পা

ছুঁড়ে কুকুরটাকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা। বিশেষ একটা কায়দায় পৌঁছুতে চাইছে ও, যেখান থেকে প্রতিপক্ষকে কাঁটা-চামচটা দিয়ে আঘাত করা যাবে। কিন্তু চোখের পলক পড়ার আগেই জায়গা বদল করছে জানোয়ারটা, রানা শুধু তার দাঁতগুলোকে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখার সময় পাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, শেষ রক্ষা বুঝি আর করা গেল না। যে-কোন মুহূর্তে মাংস ফুটো করে ঢুকে যাবে দাঁতগুলো। কিন্তু ব্যাণ্ডেজ করা হাতটা হাঁ করা মুখের দিকে এগিয়ে দিতে একবারও ব্যর্থ হলো না ও। সেই সাথে অবিরত এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে। সুবিধে করতে পারছে না কুকুরটা। হাঁপিয়ে যাচ্ছে সে। কোন ভাবেই কিছু করা যাচ্ছে না দেখে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার।

হঠাৎ লাফ দিয়ে সরে গেল সে। দূর থেকে ছুটে এসে রানাকে ধাক্কা দেবার মতলব। লাফ দেবার ভঙ্গিতে শরীরটাকে নিচু করে কুঁকড়ে নিল।

হাঁপাচ্ছে রানা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত ছুটে এল কুকুরটা। তিন হাত দূরে থাকতে লাফ দিল সে। বিদ্যুৎ গতিতে নিচু হলো রানা, জানোয়ারটার লম্বা শরীর ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ঘ্যাচ্ করে গেঁথে দিল কাঁটা চামচটা। চাপা একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে, কাত্ হয়ে দড়াম করে পড়ল মাটিতে। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা। প্রচণ্ড একটা লাথি মারল মাথায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল বাড়িটার দিকে। একমাত্র চিন্তা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকা। আর কোন কুকুরের সামনে না পড়লেই হয় এখন। যতটা সম্ভব আড়ালে-আবডালে থেকে ছুটছে ও। রডোডেনড্রন ঝোপ পেরিয়ে লনের কিনারায় এসে থামল। সামনে ফাঁকা জায়গা। এটা না পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার উপায় নেই।

চোখ জ্বেলে অন্ধকার ভেদ করতে চাইছে রানা। দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। কোথাও কোন শব্দ নেই। কাঁটা চামচটা শক্ত মুঠোয় ধরে আছে এখনও, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে এল ও, পেরিয়ে আসছে জায়গাটা। দূরত্বের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বাঁ দিকে লাল একটুকরো আগুন। নড়ছে সেটা। সিগারেটের আগুন ওটা। নিঃশব্দে নিচু হলো ও, মাটিতে হাত আর পা রেখে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। বাড়ির সামনে দিয়ে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে গার্ডটা, কিন্তু রানা তাকে দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে। সিগারেটের ছোট্ট আগুনটা দেখে বোঝা যাচ্ছে তার অস্তিত্ব। হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল, সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল সিগারেটের আগুন। 'চোপ রও!' হুংকার ছাড়ল গার্ড।

কিন্তু আবার ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। চেইনের আওয়াজ পাচ্ছে রানা, বুঝতে পারছে ছাড়া পাবার জন্যে লাফালাফি করছে জানোয়ারটা। বাতাসে একটা চাবুকের শব্দ জাগল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল কুকুরটা।

অন্য একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'ওর হয়েছেটা কি?'

'ছুঁচো দেখে তড়পাচ্ছে শালা,' রেগেমেগে উত্তর দিল গার্ড। 'এই ব্যাটা, থামলি!'

'ওকে বরং ছেড়ে দিয়েই দেখো না,' সঙ্গীটা বলল, 'কেউ হয়তো ভেতরে

ঢুকে বসে আছে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো? কে ঢুকবে ভেতরে? কিভাবে ঢুকবে? একবার ছাড়া পেলে ও আর ধরা দেবে ভেবেছ!' আবার চাবুকের শব্দ পেল রানা। 'খবরদার! চেঁচালেই চাবুক খাবি!'

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কুকুরটা। গার্ড দু'জন আবার এগোতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। সিগারেটের টুকরোটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ছুটল বাড়িটার দিকে। পিছনে কোথাও ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। বোধ হয় আহত কুকুরটাই, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। কিছু এসে যায় না, নিজের ঘরের জানালার নিচে পৌঁছে গেছে ও। পাইপটা ধরল। উঠতে শুরু করেছে ওপর দিকে।

আরও কয়েকটা কুকুর ডাকতে শুরু করেছে। কংক্রিটের পথের ওপর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও। নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

'কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে,' চিৎকার করে উঠল একজন গার্ড। 'কুকুর ছাড়ো!'

হাত বাড়িয়ে জানালার নিচে কার্নিস ধরল রানা।

ঝন ঝন শব্দে বাজতে শুরু করল একটা অ্যালার্ম বেল। হাঁপাচ্ছে রানা। জুলফি থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। কার্নিসে উঠে বসেছে ও। বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে নামল ঘরের মেঝেতে। দ্রুত কাপড় ছাড়ছে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে শোরগোলের আওয়াজ। তারপর হঠাৎ নিচের বাগান আর মাঠ আলোকিত হয়ে উঠল দুটো সার্চ লাইটের আলোয়। পর্দাটা টেনে দিল রানা।

দ্রুত পাজামা জোড়া পরে নিয়ে ওয়ারড্রোবে পরিত্যক্ত কাপড়গুলো ভরে রাখল রানা, দরজার কাছে এসে চেয়ারটা সরিয়ে নিল নিঃশব্দে। তারপর খুলল দরজাটা।

নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে শিবানী। ছোট্ট, বাঁকা একটু হাসল সে। 'একটুর জন্যে বেঁচে গেলে, তাই না? ঠিক সময়ে ফিরে আসতে পেরেছ।'

'স্বপ্ন দেখছ নাকি?' স্বাভাবিকভাবে বলল রানা। 'আরেকটা চড় খাওয়ার আগেই তুমি বরং দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো।'

হাসিটা অদৃশ্য হয়ে গেল শিবানীর ঠোঁট থেকে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। ঠাণ্ডা হিম কোমল মায়াময় দৃষ্টির জায়গায় ঘৃণা ফুটে উঠেছে। 'কিন্তু তোমার শেষ আমি দেখে ছাড়ব, মাসুদ রানা। আর সবাইকে ফাঁকি দিতে পারো তুমি, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না।' ঘুরে দাঁড়াল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। করিডর থেকে পিছিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, এই সময় বাঁক নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল বোরহানকে।

'কোথায় ছিলে তুমি? কি করছিলে?' দ্রুত এগিয়ে আসছে বোরহান, জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইল সে। 'বাইরে গিয়েছিলে নাকি?'

'বাইরে?' শূন্য দৃষ্টিতে বোরহানের চোখে তাকাল রানা। 'কেন, বাইরে কেন যাব আমি?'

'নিচে কাউকে দেখা গেছে,' বোরহানের কঠিন দৃষ্টি সার্চ করছে রানার মুখ। 'একটা কুকুরকে আহত করেছে কেউ।'

'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'না, ব্যাপারটা দেখার জন্যে গার্ডরাই যথেষ্ট। শুয়ে পড়ো, যাও। অ্যালার্ম বেল বাজলে ঘর ছেড়ে বেরুবার নিয়ম নেই।'

পিছিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা।

'আবার কি চাইছিল শিবানী?' হঠাৎ জানতে চাইল বোরহান।

'ওরও ধারণা, আমি নাকি বাইরে গিয়েছিলাম,' বলল রানা, তারপর হাসল। 'বুঝলাম না এই রকম একটা ধারণা কেন হলো তার।'

বোরহানের চোখে সন্দেহ ফুটে উঠল। হাসতে হাসতে তার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

সাত

'এই শুরু হলো,' সিঁড়ি বেয়ে হলঘরে নেমে যাবার সময় ভাবছে রানা, 'এখন আর পিছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।'

টিপু আর সগীরকে তালিম দিয়ে যার যার কাজে প্রত্যেককে যান্ত্রিক রোবটের মত গড়ে নিয়েছে ও, কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। দু'জনের কেউ একজন অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে, কাজেই কর্নেল শফির প্রাণের ওপর ঝুঁকিটা থেকেই যাচ্ছে। এখন অপারেশনের কাজ শুরু হয়ে যাবার পর মনে হচ্ছে, এতবড় একটা দায়িত্ব না নিলেই ভাল করত সে। কর্নেলের কাজের ধারার মধ্যে একনায়ক সুলভ কিছু ব্যাপার থাকলেও, ভদ্রলোককে পছন্দ করে ও, শ্রদ্ধা করে। কর্নেল যে সগীরকে সামাল দিতে পারবেন সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই, সন্দেহ তার নিজেকে নিয়ে—টিপুকে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে কিনা বুঝতে পারছে না।

হলঘরে ড. সমুদ্র গুপ্তের সাথে আরও চারজন বিদেশী লোক রয়েছে। আগেও এদেরকে দেখেছে রানা, কিন্তু পরিচয় নেই। আরেক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বোরহান, শ্যোন কাপালা, শিবানী, টিপু আর সগীর। কালো শার্ট আর কালো ট্রাউজার পরেছে শিবানী। ফর্সা গায়ে অদ্ভুত মানিয়েছে কালো পোশাক।

নিচে নেমে এল রানা।

'তুমি রেডি?' জানতে চাইল বোরহান।

'রেডি,' বলল রানা। চেহারায় ভাবের চিহ্নমাত্র নেই। 'স্রেফ আর একটা কথা। যদি কোন গোলমাল দেখা দেয়, আমরা হয়তো নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ব, ফলে বলাকার সামনে তোমার কাছে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যেতে পারে আমাদের। তুমি ওখানে ঠিক সাড়ে দশটায় পৌঁছুবে। আধঘণ্টার বেশি ওখানে অপেক্ষা করবে না, এই আমি চাই। ওই সময়ের মধ্যে আমরা কেউ যদি না পৌঁছাই, গাড়ি নিয়ে

সরে যাবে তুমি, আবার ওখানে ফিরে আসবে সাড়ে এগারোটার সময়। এবার মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। তবু যদি আমাদের কাউকে ফিরতে না দেখো, মনে করবে আমরা আর ফিরব না। ঠিক আছে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল বোরহান।

'ব্যস, বাকি সবও ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার তোমরা তিনজন রেডি কিনা বলো?' মুখের ওপর শিবানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করছে ও, কিন্তু তার দিকে ভুলেও একবার তাকাচ্ছে না। টিপুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'তুমি শিবানীর সাথে বসবে। আমি আর সগীর পিছনে বসব।'

প্রথমে গাড়িতে উঠল শিবানী আর টিপু। এখনও সমুদ্র গুপ্তের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে রানা।

'কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না, মি. গুপ্ত,' বলল রানা। 'আর যাই ঘটুক, শফি বাঁচতে পারছে না। এ-ব্যাপারে আপনি যে-কোন অঙ্কের বাজি ধরতে পারেন।'

হলুদ দাঁত বের করে হাসল গুপ্ত। 'তোমার কাজের প্রশংসা না করে পারি না আমি। গুড লাক। প্রার্থনা করি নিরাপদে ফিরে এসো।' রানার দিকে মোটা, ঘামে ভেজা একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'তুমি রওনা হবার আগে ছোট্ট আর একটা কথা, রানা। শোনা যাচ্ছে, তোমার কাছে নাকি একটা রিভলভার আছে। আমাদের ধারণা ওটা তোমার কাছে থাকার কোন দরকার নেই। বের করে আমার কাছে জমা রাখো ওটা, কেমন?'

গুপ্তের মুখের ওপর হাসল রানা, মনে মনে রূপাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। 'রিভলভার?' আকাশ থেকে পড়ল ও। 'রিভলভার পাব কোথায়? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'উঁহুঁ, আপনি সিরিয়াস নন, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন, তাই না?'

'না।'

'আপনি সিরিয়াস?' গম্ভীর হলো রানা। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'বেশ। বিশ্বাস না হলে সার্চ করুন।'

চেহারায় সামান্য একটু ক্ষমা প্রার্থনার ভাব নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল বোরহান। দুই হাত রানার গায়ের ওপর চাপড়ে নিখুঁতভাবে সার্চ করল রানাকে। নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল সে, তারপর মাথা দোলাল এদিক ওদিক। 'আপনাকে আমি বলিনি, শিবানী বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে?' গুপ্তের দিকে ফিরে কঠিন সুরে বলল সে।

'আবার শিবানী?' হেসে উঠল রানা। 'যাক, কিছু এসে যায় না তাতে। অন্তত চেষ্টা তো করে যাচ্ছে! সংগঠনে এই ধরনের খুঁতখুঁতে মানুষ থাকার দরকার আছে।'

'ফিরে আসুক, তারপর ওর সাথে কথা হবে আমার,' গম্ভীর গলায় বলল বোরহান। 'এমন শিক্ষা দেব, চিরকাল মনে থাকবে!' রানার দিকে ফিরল সে, পিঠ চাপড়ে দিল ওর। 'তুমি যাও, রানা। সাড়ে দশটায় বলাকার সামনে থাকব আমি। গুড হান্টিং।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল। কানে এল, চাপা গলায় থাই ভাষায় দ্রুত কথা বলছে সমুদ্র গুপ্ত। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল ও। দেখল চার বিদেশী

কুচক্রী সহাস্যে মাথা নাড়ছে।

কালো টয়োটায় উঠে সগীরের পাশে বসল রানা। 'দেরি হবার জন্যে দুঃখিত,' বলল ও। 'কে যেন ওদেরকে বলেছে, আমার কাছে রিভলভার আছে।' হাসল ও।

স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে শিবানী। শক্ত কাঠ হয়ে আছে শরীরটা। তাকালই না রানার দিকে। কিন্তু চেহারাটা কালো হয়ে গেছে তার, রিয়ার ভিউ মিররের মাধ্যমে লক্ষ্য করল রানা। 'স্টার্ট!' নির্দেশ দিল ও।

গাড়ি ছেড়ে দিল শিবানী।

সগীরকে একটা সিগারেট অফার করল রানা। সেটা ধরাবার সময় দেখা গেল হাত দুটো কাঁপছে তার। ক্ষীণ একটু করুণা বোধ করল ও। কর্নেলের হাতে নির্ঘাত মারা পড়বে ছোকরা। ও জানে, কর্নেলের কাছে পাত্তাই পাবে না সগীর।

'আর খানিক পরই তো সব চুকেবুকে যাবে,' বলল রানা। 'দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। তোমার নয়, মরণ ঘনিয়েছে শফির।'

চেহারাটা লাল হয়ে উঠল সগীরের। 'না, দুশ্চিন্তা করছি না,' মৃদু গলায় বলল সে। 'কিন্তু শিবানী বলছিল, কর্নেল নাকি এদেশের সেরা...'

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'বড় বেশি ফালতু কথা বলে ও। কর্নেল রিভলভারে সেরা ছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। এখন সে বুড়ো হয়েছে।'

'বুড়ো শালাকে আমি একাই খতম করব,' বলল টিপু। 'কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। নিশ্চিন্তে থাকো, সগীর। পকেট থেকে হাত বের করার আগেই শালার খুলি ফুটো হয়ে যাবে।'

টিপুকে সামলাতে হবে তার, সেজন্যে খুশি রানা। এর হার্টবিট বন্ধ করে দিয়ে আনন্দ পাবে সে। 'কিন্তু মনে রেখো, আমার কাছ থেকে সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত কেউ একটা গুলি করবে না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ও। 'উত্তেজিত হয়ে অন্য কাউকে মেরে গোটা ব্যাপারটা পণ্ড করে দাও, তা আমি চাই না। বাড়িটা থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখলেই তাকে শফি বলে মনে করো না। লোকটা যদি শফি হয়, সাথে সাথে আমি ফোনের রিসিভারটা কানের কাছে তুলব। কোন ভুল যেন না হয়।'

'এই এক কথা শুনতে শুনতে পচে গেল কান,' মহা বিরক্তির সাথে মন্তব্য করল টিপু। 'তোমার বুঝি ধারণা, কানে আমরা কম শুনি? কালা?'

'কালা নও,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'বোকা।'

'ভেব না সব কাজেই সর্দারী ফলাতে দেয়া হবে তোমাকে,' বলল টিপু। 'দিন একদিন আমাদেরও আসবে। তখন তোমাকে এক হাত দেখে নেব আমি।'

'চুপ করো!' ঝাঁঝের সাথে বলল শিবানী। 'জানো না বোরহানের পোষা লোক ও? নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চাও?'

তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করল টিপু, কিন্তু আর কোন কথা বলল না।

একটানা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে শিবানী। আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। এবারও অফার করল সগীরকে। কিন্তু নিঃশব্দে মাথা নেড়ে এড়িয়ে গেল সে। গাড়িটা শহরে ঢোকার মুখে নিস্তব্ধতা ভাঙল

রানা।

'ফাইন্যাল চেকআপের জন্যে রমনা পার্কের সামনে থামব আমরা,' বলল ও। 'তারপর ওখান থেকে সরাসরি শশীভূষণ লেনে যাব।'

দশ মিনিট মন্থর গতিতে গাড়ি চালিয়ে রমনা পার্কের সামনে পৌঁছুল শিবানী। গাড়ি থামাতে বলল রানা। নিঃশব্দে ওর নির্দেশ পালন করল শিবানী। একটানা এতক্ষণ গাড়ি চালাবার মাঝখানে একবারও রানার দিকে তাকায়নি সে, বা কোন কথাও বলেনি। গাড়ি থামিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কিন্তু বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাব রয়েছে।

'তোমার রিভলভারটা দাও আমাকে,' টিপুকে বলল রানা।

'কেন? তোমাকে দেব কেন?' ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল টিপু।

'দাও!' কড়া হুকুমের সুরে আবার বলল রানা।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করল টিপু, খানিক ইতস্তত করে বাড়িয়ে দিল সেটা রানার দিকে। এটা একটা কোল্ট পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ। ম্যাগাজিনটা চেক করল রানা, তারপর ফিরিয়ে দিল টিপুকে। সগীরের অস্ত্রটাও চেক করে নিল ও।

'সব ঠিক আছে তাহলে, তাই না?' বলল রানা। 'কি করতে হবে, জানো তোমরা। শফি পড়ে গেলেই ছুটে তার কাছে চলে যাবে টিপু, তার মাথায় নল ঠেকিয়ে গুলি করবে। আমি আর সগীর গাড়ির দিকে ছুটব। তুমি, টিপু, যত তাড়াতাড়ি পারো অনুসরণ করবে আমাদেরকে। গাড়িতে উঠে একসাথে চম্পট দেব আমরা। কোন প্রশ্ন?'

'খোদার দোহাই, তোমার ওই প্যাচাল বন্ধ করো এবার!' ছটফট করে উঠল টিপু। 'যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই চলো।'

'কিন্তু পুলিস যদি বাধা দেয়,' বলল সগীর, 'আমরা কি গুলি করে পথ করে নেব?'

'শুধু যদি কোণঠাসা হয়ে পড়ো, তবেই,' বলল রানা। 'পুলিসকে গুলি করা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসা। গুলি যদি করতেই হয়, পায়ে করো। আর যদি মেরে ফেলো, তুমি শেষ।'

'বাদ দাও ওসব!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল টিপু। 'পুলিস মারার মধ্যেই তো আসল মজা। ওই শালারাই তো আতঙ্কে রেখেছে আমাদেরকে। আমার পথ আগলে দেখুক একবার, টপাটপ ফেলে দেব।'

'রেডি, শিবানী,' বলল রানা। 'শশীভূষণ লেনে চলো এবার।'

রানার দিকে না তাকিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল শিবানী। দু'মিনিট পর ধীর গতিতে গোলাপ কুঁড়ি লেনে ঢুকল ওরা। পৌনে দশটা বাজতে দু'মিনিট বাকি। শশীভূষণ লেনের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল টয়োটা।

'আমি আগে যাচ্ছি,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'টেলিফোনের পোলে আমি উঠে পড়েছি দেখলেই তুমি রওনা হবে, সগীর। টিপু তোমাকে অনুসরণ করবে। তুমি ইঞ্জিন চালু রাখবে, শিবানী।'

কেউ কিছু বলল না। গাড়ি থেকে নেমে এল রানা।

গোলাপ কুঁড়ি লেন থেকে শশীভূষণ লেনে ঢুকল ও। রাস্তার দুই প্রান্তে দুটো লাইট পোস্ট, আলোর কোন অভাব নেই।

নির্জন রাস্তা। মেঘলা আকাশ, একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, দু'পাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা সব বন্ধ। লাইন্স্-ম্যানের যন্ত্রপাতি নিয়ে টেলিফোনের পোলের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। চার হাত-পায়ের সাহায্যে দ্রুত উঠে গেল ওপরে। দাঁড়াবার জায়গায় পৌঁছে আবছা অন্ধকারে পোলের গায়ে হাত বুলাতেই রিভলভারটার স্পর্শ পেল ও। টেপ খুলে হাতে নিল সেটা। একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পয়েন্ট থারটি-এইট। লোড চেক করে নিল ও। সেফটি ক্যাচ অফ করে রেখে দিল পকেটে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নিচে, রাস্তার দিকে তাকাল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সগীর, ওর দিকে হেঁটে আসছে হন হন করে।

ঠিক ওর নিচে দিয়ে এগোচ্ছে সগীর। নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। কর্নেলের বাড়ির পাশ ঘেঁষে কয়েক গজ এগিয়ে একটা গাছের নিচে থামল সে।

গাড়ির দিকে তাকাল রানা। টিপুর ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির ভেতর করছেটা কি! নিশ্চয়ই শিবানী তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর গাড়ি থেকে বেরুতে দেখল রানা টিপুকে। রাস্তা দিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দ সতর্কতার সাথে হেঁটে আসছে সে। কোটরে ঢোকা চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ছুঁচোর মত সরু মুখটা থমথমে। পিলার বক্সের পিছনে পজিশন নিল সে।

গোলাগুলি শেষ হবার আগে আশপাশের বাড়ি থেকে কেউ না বেরুলেই হয়, ভাবছে রানা। এলাকাটা আবাসিক, এত রাতে কেউ বেরুবে বলে মনে হয় না। কিন্তু যদি কেউ বেরিয়ে আসে, সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে ওর।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। এখন পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটেছে প্রতিটি ঘটনা। মিনিটের কাঁটাটা নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে রাত দশটার দিকে। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ও। প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে টয়োটা, আবছাভাবে সেটার কাঠামোটা দেখতে পাচ্ছে ও। কি করছে শিবানী? নির্দেশ অমান্য করে গাড়ি থেকে নেমে আসবে ও? কোন্ রাস্তায় পুলিসের গাড়ি রাখা হয়েছে তাও জানা নেই ওর। সবচেয়ে কঠিন কাজটা পড়েছে পুলিসদের ঘাড়েই। শিবানীকে থামানো সহজ হবে না। ওদের সামনে অসম্ভবকে সম্ভব করার কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু তা ওদের জানা আছে কিনা, সেখানেই রানার সন্দেহ।

টিপুর দিকে তাকাল রানা। পিঠ বাঁকা করে পিলার বক্সের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার সরু পিছনটা আর মাথাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ধীরে ধীরে পকেটে হাত গলিয়ে রিভলভারটা বের করে আনল রানা। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কর্নেল। টেলিফোন সেটটা পোলের গায়ের সাথে আটকে রেখেছে। রিসিভারটায় হাত রাখল ও। তারপর তাকাল সগীরের দিকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে, চোখাচোখি হতে একটা হাত তুলে রানার উদ্দেশ্যে নাড়ল সে। রানাও হাত নাড়ল।

উত্তেজনা বাড়ছে। অসহ্য হয়ে উঠছে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো। সেকেণ্ডের কাঁটাগুলো টিক টিক করে এগোচ্ছে, এক চক্কর শেষ করে শুরু করছে আরেক

চক্কর, মিনিটের কাঁটা এক ঘর থেকে সরে যাচ্ছে আরেক ঘরে। রানার পাঁজরে হাতুড়ির বাড়ি মারতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। ভাবছে, ঠিক এই মুহূর্তে কেমন লাগছে কর্নেলের। একটু ঈর্ষা অনুভব করল ও। কারণ জানে, কর্নেল সম্পূর্ণ শান্ত, স্থির হয়ে আছেন, ভয়ের লেশমাত্র নেই তাঁর মনে। তাঁকে কখনও চঞ্চল হতে দেখেনি ও। এক সাথে কাজ করার সময় এর চেয়েও সাংঘাতিক বিপদে পড়তে দেখেছে তাঁকে, মাথা ঠাণ্ডা রাখায় জুড়ি নেই মানুষটার।

বাদশা লেন থেকে স্যাঁৎ করে বাঁক নিয়ে একটা ট্যাক্সি ঢুকে পড়ল শশীভূষণ লেনে। রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে আসছে। সগীরকে পাশ কাটিয়ে এসে স্পীড কমাচ্ছে। টিপু আর পিলার বক্সটাকে পাশ কাটাল মন্থর গতিতে। আলো দেখে দ্রুত সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল টিপু।

মনে মনে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অভিশাপ দিচ্ছে রানা। উদ্বেগের সাথে কর্নেলের বাড়ির দিকে তাকাল ও। কর্নেলের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ট্যাক্সিটাকে তিনিও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছেন, এবং সম্ভবত ওটা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন বলে ভাবছেন।

টিপুর কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে থামল ট্যাক্সিটা। দরজা খুলে নেমে এল একটা মেয়ে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, রাস্তার কিনারা ধরে কাছাকাছি একটা বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গি দেখে চমকে উঠল রানা। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। চিনতে পারছে তাকে। রূপা।

বাড়িটার সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে রূপা। ঠিক এই সময় একটা গেট খোলার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা। কর্নেলের বাড়ির দিকে চোখ পড়ার আগেই বুঝতে পারল, ট্যাক্সিটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে দাঁড়ানো টয়োটার দিকে। সেই সাথে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। কর্নেলের নিজস্ব প্ল্যানের একটা অংশ এটা। শিবানীকে পালাতে বাধা দেবার জন্যে আমদানী করা হয়েছে ট্যাক্সিটাকে। সম্ভবত ওটার মেঝেতে মাথা নিচু করে শুয়ে আছে পুলিসের লোক। কিন্তু কর্নেলের পিঠ চাপড়াবার সময় এই মুহূর্তে নেই রানার।

গেট খুলে বেরিয়ে আসছেন কর্নেল। গায়ে হালকা একটা কোট চড়িয়েছেন তিনি, মাথায় সুতী কাপড়ের হ্যাট, কোটের পকেটে হাত দুটো ভরে রেখেছেন।

আবার পিলার বাক্সের আড়ালে পিঠ বাঁকা করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে টিপু। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, রিভলভার বের করে ফেলেছে সে। সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করবে না, ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সগীরের দিকে তাকিয়ে আছেন কর্নেল। আর সগীর মুখ তুলে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা টেলিফোনের রিসিভার তুলবে, এই আশায় উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছে সে।

রিভলভার তুলে কর্নেলের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে টিপু।

পয়েন্ট থারটি এইট তাক করেই টিপুকে গুলি করল রানা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে টিপু সামনের দিকে। বুলেটটা শরীরে আঘাত করতেই তার হাতের রিভলভার থেকে বেরিয়ে গেছে একটা গুলি। পড়ে গেছে রিভলভারটা। মাটিতে পড়েই শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে সে, তারপর রিভলভারটা ধরার জন্যে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসছে আবার। কিন্তু হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে,

মাথাটা পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

দুটো গুলির শব্দ হলো। সগীর কর্নেলকে, কর্নেল সগীরকে গুলি করেছেন। প্রায় একই সাথে ছোঁড়া হয়েছে গুলি দুটো, তবে এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের একভাগ আগে গুলি করেছেন কর্নেল। রিভলভার ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতের কব্জির ওপরটা চেপে ধরল সগীর। কব্জি ভেদ করে বুকে ঢুকেছে গুলি।

সগীর পড়ে যাচ্ছে, ছুটে আসছেন তার দিকে কর্নেল। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। মাথা তুলে ফেলেছে টিপু, কুড়িয়ে নেয়া রিভলভারটা আবার তাক করছে কর্নেলের দিকে।

পিস্তলের বাঁট দিয়ে সগীরের মাথায় প্রচণ্ড এক বাড়ি মারলেন কর্নেল। জ্ঞান হারাল সে। গুলি করল রানা। এবার টিপুর মাথায় লক্ষ্যস্থির করেছে ও। মাথাটা ঝাঁকি খেল তার। পিঠ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ধনুকের মত। শরীরটা উল্টে গেল। তারপর স্থির হয়ে গেল সে।

টেলিফোনের পোল থেকে নামতে যাচ্ছে রানা, এই সময় আরেকটা গুলির শব্দ হলো। ওর গালের একটা পাশে ঘষা খেয়ে ছুটে গেল বুলেটটা। তাল হারিয়ে ফেলল রানা, পা পিছলে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। মাথা নিচু করে নিল ও, পরমুহূর্তে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল আরেকটা বুলেট। শিবানীকে দেখতে পাচ্ছে রানা। টয়োটার সামনে, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে একটা মাউজার। ঝট্ করে দিক বদলে কর্নেলের দিকে গুলি করল সে। কর্নেল সগীরের ওপর ঝুঁকে ছিলেন। শরীরটা তীব্র একটা ঝাঁকি খেল তাঁর। হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল। টলমল করছে শরীর। তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন রাস্তার ওপর।

দ্রুত ক্রল করে এগোচ্ছে রানা। হাত তুলে গুলি করতে যাচ্ছে শিবানীকে, কিন্তু প্রথম গুলি শিবানীই করল। রানার মাথার চুল দু'ভাগ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল তার বুলেট। একই সাথে বিদ্যুৎ বেগে খুলে গেল ট্যাক্সির দুদিকের দুটো দরজা, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, দৌড়াচ্ছে শিবানীর দিকে।

'না! সাবধান!' রাস্তা থেকে মাথা তুলে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'পথ আগলাও! রাস্তা বন্ধ করো! ইউ ব্লাডি ফুলস্!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গুলি করে পরপর দু'জনকেই শুইয়ে দিল শিবানী। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল টয়োটায়। ট্যাক্সিটাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পথরোধ করার চেষ্টা করল ড্রাইভার, কিন্তু তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে টয়োটা। ট্যাক্সিটা কয়েক গজ দূরে থাকতেই নিজের পথ করে নিয়েছে শিবানী। রিভলভার তাক করে গুলি করল রানা, টয়োটার পিছনের কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু আবার গুলি করার আগেই নাক ঘুরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে রূপা, ছুটে আসছে কর্নেলের দিকে। সাথে দু'জন পুলিস অফিসার। কর্নেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। কর্নেলকে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখে একটা স্বস্তির পরশ অনুভব করল রানা। ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধটা চেপে ধরে আছেন তিনি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ওদের দিকে ছুটছে, এই সময় একটা পুলিস কার বাঁক নিয়ে ছুটে আসতে শুরু করল রাস্তা ধরে। ওর পাশে এসে ঘ্যাচ্ করে

দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা, দুম করে খুলে গেল দরজা, উঁকি দিল ইন্সপেক্টর তোয়াব খান, 'উঠে পড়ুন, মি. রানা! কুইক!'

গুণ্ডা ডিউক যে মি. রানায় পরিণত হয়েছে, খেয়াল করল না রানা। চট করে গাড়িতে উঠে পড়ল, সাথে সাথে তীর বেগে ছুটল সেটা।

'চিন্তার কিছু নেই, ধরা পড়বে ও।'

প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল রানা। 'আর ধরেছেন! বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম আমি, তারপরও আপনারা পালিয়ে যেতে দিলেন ওকে! কোন্ আক্কেলে আপনাদের ওই লোক দু'জন ছুটল ওর দিকে? আপনাদের একমাত্র কাজ ছিল শিবানীর পালিয়ে যাবার পথ বন্ধ করা...'

উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের চেহারায়। হাসছে সে। বলল, 'বিশ্বাস করুন, পালিয়ে যাবার কোন উপায় নেই ওর। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে রেখেছি আমরা।'

'এখনও চিনতে পারেননি ওকে,' বলল রানা। গালে একটা হাত চেপে রেখেছে ও, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে রক্ত, টপটপ করে ঝরছে কোলের ওপর। জ্বালা করছে ক্ষতটা। 'ওর চেয়ে একটা এক্সপ্রেস ট্রেনকেও থামানো সহজ।'

গোলাপ কুঁড়ি লেনের শেষ মাথায় একজন পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত তুলে বাঁ দিকটা দেখাল সে। বাঁক নিয়ে সেদিকে ছুটল ড্রাইভার।

'প্রতিটি রাস্তায় লোক দাঁড় করানো আছে, মি. রানা,' বলল ইন্সপেক্টর। 'চিন্তার কিছুই নেই। দেখেন না, এই ধরা পড়ল বলে।'

'আপনার ড্রাইভার আরেকটু জোরে চালাতে পারে না?'

এলিফ্যান্ট রোডে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। ষাট মাইল স্পীডে ছুটছে ড্রাইভার। পিজি হাসপাতালের মোড়ে একটা টর্চ লাইট ঘন ঘন কয়েকবার জ্বলল আর নিভল। ট্রাফিক আইল্যাণ্ডকে চক্কর মারতে যাচ্ছিল ড্রাইভার, আলোটা দেখে বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে নিয়ম ভাঙা বাঁক নিল সে, পীচের সাথে ঘষা খেয়ে তীব্র আওয়াজ তুলল চাকাগুলো। ইউনিভার্সিটির দিকে ছুটছে গাড়ি।

'দেখেছেন? সব রকম সতর্কতা নেয়া হয়েছে। পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'ওর কোমরে দড়ি পড়ার আগে পর্যন্ত আপনার কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই আমি,' বলল রানা।

'ওই যে টয়োটা, স্যার!' হঠাৎ বলল ড্রাইভার। পরমুহূর্তে হেডলাইট জ্বালল সে।

আট

হেডলাইটের লম্বা, উজ্জ্বল একজোড়া আলো পড়ল টয়োটার পিছনে।

'অস্থির হবার কিছু নেই,' ড্রাইভারকে বলল ইন্সপেক্টর, 'একটা সংঘর্ষ ঘটতে যাচ্ছে, না থামলে গুঁড়ো হয়ে যাবে টয়োটা।'

'উহ,' তাচ্ছিল্যের সাথে মৃদু শব্দ করল রানা। দুটো পুলিস কার দেখতে পাচ্ছে ও। রাস্তার মাঝখানের আইল্যাণ্ড আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশের ফুটপাথের কিনারা পর্যন্ত বন্ধ করে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি দুটো। গতি কমাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না টয়োটার মধ্যে। শিবানীও তার গাড়ির হেডলাইট জ্বেলেছে। চারজন পুলিসকে দেখতে পাচ্ছে রানা, নিজেদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো নেড়ে টয়োটাকে থামার সঙ্কেত দিচ্ছে। ভয়-ভীতির চিহ্নমাত্র নেই তাদের আচরণে। ধরে নিয়েছে, না থেমে উপায় নেই শিবানীর। সাবধান করার জন্যে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল রানা, কিন্তু ওরা শুনতে পাবার আগেই যা ঘটবার ঘটে যাবে বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো সে।

নির্দয় গোয়ার্তুমির সাথে ওদের দিকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাচ্ছে টয়োটা। প্রায় পৌঁছে গেছে ওদের ওপর, এই সময় একদিকে কাত্ হয়ে গেল টয়োটা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে, ফাঁকটা দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল বিদ্যুতের একটা ঝলকানির মত।

'বলিনি গাড়ি চালাতে পারে?' হতাশার সুরে বলল রানা, ধপাস করে হেলান দিল সীটে।

রাস্তার সাথে প্রচণ্ড ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল ওদের গাড়ির চাকা, তীব্র ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

'চালাও! চালাও!' এই প্রথম অস্থিরতা দেখা গেল ইন্সপেক্টরের মধ্যে। 'অনুসরণ করো ওকে!'

'এখন আর ওকে ধরার কোন আশা নেই,' রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথের ওপর উঠছে ড্রাইভার, এই সময় বলল রানা, 'আর কোন ব্যারিকেড আছে সামনে?'

ফুটপাথ থেকে নেমে আবার স্পীড তুলছে ড্রাইভার। কিন্তু সামনে টয়োটার ছায়া পর্যন্ত নেই।

'হ্যাঁ, না মেনে উপায় নেই! সত্যি গাড়ি চালাতে পারে মেয়েটা!' প্যাকেট ঝেড়ে দুটো সিগারেট বের করে বলল ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে পালাতে পারছে ও। গোটা শহর বন্ধ করে রেখেছি আমরা।'

'আরগুলো যদি প্রথম ব্যারিকেডের মত হয়, একের পর এক অনায়াসে সবগুলো টপকে যাবে শিবানী,' বলল রানা। চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে গাড়ি। ফুটপাথে দাঁড়ানো একজন পুলিস টর্চের আলো দিয়ে বাঁ দিকটা দেখাল ড্রাইভারকে। স্পীড না কমিয়ে চিঁহিঁহিঁহিঁ ডাক ছেড়ে বাঁক নিল ড্রাইভার। দুটো প্রাইভেট গাড়িকে ওভারটেক করেই সাইরেনের বোতাম টিপে দিল সে। রাস্তা পরিষ্কার চাই তার।

'কর্নেলের জখম মারাত্মক...' সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল রানা।

'না,' বলল ইন্সপেক্টর তোয়াব খান। 'কাঁধে লেগেছে গুলি। যেভাবে গালমন্দ করছিলেন, তা থেকে বোঝা গেছে মারাত্মক কিছু নয়। ভালই হয়েছে, এখন আর ক'টা দিন ছুটি না নিয়ে পারবেন না।' সামনে আরেকটা চৌরাস্তা, পুরানো হাইকোর্টের গেটের কাছ থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। বাঁক নিল পুলিস কার। একশো গজও এগোয়নি, আবার সিগন্যাল পেল ড্রাইভার। দুই আইল্যাণ্ডের মাঝখান

দিয়ে তোপখানা রোডে এসে পড়ল ওরা। সাইরেনের শব্দে সাইড নিয়ে গতি কমাচ্ছে সমস্ত প্রাইভেট গাড়ি, কিন্তু প্রেস ক্লাবের কাছে তিন-চারটে রিকশা একে অপরকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছে, অর্ধেকের বেশি রাস্তা জুড়ে তাদের প্রতিযোগিতা চলেছে—এতে অন্যান্য যানবাহনের কতটা অসুবিধে সে-ব্যাপারে পরোয়া নেই। সাইরেনকেও পাত্তা দিল না ওরা। ফলে সবচেয়ে ডানদিকের প্যাসেঞ্জারবিহীন রিকশাটাকে মাডগার্ডের ধাক্কায় চিৎ করতে বাধ্য হলো ড্রাইভার। এগিয়ে চলেছে ঝড়ের বেগে।

'বায়তুল মোকাররমের সামনে চমৎকার একটা ফাঁদ আছে,' দু'টান দিয়েই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ইন্সপেক্টর।

'আগেরটার মত নয় তো?'

'সামনে টয়োটা, স্যার,' জানাল ড্রাইভার। আবার হেডলাইট জ্বালল সে।

শিবানী এখন আগের চেয়ে মন্থর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু পুলিস কারের হেডলাইট জ্বলে উঠতেই গতি বাড়িয়ে দিল সে।

সেকেণ্ড গেটকে ডাইনে রেখে ছুটছে পুলিস কার। ষাট-সত্তর গজ দূরে টয়োটা, প্রায় পৌঁছে গেছে চৌরাস্তার কাছে। আচমকা বাঁক নিয়ে উদয় হলো আরেকটা পুলিস কার, সোজা এগিয়ে আসছে টয়োটার দিকে।

'এবার যাবে কোথায়!' চেঁচিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। 'মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিয়ে থামানো হচ্ছে ওকে। ড্রাইভ করছে রোজারিও, ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে ভাল...'

টয়োটা একপাশে সরে যাচ্ছে দেখে বোবা হয়ে গেল ইন্সপেক্টর। টয়োটাকে সরে যেতে দেখে পুলিস কারও দিক বদল করছে। পরমুহূর্তে ধাতব সংঘর্ষের বিকট আওয়াজ শোনা গেল। পুলিস কারের একপাশে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছে টয়োটা, চোখের নিমেষে উল্টে গেল সেটা। ছুটে চলেছে টয়োটা। সোজা।

'ও কিছু না,' উল্টে পড়া পুলিস কারকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ওরা, বলল রানা, 'একটু আঁচড় লেগেছে মাত্র! যত্তোসব! শিবানীকে ধরার জন্যে ট্যাংক যোগাড় করা উচিত ছিল আপনার।'

মুখের হাসি হারিয়ে ফেলেছে ইন্সপেক্টর। 'আর মাত্র দুটো গাড়ি আছে ওকে বাধা দেবার জন্যে,' চিন্তিতভাবে বলল সে। 'সেগুলোকেও যদি এভাবে ফাঁকি দেয়...'

'আপনার চাকরি যাবে,' বলল রানা।

ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ল ইন্সপেক্টর। 'ধাওয়া করো, রব। পাশে যাবার চেষ্টা করো। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া যায় কিনা দেখো।'

'মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করতে চাইছেন?' বলল রানা। 'অবশ্য এর চেয়ে সহজ রাস্তা নেই আর।'

'যাই বলুন, যেভাবে হোক থামাতে হবে ওকে আমার,' গম্ভীর সুরে বলল তোয়াব খান। 'কর্নেলকে আমি কথা দিয়েছি।'

বায়তুল মোকাররমকে পাশ কাটিয়ে মতিঝিলে চলে এসেছে ওরা। সামনে আরেকটা চৌরাস্তা। বাঁক নিল না টয়োটা। সোজা এগোচ্ছে। পিছনে, পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এসেছে পুলিস কার। স্পীডোমিটারের কাঁটা পঁয়ষট্টির ঘরে থরথর

করে কাঁপছে।

সামনে প্রকাণ্ড গোলাকার শাপলা আইল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে। তিন রাস্তার মাথা এটা। আইল্যাণ্ডটাকে মাঝখানে রেখে ঘুরতে শুরু করল টয়োটা। পরপর তিনবার চক্কর মারল গাড়ি দুটো, একটার পিছনে আরেকটা। তৃতীয় চক্করটা পুরো করে বাঁক নিল টয়োটা, ফিরে যাচ্ছে আগের রাস্তা ধরে। একটু পিছিয়ে পড়েছে পুলিস কার।

সামনে চৌরাস্তা। ইন্সপেক্টর বলল, 'ডি আই টি-র কাছে আরেকটা ফাঁদ আছে...'

'কিন্তু বাঁ দিকে যদি বাঁক নেয় তবে তো!'

চৌরাস্তা পেরিয়ে গেল টয়োটা, সোজা ছুটছে। দুটো গাড়ির দূরত্ব এখন একশো গজের কিছু বেশি হবে। বায়তুল মোকাররমের কোনায় পৌঁছে বাঁ দিকে ঘুরল শিবানী, চাকার সাথে পীচের সংঘর্ষে সচকিত হয়ে উঠল চারদিক। পুলিস কার বাঁক নিচ্ছে,' এই সময় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল তোয়াব খান।

প্রকাণ্ড ভারী ট্রাকটাকে রানাও দেখতে পেয়েছে। রাত দশটার পর ট্রাফিক পুলিস নেই রাস্তায়, উল্টোদিক থেকে তুমুল বেগে ছুটে আসছে সেটা।

ট্রাকটাকে দেখেই পুলিস কারের ড্রাইভার ব্রেক কষেছে।

'মেয়েটার কপাল খারাপ!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তোয়াব খান।

রাস্তার একপাশে সরে যাচ্ছে টয়োটা। ট্রাকটাকে পাশ কাটাতে চাইছে শিবানী। টয়োটার একপাশের চাকা রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। বাড়তে শুরু করেছে ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা, স্টিয়ারিং হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে শিবানী। ট্রাকের নাকের সাথে ধাক্কা খেল টয়োটার পিছনের বাম্পার, ধাক্কা খেয়ে হড়কে গেল টয়োটা। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, গাড়িটা বোধহয় উল্টে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে যেন সেটাকে সিধে করে নিল শিবানী। ছুটছে। তবে যতটা ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটছে, গাড়িটাকে পুরোপুরি আয়ত্তে রাখা এখন আর সম্ভব নয়। সামনে আইল্যাণ্ড, দু'পাশে দুটো রাস্তা চলে গেছে। ট্রাকটাকে পিছনে রেখে এগিয়ে এসেই বিপদ টের পেল শিবানী।

বাঁক নেবার সময় পেল না সে। বিদ্যুৎগতিতে আইল্যাণ্ডের ওপর উঠে পড়ল গাড়ি। সরু আইল্যাণ্ড টপকে ওপারের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে টয়োটা। চোখের পলকে রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের ফুটপাথে উঠে পড়ল, ধাক্কা খেল একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাঁচ লাগানো লম্বা জানালার সাথে। শোকেসে সাজানো দুটো ডামিকে সাথে নিয়ে স্টোরের ভেতর ঢুকে পড়ল টয়োটা। ভেতর থেকে ফার্নিচার ভাঙার আওয়াজ আসছে। হুড়মুড় করে একটা দেয়াল ভেঙে পড়ার শব্দ হলো। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

পুলিস কার থেকে লাফিয়ে নামল রানা আর তোয়াব খান। আইল্যাণ্ড টপকে ছুটছে ওরা। ড্রাইভারও আসছে ওদের পিছু পিছু।

'কাছে পিঠে যত লোক আছে সবাইকে জড়ো করো এখানে,' ড্রাইভারকে বলল তোয়াব খান। 'গোটা এলাকাটা ঘিরে ফেলতে হবে। কুইক!' ড্রাইভার চরকির মত ঘুরে গাড়ির দিকে ছুটল।

রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠল রানা। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মুখ হাঁ করা

জানালার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। মস্ত একটা অন্ধকার গুহার মত লাগছে ফাঁকটাকে। ভেতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাশে এসে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। 'আপনার কাছে রিভলভার আছে?' জানতে চাইল সে। হাঁপাচ্ছে। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলল পিস্তলটা।

'আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু এ বড় ভয়ঙ্কর মেয়ে। আমাকে আগে ঢুকতে দিন।'

'বলেন কি!' লাফ দিয়ে এগোল ইন্সপেক্টর অন্ধকার ফাঁকটার দিকে। 'আপনি তো ওকে দেখলেই গুলি করবেন। কিন্তু গোলাগুলি পছন্দ করি না আমি।' ফাঁকটার মুখে পৌঁচেছে সে, এই সময় গুলি হলো। তোয়াব খানের মাথার একটু ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা।

রানা এবং ইন্সপেক্টর দু'জন একসাথেই শুয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর। হাসছে রানা। 'আপনি পছন্দ না করলে কি হবে, শিবানী আপনাকে পছন্দ করিয়ে ছাড়বে!'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তোয়াব খান। ফাঁকটার একপাশে গিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর একছুটে ঢুকে পড়ল অন্ধকার স্টোরের ভেতর। তাকে অনুসরণ করে রানাও ঢুকল ভেতরে। সামনে আবছাভাবে একটা লম্বা কাউন্টার দেখা যাচ্ছে, দু'জনে গা ঢাকা দিল সেটার আড়ালে।

'আমার কথা শোনো, মা!' হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল তোয়াব খান। 'পালাবার কোন পথ নেই তোমার। ধরা দাও। তোমাকে আমরা আহত করতে চাই না।'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। অন্ধকারে ভৌতিক লাগছে ওর হাসিটা। পরিবেশটাকে আরও বিপজ্জনক করে তুলল শিবানী। আবার গুলি করল সে। রানার কানের দু'ইঞ্চি ডাইনে একটা শেলফে লাগল বুলেটটা। শিউরে উঠল রানা। শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করেছে শিবানী, একটুর জন্যে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।

কাউন্টারের নিচে মাথা নামিয়ে নিয়েছে রানা। 'ওসব ছেলেভুলানো কথায় কাজ হবে না, ইন্সপেক্টর,' বলল ও। 'এখনও চিনতে পারেননি ওকে। কোন ঝুঁকি নিতে যাবেন না। দেখতে পেলে মাথায় নয়তো বুকে গুলি করবে, আপনার মত পায়ে নয়। কাজেই সাবধান।'

উত্তর করল না তোয়াব খান। কাউন্টারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে সে সামনের দিকে।

মাথা তুলে কাউন্টারের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা। দূর থেকে রাস্তার ক্ষীণ আলো এসে ঢুকেছে স্টোরের ভেতর। অন্ধকার ফিকে হয়নি তাতে, আরও যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এটা একটা প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, প্রথম ঘরটা থেকে অন্যান্য হলঘরেও যাওয়া যায়। যতদূর মনে পড়ছে রানার, এই স্টোরের ঠিক পিছনেই একটা ব্যাংক আছে, এই স্টোরের পিঠা-পিঠি—একই দেয়াল। পিছনে আরেকটা রাস্তার দিকে ব্যাংকের প্রবেশ পথ। টয়োটার ধাক্কায় পার্টিশন ওয়াল ভেঙে পড়েছে, কথাটা মনে আছে ওর। শিবানী যদি কোনরকমে ব্যাংকে গিয়ে ঢোকে যদিও মেইন কোলাপসিব্‌ল্ গেটটা বন্ধই থাকবে, তবু ওকে ধরা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার দৃষ্টি। বিধ্বস্ত টয়োটার একপাশে কি যেন নড়ে উঠেছে। এখন আর কিছু টের পাচ্ছে না ও। সেদিকে রিভলভার তাক করে একটা গুলি করল ও। গাড়ির গায়ে গিয়ে লাগল বুলেটটা, তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে কেঁপে উঠল বাতাস। গুলি করেই মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিল বলে বেঁচে গেল রানা। শিবানীর বুলেটটা কাউন্টারের ছাল তুলে নিয়ে রানার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল। নিরাশ হয়ে পিছিয়ে আসছে তোয়াব খান। রানার পাশে এসে থামল সে।

'উঁহুঁ,' ফিসফিস করে বলল সে, 'এভাবে হবে না। আমার লোকেরা নিশ্চয়ই এরই মধ্যে পজিশন নিয়েছে, পালাবার কোন উপায় নেই ওর। আলো জ্বালার কি ব্যবস্থা করা যায় দেখতে যাচ্ছি আমি।' কাউন্টারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

হলঘরে রানা একা। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু কিছুই নড়তে দেখছে না। এদিক সেদিক অনেক মূর্তির আবছা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে ও, ওগুলোর মধ্যে কোন্‌টা ডামি আর কোন্‌টা শিবানী বোঝা কঠিন। নাকি ভাঙা দেয়াল গলে সরে গেছে শিবানী? কোণঠাসা হয়ে পড়লে বা আলো জ্বলে উঠলে সাংঘাতিক মরিয়া হয়ে উঠবে শিবানী, জানে ও। গুলি করতে করতে পথ তৈরি করে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবে এখান থেকে। তার আগেই যদি তাকে ধরা যায়, কয়েকজনের প্রাণ বেঁচে যাবে।

ভাল করে হলঘরটাকে লক্ষ করছে রানা। বাঁ দিকে একটা প্যাসেজ, দু'পাশে জিনিসপত্রে ঠাসা কাঠের শেলফ, খানিকদূর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে, তারপরই গাঢ় অন্ধকার। ডান দিকে উঁচু একটা মঞ্চ, ওপরে অনেকগুলো ডামির কাঠামো। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আরও সামনে আরও কয়েকটা ডামি।

যেখান থেকে শেষবার গুলি করেছে শিবানী সেখানে এখন সে নেই, ধারণা করল রানা। হয় দেয়াল গলে বেরিয়ে গেছে, নয়তো গাড়ির আড়াল থেকে সরে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। সন্দেহ নেই, সুযোগের সন্ধানে আছে সে। জানে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা না কমিয়ে এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়। কারও অস্তিত্ব টের পেলেই গুলি করবে সে।

তবু ঝুঁকিটা নেবে বলে স্থির করল রানা। মাথা নিচু রেখে ধীর পায়ে এগোল।

পিছনে চাপা গলা শুনতে পেল ও। কিন্তু তাকাল না। তোয়াব খান লোকজন নিয়ে আবার স্টোরের ভেতর ঢুকেছে, সুইচ বোর্ড খুঁজছে ওরা। ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এল রানা। হাতড়ে দেখে নিচ্ছে টুল, চেয়ার, নিচু টেবিলগুলো, একটা শেলফের গা ঘেঁষে একটু একটু করে এগোচ্ছে বিধ্বস্ত গাড়িটার দিকে। লোকজনের চাপা গলার আওয়াজ আরও দূরে সরে গেছে। স্টোরে ঢোকার মুখেই সরু একটা করিডর চলে গেছে ডান দিকে, লোকজন নিয়ে সেদিকে চলে গেছে তোয়াব খান। দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে সময়। যে-কোন মুহূর্তে সুইচ বোর্ড পেয়ে যেতে পারে ওরা।

আর মাত্র আট-দশ গজ দূরে গাড়িটা। সন্তর্পণে আরও দু'পা এগোল রানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। আচমকা অপ্রত্যাশিত ভাবে পিছনে খসখসে একটু শব্দ হলো। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার আগেই ঠাণ্ডা দুটো হাত ওর গলা চেপে ধরল। শক্ত কঠিন একটা হাঁটু এসে পড়ল ওর শিরদাঁড়ার ওপর। তীব্র ঝাঁকি

খেয়ে সামনের দিকে ছিটকে গেল রানা। হাত থেকে পড়ে গেল রিভলভার। শক্ত মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ল ও, ওর পিঠের ওপর পড়ল ভারী একটা বস্তার মত শিবানী। ইস্পাতের মত কঠিন দশটা আঙুল চেপে বসেছে চারদিকে।

পিঠে শিবানীকে নিয়ে হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করছে রানা। ধীরে ধীরে কনুই থেকে শরীরের ভার কমিয়ে হাঁটুর ওপর চাপাচ্ছে ও। মাংসের ভেতর দেবে যাচ্ছে শিবানীর আঙুলগুলো, দম বন্ধ হয়ে আসছে রানার। মেঝে থেকে তুলে শিবানীর মাথাটা ধরার জন্যে একটা হাত উঁচু করল ও, ঝট্ করে একপাশে মাথা সরিয়ে নিল শিবানী। গলার ওপর চাপ ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে সে। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, বুঝতে পারছে রানা। যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে ও। শিবানীর দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হবে নিজেকে। গোড়ালির ওপর শরীরের ভর চাপিয়ে পিছন দিকে লাফ দিল রানা। সাথে সাথে ঢিল করে দিল সমস্ত পেশী। মেঝের ওপর পড়ল শিবানী, তার ওপর রানা। ওর শরীরের চাপে ব্যথা পেয়েছে শিবানী। নিজের অজান্তে ছেড়ে দিয়েছে রানার গলা। মেঝেতে পা ঠেকিয়ে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, এক গড়ান দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শিবানী। দম ফেলার সময় দিল না রানা, শোয়া অবস্থা থেকেই পা ছুঁড়ল ও।

রানার দু'পায়ের মাঝখানে আটকা পড়ল শিবানীর একটা পা, চাপ বাড়াল রানা, পাশ ফিরল সাথে সাথে। দড়াম করে রানার ওপর পড়ে গেল শিবানী। দুই হাতে ঘুসি চালাচ্ছে সে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল রানা। কিন্তু ওর আগেই উঠে দাঁড়াল শিবানী। বিদ্যুৎগতিতে একটা পা ছুঁড়ল সে, জুতোর ডগাটা রানার মাথার এক পাশে এসে লাগল। টলে উঠল রানা। পড়ে গেল। কি করছে ভাল করে জানে না, কিন্তু চিবুক লক্ষ্য করে শিবানীকে আরেকটা লাথি মারতে দেখে মাথা সরিয়ে নিল চট করে। দ্বিতীয় লাথিটা মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল। লাথিটা কোথাও না লাগায় শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে শিবানীর, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার অপর পা-টা ধরল রানা, হ্যাঁচকা টান মারতেই আবার ওর শরীরের ওপর ধপাস করে পড়ল সে। আবার রানার মাথায় ঘুসি মারছে। কিন্তু এবার রানা তার পাঁজরে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে। হুস্ করে বাতাস বেরিয়ে এল শিবানীর নাক মুখ দিয়ে, ছিটকে দূরে সরে গেল শরীরটা। সেই সাথে দপ্ করে জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধানো আলো।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল দু'জনেই। হাঁপাচ্ছে। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরছে শিবানী, ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। মাউজারটা বের করে ফেলেছে শিবানী, তাকে নিয়ে দড়াম করে পড়ল রানা মেঝেতে। পরস্পরের দিক পা ছুঁড়ছে ওরা, ধস্তাধস্তি করছে। খপ্ করে হাত বাড়িয়ে শিবানীর কব্জিটা ধরতে চেষ্টা করল রানা, ধরেও ফেলল, কিন্তু একই সাথে ভারী পিস্তলটা ঠকাস করে পড়ল ওর মাথায়। চোখের সামনে অন্ধকার দেখছে রানা। শিবানীর কব্জি চেপে ধরা হাতটা নেতিয়ে পড়ল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল তোয়াব খান আর একজন কনস্টেবল ছুটে আসছে ওর দিকে।

গড়িয়ে সরে গেল শিবানী, ঝট্ করে হাত তুলেই গুলি করল। মাত্র দু'গজ দূর থেকে গুলি খেল কনস্টেবল। ধাক্কা খেয়ে থমকে গেল ছুটন্ত শরীরটা। পিছন থেকে এসে তার সাথে ধাক্কা খেল ইন্সপেক্টর। তোয়াব খানকে নিয়ে মেঝের ওপর পড়ল লাশ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শিবানী। গায়ের ওপর থেকে কনস্টেবলের লাশটাকে সরিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে তোয়াব খানও। কিন্তু তাড়া করার আগেই ছুটে চলে গেল শিবানী বিধ্বস্ত টয়োটার আড়ালে। এখনও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে তার। ভাঙা দেয়াল গলে পিছনের ব্যাংকে গিয়ে ঢুকেছে সে। পালাবার এটাই তার একমাত্র পথ।

মাথাটা এদিক ওদিক ঝাঁকাচ্ছে রানা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ও। টয়োটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তোয়াব খান, দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল ও, 'দেখামাত্র গুলি করবেন। আহত না করে এখন আর ধরা সম্ভব নয় ওকে।' মাথাটা এখনও ঘুরছে ওর। কিন্তু ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করতে দেরি করল না। শিবানী যদি একটা ফোন করার সুযোগ পায়, বা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে পারে, ওর আর ফেরা হবে না হেডকোয়ার্টারে।

ভাঙা দেয়াল টপকে মস্ত একটা হলঘরে এসে দাঁড়াল রানা। একটা ব্যাংকের হেড-অফিস এটা। তোয়াব খান সিঁড়ির প্রথম ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেছে, ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ছুটল রানা। শিবানীর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও। দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে যাচ্ছে।

পিছনে দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল রানা। তোয়াব খান পরবর্তী সিঁড়ির প্রথম ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছে গেছে। এই সময় সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল শিবানীকে। তৈরি ছিল রানা, তোয়াব খানের পাশে উঠে এসেই গুলি করল ও। স্যাৎ করে মাথাটা সরিয়ে নিল শিবানী। তার ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। এক সাথে তিনটে করে ধাপ টপকে ওপরে উঠছে রানা। পিছনে তোয়াব খান আর কনস্টেবল।

তিন তলায় উঠতে চারটে ধাপ বাকি, এই সময় শিবানীকে দেখতে পেল রানা। একটা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রানাকে দেখেই গুলি করল সে। বসে পড়ল রানা ধাপের ওপর। পরমুহূর্তে দড়াম করে শব্দ হলো একটা। ছোট একটা কামরার ভেতর ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে শিবানী।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিন তলায় উঠে এল ওরা। বন্ধ কামরার দরজায় লেখা রয়েছে—চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

'সর্বনাশ!' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে ওখানে!' ছুটল ও। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল দরজার গায়ে। দরজার ওদিকে গর্জে উঠল রিভলভার, কবাট ফুটো করে বেরিয়ে এল একটা বুলেট, কয়েক ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারল না রানাকে। লাফ দিয়ে সরে আসছে রানা, আবার গর্জে উঠল রিভলভারটা।

'সাবধান!' খামোকা চেঁচিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর।

আধপাক ঘুরেই একটা জানালার দিকে ছুটল রানা। ধাক্কা দিয়ে কাঁচ লাগানো কবাট খুলে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। সরু একটা কার্নিস দেখা যাচ্ছে, সোজা

চলে গেছে পাশের কামরার জানালার নিচে দিয়ে, যে কামরাটায় রয়েছে শিবানী।

'দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওর মনোযোগ ধরে রাখুন,' তোয়াব খানকে বলল ও। 'এদিক থেকে দেখি আমি ওকে ধরা যায় কিনা।'

লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে বসল রানা, শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে পা রাখল সরু কার্নিসে। পায়ের ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে নিচে। ভারী কিছু একটা দিয়ে দরজার গায়ে বাড়ি মারছে পুলিস, শুনতে পাচ্ছে ও। দেয়ালে মুখ চেপে রেখে একটু একটু করে এগোচ্ছে রানা। প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মহা মূল্যবান। শিবানী যদি ফোন করতে পারে, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। জানালাটা হাতের নাগালে চলে এসেছে। নিঃশব্দে এগোল রানা। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

ওর দিকে পিছন ফিরে একটা ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। ফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে। রিভলভারটা পড়ে রয়েছে ডেস্কের ওপর। ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে, বুঝতে পারছে রানা। কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে যে যেভাবে হোক এখুনি থামানো দরকার শিবানীকে। দ্রুত, নিঃশব্দে জানালার ওপর উঠে বসল ও। ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলল কাঁচ, লাফ দিয়ে পড়ল কামরার ভেতর।

রিসিভার ছেড়ে দিয়ে খপ্ করে রিভলভারটা তুলে নিচ্ছে শিবানী, একই সাথে তার পায়ে এসে লাগল রানার লাথিটা। পড়ে গেল শিবানী, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। কে যেন কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল দরজার গায়ে।

হিংস্র, বুনো বিড়ালের মত রানার চোখ মুখ আঁচড়াবার চেষ্টা করছে শিবানী। ধস্তাধস্তি করে তার সাথে পেরে উঠছে না রানা। শরীরের ওজন চাপিয়ে দিয়ে আটকাতে চাইছে তাকে। রানাকে ছেড়ে দিয়ে রিভলভারটার দিকে ডাইভ দিল সে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল তোয়াব খান, পিছনে দু'জন কনস্টেবল।

রিভলভারটা তুলে নিচ্ছে শিবানী, তার পিঠের ওপর এসে পড়ল রানা। এগিয়ে এসে শিবানীর রিভলভার ধরা হাতে একটা লাথি মারল তোয়াব খান। কনস্টেবলরা ঝুঁকে পড়ে তার হাত দুটো ধরে ফেলল শক্ত করে।

শিবানীকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। কনস্টেবলরা শিবানীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছে। ঠেলে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো দেয়ালের কাছে। রিসিভারটা তুলে ক্রাডলে রেখে দিল রানা।

'বেজন্মা বেঈমান!' রানার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল শিবানী। পুলিসদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে সে। 'হাজারবার করে বলেছি ওদেরকে আমি, এই কুত্তাটাকে বিশ্বাস করো না…'

এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় মারল তোয়াব খান শিবানীর গালে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোমল সুর, 'ছিঃ, মা, এসব গালাগাল মেয়েদের মুখে মানায় না। সময় হয়ে এসেছে, এবার একটু আল্লা-খোদার নাম করলেই তো পারো।'

'এখান থেকে নিয়ে যাও ওকে,' শান্ত গলায় বলল রানা।

কনস্টেবলরা টেনে হিঁচড়ে কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে শিবানীকে। থোঃ করে একদলা থুথু ছুঁড়ল সে রানার দিকে। দ্রুত সরে গেল রানা। শিবানীর চোখে প্রচণ্ড ক্রোধ আর তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি লক্ষ করে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ও।

নয়

'এবার আমাকে যেতে হয়,' বলল রানা।

ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ও। শিবানীকে নিয়ে এইমাত্র রওনা হয়ে গেছে একটা পুলিস কার, রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর তোয়াব খান, আয়েশ করে সিগারেটে টান দিচ্ছে সে।

'কি করতে হবে সব জানা আছে কর্নেলের,' বলে চলেছে রানা। 'ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সমস্ত দৈনিক খবরের কাগজের অফিসে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেছে। আশা করি খুব বড় হরফে ছাপা হবে খবরটা। বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই।'

'তা হবে,' বলল তোয়াব খান। 'এবার আপনার কাজ কি?'

'বোরহানের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'ওর সাথে ওদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব। আশা করছি, এবার আমি ওদের পূর্ণ সদস্যপদ পাব। ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে লীডারকে বাগে পাওয়া কঠিন হবে না।'

'ছাত্রনেতা আর যে তিনজন রাজনীতিকের নাম আপনি জানিয়েছেন তাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে,' বলল তোয়াব খান। 'কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে কেউই সন্দেহজনক কোন আচরণ করেননি। এই তিন রাজনীতিকের মধ্যে একজন কালপ্রিট, কেন যেন বিশ্বাস হয় না আমার।'

'বিশ্বাস না হবারই কথা,' বলল রানা। 'কিন্তু এদের মধ্যেই লীডার আছে, আমি শিওর।' একটা সিগারেট ধরাল ও। 'তার পরিচয় জানতে পারলেই জাল গুটিয়ে আনা যায়। সেজন্যেই ফিরে যাচ্ছি আমি। ভাল কথা, কর্নেলের ভাগ্নীকে বোরহানদের হেডকোয়ার্টারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। এই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।'

'মিস রূপার কথা বলছেন, স্যার?' গর্বের হাসি দেখা গেল তোয়াব খানের মুখে। 'যেমন মামা তেমনি তার ভাগ্নী। ক'দিন মাত্র চাকরিতে ঢুকে গোটা প্রতিষ্ঠানের চেহারা বদলে দিয়েছেন তিনি। দু'বছরের ট্রেনিং কোর্স, বিশ্বাস করবেন না, মাত্র সাতদিনের মধ্যে খতম করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। বড় বড় অফিসারদের এমন সব ভুল ধরছেন, তাঁর সামনে আসতে এখন বুক কাঁপে সবার। তাঁকে আর কি সাবধান করব, বলুন! কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তা তাঁর ভালই জানা আছে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'তবু তাকে সাবধান করা উচিত। আপনি তাকে আমার কথা বলবেন। আর কর্নেলকে আমার শুভ কামনা জানাবেন।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। তাকে অনুসরণ করছে অসংখ্য দর্শকের চোখ। অপেক্ষারত একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল সে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ফাঁকটাকে ঘিরে বিরাট একটা ভিড় জমে উঠেছে। সেটাকে ছত্রভঙ্গ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে পুলিস।

সাড়ে এগারোটা বাজে। নীলক্ষেতের আরেকটু আগে গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল

ও। পায়ে হেঁটে বাঁক নিয়ে বলাকার দিকে এগোচ্ছে। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসেনটা তোয়াব খানের কাছে রেখে এসেছে ও। জানে, বোরহান দেখে ফেললে গুবলেট হয়ে যাবে সব।

দূর থেকে ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগনটা দেখতে পাচ্ছে রানা। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বোরহান। জোনাকীর মত ম্লান আলো জ্বলছে নিভছে তার মুখের সামনে। বুঝল, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। রানাকে দেখতে পেয়েই হাত নাড়ল সে, দ্রুত সেঁধিয়ে গেল গাড়ির ভেতর। রানাও উঠল গাড়িতে।

ড. সমুদ্র গুপ্তের কামরা। ডেস্ক ল্যাম্পের পুরো আলোটা রানার মুখের ওপর পড়েছে। ডেস্কের সামনে বসে আছে ও। উজ্জ্বল ল্যাম্পের পিছনের ছায়ায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেছে সমুদ্র গুপ্ত। রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে সে। তার পাশে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যেন কাপালা। কামরার আরেক প্রান্তে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে বোরহান।

'শিবানী তাহলে পালিয়ে গেছে!' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বলল শ্যেন কাপালা। 'অসম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'আমি করি,' বলল বোরহান, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। 'বিদেশী মেয়ে, গোটা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বই বোঝে না সে। তাছাড়া রানাকে দেখতে পারে না দু'চোখে।'

'কিন্তু রানাকে দেখতে না পারার সাথে এর কি সম্পর্ক?' ঘাড় ফিরিয়ে বোরহানের দিকে তাকাল সমুদ্র গুপ্ত।

'রানার বিপদ দেখে ভেবেছে, মরুকগে,' বলল বোরহান। 'সাহায্য না করে গা বাঁচিয়ে কেটে পড়েছে। আমি ভাবছি এখনও সে ফিরে আসছে না কেন?'

'কে জানে, হয়তো বেশি চালাকি করতে গিয়ে পুলিসের হাতেই ধরা পড়েছে,' বলল রানা। 'একটা গাড়ি নিয়ে পালানো সহজ কাজ নয়। সেজন্যেই চৌরাস্তার কাছে টয়োটা নিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম ওকে। কানে তোলেনি আমার কথা, তার ফল তো ভোগ করতে হবেই।'

'পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে শিবানী?' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল শ্যেন কাপালার চোখ দুটো। 'অসম্ভব! হতে পারে না। ধরা পড়ার মেয়ে শিবানী নয়।' সমুদ্র গুপ্তের দিকে তাকাল সে। 'ফারুক ফোন করছে না কেন?'

রিস্টওয়াচ দেখল গুপ্ত। 'হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে তার ফোন। ফুল রিপোর্ট চেয়েছি তার কাছ থেকে, সেজন্যেই বোধহয় দেরি হচ্ছে। অথবা শিবানীর খবর পাবার অপেক্ষায় আছে সে।'

'শ্যেন কাপালা আর আপনি নিরাশ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি তো আগেই বলেছিলাম, কিছু ত্যাগ স্বীকার না করলে শফিকে মারা যাবে না।'

'তা বলেছিলে,' সিগারেট ধরাল শ্যেন কাপালা। লাইটারের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার কঠোর চেহারা। 'কিন্তু শফি যে মারা গেছে তা এখনও আমরা জানতে পারিনি। তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট বলে মনে করা যায় না।'

'তোমাদের হয়েছেটা কি?' বলল বোরহান, এগিয়ে আসছে ডেস্কের দিকে। 'আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, কাজেই তোমাদেরও তাই হওয়া উচিত। ভয়ঙ্কর আর অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। রানা যা করেছে, এর বেশি আর কি আশা করো তোমরা?'

'শফি যদি সত্যিই মারা পড়ে থাকে তাহলে সন্দেহ নেই, যথেষ্ট ভাল করেছে রানা,' বলল শ্যেন কাপালা। 'কিন্তু শফি কি সত্যি মারা গেছে? দেখা যাক।'

গালের ক্ষতটার চারদিকে হাত বুলাচ্ছে রানা। জ্বালা করছে জায়গাটা। এরা যে ওকে সন্দেহ করবে, জানা ছিল তার। সেজন্যে অস্বস্তি বা উদ্বেগ বোধ করছে না। কর্নেলের মৃত্যু সংবাদ রটাবার ব্যাপারে ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের ওপর ভরসা রাখতে পারে ও।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, কিন্তু এখন আর কথা বলছে না কেউ। সময় বয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষা করছে ওরা সবাই। দশ মিনিট কেটে গেল। তারপর ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল সমুদ্র গুপ্ত।

'ইয়েস?' শ্যেন কাপালার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ফারুকের ফোন।' তারপর মাউথ পীসের উদ্দেশ্যে বলল, 'শুরু করো, আমি তৈরি।'

চুপচাপ শুনছে সমুদ্র গুপ্ত, নির্লিপ্ত নির্বিকার চেহারা। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল বোরহান। আরেক পাশে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে শ্যেন কাপালা। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে রানা, ঢিল করে দিয়েছে শরীরটা, আয়েশ করে সিগারেট ফুঁকছে। কিন্তু মনের ভেতর তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর। খবর সংগ্রহের জন্যে নিজস্ব লোক আছে এদের, তারা যদি আসল ঘটনা আঁচ করতে পারে, তাহলেই সর্বনাশ। ওর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে এই রিপোর্টটার ওপর।

বোরহানের সমর্থন পেয়েছে ও। শ্যেন কাপালার মনে সন্দেহ। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে সমুদ্র গুপ্ত। কিন্তু বোরহান ওর গল্পটা কোনরকম ইতস্তত না করে সম্পূর্ণটাই গ্রহণ করেছে। লক্ষণটা ভাল। বোরহানের সমর্থন এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে-ই এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

ঝাড়া কয়েক মিনিট ধরে নিঃশব্দে অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনল সমুদ্র গুপ্ত। মাঝে মধ্যে নোট নিচ্ছে সে। অবশেষে বলল, 'ঠিক আছে। আর কোন খবর হলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।' রিসিভার রেখে দিল সে।

'কি বলল?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইল শ্যেন কাপালা। 'শফি মারা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল গুপ্ত। তার চোখে বিজয়ের উল্লাস। 'সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ফারুক নিজে কথা বলেছে ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের সাথে। কাল সমস্ত কাগজে ছাপা হবে খবরটা।

নিঃশব্দে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

'শিবানী?' জানতে চাইল শ্যেন কাপালা।

'পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। রানার কথা সব সত্যি। গোলাগুলি শুরু হবার সাথে সাথে কেটে পড়ে শিবানী। পুলিস তাকে ধাওয়া করে। জি. পি. ও-র

উল্টোদিকে অ্যাক্সিডেন্ট করে সে। একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ভেতর ঢুকে পড়েছে তার গাড়ি, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। ওখান থেকেই তাকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিস। এখন সে রমনা থানায়।'

'আর সগীর?'

'সে-ও রমনা থানায়। টিপু মারা গেছে।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে শ্যেন কাপালার চেহারা। 'ওরা দু'জন কথা বলবে বলে মনে হয়?'

'শিবানী বলবে না,' বলল বোরহান। 'কিন্তু সগীর বলতে পারে। ওর ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে।'

'কিন্তু কি?' জানতে চাইল সমুদ্র গুপ্ত। চেহারায় উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে তার। 'কি করার আছে আমাদের?'

নির্দয় হাসি দেখা গেল বোরহানের ঠোঁটে। 'ওর একজন উকিল দরকার। আর উকিলেরা সাথে ব্রীফকেস রাখে। ওর সাথে দেখা করে উকিল যখন ব্রীফকেসটা খুলবে···বুম! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে নাম-নিশানা পর্যন্ত গায়েব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল শ্যেন কাপালা। তাকাল রানার দিকে। 'খুব ছোট হতে হবে বোমাটা। পারবে তুমি বানাতে?'

'তা পারব,' বলল রানা। 'কিন্তু উকিলের ওপর অন্যায় করা হবে না?'

'উকিলের কপাল মন্দ,' বলল বোরহান, হাসছে সে। 'তুমি বোমাটা বানাবে, আর আমি সেটা ব্রীফকেসে ভরার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু শিবানীর ব্যাপারে কি করব আমরা?' জানতে চাইল শ্যেন কাপালা।

'হ্যাঁ, শিবানীর জন্যে কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে,' বলল বোরহান। ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ভরে পায়চারি শুরু করল সে। 'প্রথমে চেষ্টা করে দেখতে হবে হাজত থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা যায় কিনা। সংগঠনের জন্যে একটা সম্পদ সে।'

অকস্মাৎ ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল আবার টেলিফোনটা। চমকে উঠল রানা। কেন যেন, সবাই একবার চট্ করে তাকাল ওর দিকে।

ফোনের রিসিভার তুলে নিল সমুদ্র গুপ্ত। কি শুনল কে জানে, মুহূর্তে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, চেহারায় আশ্চর্য একটা ব্যাকুলতা ফুটে উঠল।

ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার মনে। কে ফোন করেছে? জানাজানি হয়ে গেছে যে কর্নেল মারা যায়নি?

গভীর মনোযোগের সাথে অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনছে সমুদ্র গুপ্ত। শোনার ফাঁকে ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল একবার। 'ইয়েস স্যার!···ইয়েস স্যার···আই সি···ইয়েস স্যার···' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

'লীডার?' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল বোরহান।

'এত রাতে··· কি বললেন?' গুপ্তের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল শ্যেন কাপালা।

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সমুদ্র গুপ্ত। 'আসছেন।'

'লীডার আসছেন?' চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অবিশ্বাসে দম আটকে যাচ্ছে বোরহানের।

'কিন্তু কেন?' ফিস ফিস করে জানতে চাইল শ্যেন কাপালা। 'কি বললেন তিনি?'

এখনও রানার দিকে তাকিয়ে আছে সমুদ্র গুপ্ত। 'বললেন, আমি আসছি। কাউকে যেন এখান থেকে বেরুতে দেয়া না হয়।'

'ব্যস, শুধু এইটুকু?' রুদ্ধ শ্বাসে জানতে চাইল বোরহান। 'আর কিছু বলেননি?'

'না, আর তেমন কিছু বলেননি,' রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল সমুদ্র গুপ্ত। 'আর শুধু জানতে চাইলেন, মাসুদ রানা এখানে আছে কিনা।'

'ব্যাপারটা কি আপনি জিজ্ঞেস করলেন না কেন?' বলল বোরহান।

'কিভাবে জিজ্ঞেস করব?' শান্তভাবে বলল গুপ্ত। 'তিনি নিজেই বললেন, আমি গেলেই সব বুঝতে পারবে।'

সমুদ্র গুপ্তের দেখাদেখি এবার শ্যেন কাপালা আর বোরহানও তাকাল রানার দিকে।

জোর করে হাসল রানা। বলল, 'হয়তো আমার কৃতিত্বের কথা শুনেছেন তিনি। প্রশংসার দুটো কথা শোনাতে চান, তাই আসছেন।' কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল, তার প্রকৃত পরিচয় জেনে ফেলেছে লীডার লোকটা, নয়তো খবর পেয়েছে কর্নেল মারা যায়নি। যাই ঘটে থাকুক, অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করছে ও, লোকটা তার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে।

'কিন্তু কাউকে এখান থেকে বেরুতে দিতে নিষেধ করলেন কেন বুঝতে পারলাম না,' বলল বোরহান।

'তিনি হয়তো খবর পেয়েছেন এখানে আমাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক আছে,' বলল শ্যেন কাপালা।

'এ আর নতুন কথা কি,' বলল রানা। 'আমিও তো তোমাদেরকে বলেছি, এই সংগঠনে শফির লোক অনুপ্রবেশ করেছে। আমারও ধারণা, সেজন্যেই আসছেন লীডার। যাই হোক, তিনি এলেই সব বোঝা যাবে।' বোরহানের দিকে তাকাল ও। 'আমি ক্লান্ত বোধ করছি। লীডার এলে খবর দিয়ো আমাকে। আমি শুতে যাচ্ছি।'

হলুদ দাঁত বের করে সমুদ্র গুপ্ত হাসল। রানার চোখে চোখ রেখে বলল সে, 'এক মিনিট, রানা। তোমার কাজে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আজ থেকে নিজেকে তুমি এই সংগঠনের একজন সদস্য বলে মনে করতে পারো। তোমার ওপর এখন আর কোন বাধা-নিষেধ নেই। কাল সকালে বাকি আড়াই লাখ টাকা তুমি পেয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, বোরহানের জন্যে ওই ছোট্ট বুবি-ট্র্যাপটা কালকের মধ্যেই তৈরি করে দিতে ভুলো না। দিন কয়েকের মধ্যেই আরও একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হবে তোমাকে। তাতেও অনেক টাকা পাবে তুমি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চমৎকার!' খুশি হয়েছে ও। 'যখনই বলবেন, আমি রেডি।'

'তোমার ওপর আমাদের কোন বাধা-নিষেধ না থাকলেও,' বলে চলেছে সমুদ্র গুপ্ত, 'ভুলে যেয়ো না যে একজন সেক্রেটারিকে খুন করার অভিযোগে পুলিস তোমাকে খুঁজছে এখনও। সব রকম সতর্কতা বজায় রেখে চলা উচিত তোমার।'

'কিন্তু ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে এবার আপনাদের কিছু একটা করা উচিত নয়?' বলল রানা। 'আপনাদের কাজ করতে হলে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ থাকতে হবে আমার।'

'আমার তো মনে হয় না এ-ব্যাপারে কিছু করার আছে আমাদের,' বলল সমুদ্র গুপ্ত। 'তবে বোরহান হয়তো কোন পরামর্শ দিতে পারে।'

'রানা ঠিক বলেছে,' বলল বোরহান। 'ওকে যদি কাজে লাগাতে হয়, যেভাবে হোক খুনের অভিযোগটা ওর ওপর থেকে তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, খুনটা তো আর ও করেনি। শর্মিলী আত্মহত্যা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আত্মহত্যার আগে একটা জবানবন্দীতে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে যাবে সে। ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা আমিই করব।'

'দেখলে তো, রানা,' সহাস্যে বলল গুপ্ত, 'আমাদের বন্ধু বোরহানের কাছে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান হয় না। যাই হোক, শর্মিলী আত্মহত্যা না করা পর্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করতে হবে তোমাকে। আর হ্যাঁ, আজ রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ো না। লীডার কি বলেন শোনা যাক আগে।'

'বেরুব না,' বলল রানা। এদের কাছ থেকে সরে যাবার জন্যে মনে মনে ছটফট করছে ও। কিন্তু ওরা কেউ যেতে না বললে যেতে পারছে না। বিপদ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে, তার আগেই এদেরকে সন্দিহান করে তুলতে চায় না ও।

'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো,' বলল বোরহান।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ ঘরের আলো নিভে গিয়েই জ্বলে উঠল। এক সেকেণ্ড পর আবার। নিভল, জ্বলল।

'স্টেশনে ঢুকেছে কেউ!' চেঁচিয়ে উঠল বোরহান, লাফ দিয়ে ছুটল দরজার দিকে।

'গার্ডরা করছে কি?' রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সমুদ্র গুপ্তের চেহারা। দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে। 'বেড়া টপকে ভেতরে আসা কিভাবে সম্ভব!'

উত্তর না দিয়ে রানার কনুইয়ের পিছনটা চেপে ধরল বোরহান, ঠেলে নিয়ে চলে এল দরজার বাইরে।

'ওটা সিগন্যাল,' করিডর পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল বোরহান, সদর দরজা খুলে বলল, 'কেউ রে জোন ক্রস করেছে। তুমি বাঁ দিকের পথটা ধরো, আমি ডান দিকে যাচ্ছি।' রানার হাতে ছোট একটা অটোমেটিক গুঁজে দিল সে। 'রাখো এটা। বাধ্য না হলে ব্যবহার করো না। যেই হোক তাকে আমি জ্যান্ত ধরতে চাই।'

'কিন্তু কুকুরগুলো?' জানতে চাইল রানা।

'ভয়ের কিছু নেই,' দ্রুত আশ্বাস দিল বোরহান। 'গার্ডদের সাথে থাকবে ওরা, তাড়াতাড়ি করো।'

ছুটল বোরহান। বাড়ির কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সে, হারিয়ে গেল ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। চারদিকে ভাল করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রানাও ছুটল বাম দিক লক্ষ্য করে।

কে হতে পারে? অন্ধকারের ভেতর নিঃশব্দে এগোচ্ছে রানা। গভীর কালো ছায়াগুলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাচ্ছে, একটু শব্দের জন্যে সজাগ হয়ে আছে কান দুটো।

হেড কোয়ার্টারের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে বারবার সাবধান করে দিয়েছে ওয়াব খানকে ও। উঁহু, পুলিসের লোক হতে পারে না। কোন বন্দী পালিয়েছে? নিশ্চয়ই তাই।

রডোডেনড্রনের ঝোপ দেখতে পেয়ে কংক্রিটের পথ ছেড়ে ফাঁকা লনে পৌঁছুল রানা। মাঠটা পেরোবার সময় কুকুরগুলোর হাঁক-ডাক শুনতে পাচ্ছে। অনেক দূর থেকে আসছে আওয়াজ। গার্ডরা কি জানে সে আর বোরহান বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে? কুকুরগুলোকে না ছাড়লেই হয় এখন।

ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে রানা, হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গভীর মনোযোগের সাথে শোনার চেষ্টা করছে। এক সেকেণ্ড আগে সামনে একটা শব্দ হয়েছে। নাকি মনের ভুল? আবার পা বাড়াল ও, পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্যাঁৎ করে সরে গেল একটা ছায়া।

'হল্ট!' চাপা গলায় বলল রানা। 'তা নাহলে গুলি করছি।'

'রানা!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। গলার আওয়াজটা ওর সমস্ত অস্তিত্বে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। ফিসফিস করে বলল ও, 'রূপা!'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানার একটা হাত চেপে ধরল রূপা।

মুহূর্তের জন্যে শরীরটা কেঁপে উঠল রানার। 'সর্বনাশ করেছ!' নিচু গলায় বলল ও। 'তুমি এসেছ জানে ওরা। তোমাকে খুঁজছে। যেভাবে পারো এখুনি পালিয়ে যাও। কুইক!' রূপাকে মৃদু ঠেলা মারল ও।

কিন্তু রানার আরও কাছে সরে এল রূপা। রানার হাতটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'শোনো। রানা। সামনে মস্ত বিপদ তোমার। আমার না এসে উপায় ছিল না। শিবানী পালিয়েছে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। যে-কোন মুহূর্তে এখানে ফিরে আসতে পারে সে।'

রূপা কি বলছে তার তাৎপর্য ভাল করে বোঝার আগেই কার যেন ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল রানা।

'পালাও!' ফিসফিস করে বলল রানা, কিন্তু রূপা নড়ার সময় পেল না, ওদের কাছে ছুটে এল বোরহান।

এখন যদি রূপাকে পালাতে সাহায্য করে ও, লীডারের সাথে দেখা করার আশা ত্যাগ করতে হবে ওকে। এখন শুধু জাল গুটিয়ে আনার অপেক্ষা, সংগঠনের রুই-কাতলাসহ সবাইকে ডাঙায় তুলে আনার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, লীডারও রওনা হয়ে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে সে, এই অবস্থায় তা করতে পারে না রানা। কর্নেল আর ইন্সপেক্টরের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। কোন্ বুদ্ধিতে রূপাকে তারা এই ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলে দিল! কর্নেলকে বারবার বলেছে ও, লীডারকে ধরতে হলে কাউকে কাভার দেয়া সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

বোরহান যখন ওদের কাছে এসে থামল, রূপার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে রানা।

'আমার সামনে এসে পড়তেই ধরে ফেলেছি,' বলল ও। রূপার দিকে ফিরে তাকে একটু ঝাঁকি দিল। 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

টর্চের আলো ফেলল বোরহান রূপার মুখে। 'মুখ খোলো!' হিংস্র গলায় বলল সে। 'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ?'

'বাড়িটার ওপর আমার একটা আকর্ষণ আছে, তাই দেখতে এসেছিলাম, সহজ, শান্ত ভঙ্গিতে বলল রূপা। 'এভাবে তেড়ে আসা কি উচিত হয়েছে আপনাদের?' রানার দিকে দৃঢ় ভঙ্গিতে তাকাল সে। 'হাত ছাড়ুন! আমাকে আপনারা চোর ভেবেছেন নাকি?'

'ভেতরে ঢুকলে কিভাবে?' কঠোর সুরে জানতে চাইল বোরহান।

'পাঁচিল টপকে। আপনাদের এই বাড়িটা সম্পর্কে অনেক গুজব শুনে কৌতূহল হয় আমার, কিন্তু আপনারা কাউকে ঢুকতে দেন না বলে চুরি করে ঢুকেছি। ছাড়ুন, আমি চলে যাচ্ছি।'

'মিথ্যে কথা বলছে!' বলল বোরহান। 'শফির এজেন্ট ও। বাড়িতে নিয়ে এসো ওকে।'

'চলো,' বলল রানা, রূপার হাতে মৃদু একটু চাপ দিল ও। 'জোর খাটাবার চেষ্টা করো না, চেঁচিয়েও কোন লাভ নেই।'

কিন্তু শরীরটা ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইল রূপা। রানা তাকে ছাড়ল না।

'সাহায্য লাগবে?' এক পা এগিয়ে এল বোরহান।

'দরকার নেই,' বলল রানা। 'নিজের ইচ্ছেতেই আসবে ও।' রূপাকে টেনে নিয়ে আসছে ও বাড়ির দিকে।

'কি আশ্চর্য! এ কি ধরনের ব্যবহার আপনাদের?' প্রতিবাদের সুরে বলল রূপা। 'আমি তো শুধু বাড়িটা দেখার জন্যে এসেছিলাম…'

'দেখাবার জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি,' বলল বোরহান। 'গুপ্তের কামরায় নিয়ে চলো ওকে।'

এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না রানা। একবার মনে হচ্ছে রূপাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করাই ভাল, তারপর ভাবছে উঁহুঁ, সব আয়োজন শেষ করে তা আবার এলোমেলো করে দেবার কোন মানে হয় না। বোরহান ওদের কাছে হঠাৎ এসে পড়েই সব গোলমাল করে দিয়েছে, আরও কয়েক সেকেণ্ড সময় পেলে রূপাকে পালাতে দেবার সুযোগ পাওয়া যেত। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। হয় রূপা, না হয় অ্যাসাইনমেন্ট, যে-কোন একটাকে বেছে নিতে হবে তাকে। এবং শেষ মুহূর্তগুলো দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। এখনই সময়। এরপরে আর সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটাকে বিসর্জন দিতে সায় দিচ্ছে না মন।

রূপার হাত ধরে হলঘরে ঢুকল রানা। ঠিক পিছনেই রয়েছে বোরহান। করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। সমুদ্র গুপ্তের কামরায় ঢুকে রূপার হাত ছেড়ে দিল রানা। দরজা বন্ধ করে সেটায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল বোরহান।

'কে তুমি?' জানতে চাইল গুপ্ত, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মাংসল মুখটা, ঠোঁটের ফাঁকে বড় বড় হলুদ দাঁত দেখা যাচ্ছে। একটা ঢোক গিলল সে, ভয় পেয়েছে।

'আমার নাম রূপা। এই বাড়ির সামনের রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িতে থাকি

আমি,' শান্তভাবে বলল সে। 'এই বাড়িটা দেখার একটা কৌতূহল ছিল আমার, কিন্তু কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না বলে পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছি। কাজটা অন্যায় হয়েছে, সেজন্যে আমি দুঃখিত। ক্ষমা চাই। এবার যেতে দেবেন আমাকে?'

'শফির এজেন্ট তুমি, তাই না?' বলল বোরহান।

'শফি? আপনার কথা ধরতে পারছি না আমি,' বোরহানের দিকে ফিরে বলল রূপা। 'আপনাদের প্রাইভেসী নষ্ট করেছি আমি, কিন্তু এটা এমন একটা সামান্য ব্যাপার, তাই নিয়ে এত হাঙ্গামার দরকার করে না। আমি ডাকাত নই, কারও কোন ক্ষতিও আমি করতে আসিনি।'

বোরহানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রূপা, চোখের পাতা একটুও কাঁপল না তার, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। চেহারায় নিখাদ বিস্ময় আর বিহ্বল ভাব ফুটিয়ে তুলেছে রূপা। অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে বোরহান আর সমুদ্র গুপ্ত।

রানার দিকে তাকাল বোরহান। 'তুমি তো শফির বেশিরভাগ এজেন্টকে চেনো। আগে কখনও দেখেছ একে?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'আমি যতদূর জানি, শফির এজেন্ট নয় এ। তাদের সবাইকে আমি দেখেছি।'

স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করেছে সমুদ্র গুপ্ত। 'কিন্তু ও যে সত্যি কথা বলছে তার নিশ্চয়তা কি?' জানতে চাইল সে। 'অবশ্য, আশ পাশের লোকেরা আমাদের সম্পর্কে কৌতূহলী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বলল রূপা। 'সামান্য একটা ভুল করেছি, তার জন্যে ক্ষমাও চেয়েছি, তারপরও এত কথা কিসের? কি আশা করেন আপনারা, আপনাদের পায়ে ধরে মাপ চাইব?'

ওদেরকে রূপা বোকা বানাতে পারবে? ভাবছে রানা। বোরহান আর সমুদ্র গুপ্তের চেহারায় এখনও দ্বিধার ছাপ লেগে রয়েছে। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়ায়নি রূপারও। ঝাঁঝের সাথে আবার বলল ও, 'কি হলো? কিছু একটা বলুন। পাঁচিল টপকেছি বলে যদি পুলিসে দিতে চান আমাকে, সেটা হাস্যকর একটা ব্যাপার হবে। পুলিস এত ছোট ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। যাই হোক, যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার বা আটকে রাখার কোন অধিকার আপনাদের নেই।' কথা শেষ করে কারও অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না রূপা, পা বাড়াল দরজার দিকে।

উতরে যাচ্ছে রূপা, ভাবল রানা। বোরহান বা গুপ্ত, কেউই তাকে বাধা দিচ্ছে না। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রূপা। দরজার সামনে গিয়ে থামল। পিছন দিকে তাকাল না একবারও। নিঃশব্দে এক পাশে সরে গেল বোরহান। দরজা খুলল রূপা। দরজা খুলেই পিছিয়ে এল সে। পরিষ্কার শুনতে পেল রানা, অকস্মাৎ সশব্দে শ্বাস টানল রূপা।

দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিবানী। হাতে খাদেমের মাউজার। রূপাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে এসেছে রানার ওপর। ঠাণ্ডা হিম একটা ভয়ের স্রোত উঠে এল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে।

মুহূর্তের জন্যে কেউ নড়ল না বা কেউ কিছু বলল না। শিবানীর কালো শার্ট আর ট্রাউজারে কাদা লেগে রয়েছে। হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গেছে ট্রাউজারটা। অপরূপ সুন্দর মুখটা ঝুলে পড়েছে তার। কপালে আর নাকের পাশে রক্তের দাগ।

'পিছু হটো!' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল শিবানী, এগিয়ে এল এক পা। 'তোমাকে আমি চিনি। কর্নেল শফির ভাগ্নী তুমি।'

বুঝতে পারছে রানা, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আর হতে পারে না। ধীরে ধীরে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরছে ও। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে আছে শিবানী।

'বের করো হাত!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। 'মাথার ওপর তোলো! বেজন্মা শুয়োর! একটু নড়েছিস কি খুন করে ফেলব তোকে আমি!'

মাথার ওপর হাত তুলছে রানা, মুচকি হাসি দেখা যাচ্ছে ওর ঠোঁটে। 'চমৎকার!' বলল ও। 'কিন্তু এই হিংস্র ভঙ্গিটা শফিকে মারার সময় কোথায় ছিল জানতে পারি?'

'শফির ভাগ্নী?' সবিস্ময়ে বলল বোরহান। 'কি, বলছ কি তুমি?'

রানার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল শিবানী, 'ও তোমাদেরকে বোকা বানিয়েছে। এই মেয়েটার নাম রূপা। শফির ভাগ্নী ও। রানার সাথে একজোটে কাজ করছে। টিপুকে খুন করেছে রানা। নিজের চোখে দেখেছি আমি।'

বোরহানের দিকে তাকাল রানা, কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর কি আশা করতে পারো তুমি?' হাসছে ও। 'ভয় পেয়ে কেটে পড়েছিল, এখন মিথ্যে কথা বলে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি? শুয়োর!' চেঁচিয়ে উঠল শিবানী। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। বোরহানের দিকে তাকাল সে। 'ওর একটা কথাও সত্যি নয়। মেয়েটার সাথে কাজ করছে ও। ওর নাম রূপা, শফির আপন ভাগ্নী...'

স্তব্ধ হয়ে গেল শিবানী। মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেছে আর সবাইও। প্রথমে লোকটাকে দেখতে পায়নি রানা, কিন্তু মিষ্টি একটা সুগন্ধ ঢুকল নাকে। তারপরই দেখতে পেল তাকে দোরগোড়ায়।

ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, বয়স হবে পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন। গায়ের রঙটা ধবধবে ফর্সা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পরনে মখমলের ঢোলা শেরওয়ানী, মাথায় সাদা টুপি। কেউ কিছু বলার আগেই মুখ খুলল বিশিষ্ট রাজনীতিক গোলাম রসুল।

'আমি এসে তোমাদেরকে বিরক্ত করলাম না তো?' আশ্চর্য মার্জিত উচ্চারণে বলল সে। 'নেভার মাইণ্ড। তোমরা তোমাদের কাজ করো,' ঘরের ভেতরে ঢুকল সে, এগিয়ে যাচ্ছে ডেস্কের দিকে। 'আপাতত আমি একজন দর্শক। আমার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করো।'

উঠে দাঁড়িয়েছে সমুদ্র গুপ্ত। যন্ত্রচালিতের মত একপাশে সরে গেল সে। কামরার আর সবাই পাথর হয়ে গেছে, শুধু চোখগুলো জ্যান্ত সবার। ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে গেল লীডার। ধীরে ধীরে রিভলভিং চেয়ারটায় বসল। দেব সুলভ অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখটা। অদ্ভুত একটা নূরানী ভাব চেহারায়। চোখ দুটোয় গভীর মায়া, যেন সম্মোহিত করছে। চেয়ারে হেলান দিল সে। তারপর সরাসরি তাকাল রানার দিকে।

'আমাদের নতুন সদস্য, তাই না?' সহাস্যে বলল সে। 'অনেক প্রশংসা শুনেছি তোমার। সন্দেহ নেই, খুব দেখিয়েছ তুমি, রানা। কিন্তু তোমার সাথে পরে কথা বলব আমি।' বোরহানের দিকে তাকাল সে। 'খুব কঠিন সমস্যায় পড়েছ বলে মনে হচ্ছে?'

'না, হুজুর,' ভক্তি গদগদ ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি বলল বোরহান। 'সামান্য একটা ব্যাপার। আপনার দোয়ায় কোন সমস্যাই কঠিন নয় আমার কাছে। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাবে।'

'ভেরি গুড,' বলল গোলাম রসুল। 'আমি অপেক্ষা করছি।'

রূপার দিকে এগিয়ে এল বোরহান। খপ করে তার একটা হাত ধরে ঝাঁকি দিল। 'সত্যি?' চাপা গলায় হুংকার ছাড়ল সে। 'তুমি কর্নেল শফির ভাগ্নী?' লীডারের দিকে তাকাল বোরহান। 'পাঁচিল টপকে ঢুকেছে, হুজুর। শিবানী বলছে এ নাকি শফির ভাগ্নী। রানার সাথে একজোটে কাজ করছে। কিন্তু রানা অস্বীকার করছে।'

'আচ্ছা!' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল গোলাম রসুলের চোখে, কিন্তু আর কিছু বলল না সে।

'কি স্পর্ধা! হাত ছাড়ুন আমার!' তীব্র গলায় বলল রূপা। 'আপনাদের ব্যাপার কিছুই আমি বুঝছি না। কৌতূহল হয়েছিল, তাই পাঁচিল টপকে ফার্মটা দেখতে এসেছি, তার জন্যে আমাকে নিয়ে আপনারা এই রকম তুলকালাম কাণ্ড করবেন? আপনারা সবাই পাগল নাকি? ছাড়ুন, যেতে দিন আমাকে!'

'শফির ভাগ্নী ও?' ঝট করে রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল বোরহান।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'আমার কোন ধারণাই নেই। শফির একটা ভাগ্নী আছে বটে, কিন্তু তাকে আমি কখনও দেখিনি। এই রকম একটা বিপদে নিজের ভাগ্নীকে কেউ পাঠায় বলে মনে হয় না। আমার তো ধারণা নিজের গা বাঁচাবার জন্যে গোটা ব্যাপারটাকে জট পাকাচ্ছে শিবানী।'

'এখুনি জানা যাবে,' বলল বোরহান। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার চেহারা। 'ওকে আমি কথা বলাচ্ছি।'

রূপার হাতটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে পিছনে নিয়ে এল বোরহান, তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রূপা। 'বলো!' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল বোরহান। রূপার হাতটা পিঠের আরও একটু ওপরে তুলল সে। চেঁচিয়ে উঠল রূপা। 'বলো! শফির হয়ে কাজ করছ তুমি?'

'ছাড়ুন!' যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে রূপার চেহারা। হাতটা আরেকটু ওপরে তুললে ভেঙে যাবে। 'ছেড়ে দিন আমাকে!'

রানা নির্বিকার। বোরহানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর, অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে নিজেকে। শিবানী তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ওর ওপর, লক্ষ্য করেছে ও।

'জবাব দাও!' সিকি ইঞ্চি চাপ বাড়াল বোরহান রূপার হাতে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রূপার। বোরহানের গায়ের ওপর ঢলে পড়েছে সে।

'সাবধান,' উদ্বেগের সাথে বলল গুপ্ত. 'ও যদি সত্যি শফির ভাগ্নী না হয়ে

থাকে…'

'দাঁড়াও,' বলল রানা। 'আমাকে কথা বলতে দাও ওর সাথে।'

'বলো,' চাপ কমাল বোরহান, কিন্তু হাতটা ছাড়ল না। 'কথার জবাব না দিলে আমি ওর হাত ভেঙে ফেলব।'

রূপার ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। 'তুমি যদি সত্যি শফির এজেন্ট হয়ে থাকো, স্বীকার করো কথাটা। তা নাহলে বোরহান তোমার হাত ভেঙে ফেলবে। ঠাট্টা করছে না।' রূপার চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। বোঝাতে চাইছে ধোঁকা দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল রূপা। কিন্তু হঠাৎ আবার বোরহান তার হাতে চাপ বাড়াতেই হাঁসফাঁস করে উঠে বলল, 'হ্যাঁ…কর্নেল শফির হয়ে কাজ করছি আমি।'

রূপাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল বোরহান।

থরথর করে কেঁপে ওঠার সাথে সোঁ সোঁ করে খানিকটা বাতাস গিলল সমুদ্র গুপ্ত। 'আমাদের এই আস্তানার কথা তাহলে জানে ওরা!' বলল সে।

'প্রথম থেকেই সব জানে!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল শিবানী। 'তোমরা কি এতই বোকা যে কিছুই বুঝতে পারছ না? রানা বেঈমানী করেছে! শফি মারা যায়নি। থানা থেকে আমার পালাবার খবরটা রানাকে দিতে এসেছে রূপা।'

'মিথ্যে কথা বলছে ও!' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'এই মেয়েকে এর আগে কখনও দেখিনি আমি। শফি মারা গেছে।' লীডারের দিকে ফিরল ও। 'সংগঠনে বিদেশী মানুষ ঢুকিয়ে ভুল করেছেন আপনি, স্যার। দায়িত্বজ্ঞান বলে কিছু নেই এদের। নিজের দোষ ঢাকার জন্যে…'

ওপর-নিচে মাথা দোলাচ্ছে গোলাম রসুল, যেন সমর্থন করছে রানাকে। হাসছে সে।

রানাকে বাধা দিয়ে বোরহান বলল, 'শিবানী, তুমি সব জেনে একথা বলছ?'

'নিশ্চয়ই,' দৃঢ় গলায় বলল শিবানী। 'শফি মারা যায়নি। নিজের চোখে দেখেছি আমি রানা গুলি করেছে টিপুকে। শফি আগে থেকে খবর পেয়ে তৈরি হয়ে ছিল। সে-ই আগে গুলি করেছে সগীরকে।' রূপাকে দেখিয়ে বলল, 'রানাকে চেনে ও। আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে, সব কথা স্বীকার করাচ্ছি। দু'মিনিটও লাগবে না আমার।'

এগিয়ে এসে আবার রূপার হাত ধরে মোচড় দিল বোরহান। 'ওকে তুমি চেনো?'

ব্যথায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল রূপার। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে সে। 'না।'

'আমরা বাজে সময় নষ্ট করছি,' কাঁপা গলায় বলল সমুদ্র গুপ্ত। 'আমরা এখানে আছি, পুলিস জানে। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ওরা!'

'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না পুলিস,' জলদগম্ভীর গলায় বলল লীডার। 'আসতে দাও ওদেরকে। সিগন্যাল পেলেই পাইপ খুলে দিয়ে বেসমেন্টের সেলগুলো পানিতে ভরে দিতে হবে। বন্দীদের খোঁজ যেন না পায় ওরা।

কাগজপত্রগুলো কোথায় সরাতে হবে তা তো তোমাদের জানাই আছে। দরকার মনে করলে শিবানীকে লুকিয়ে ফেলো। পুলিস খুঁজে পাবে না এমন জায়গার অভাব নেই এখানে। আসতে দাও ওদেরকে।'

রানার দিকে ফিরল বোরহান। রূপাকে ছেড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সে। তার চোখে খুনের নেশা দেখে শিউরে উঠল রানা। 'তুমি বলছ শিবানী মিথ্যে কথা বলছে,' বলল বোরহান। 'কিন্তু যদি প্রমাণ হয় রূপা তোমাকে চেনে তাহলে আমি ধরে নেব তুমিও শফির লোক। রূপা যদি তোমাকে না চেনে, ধরে নেব শিবানী মিথ্যে কথা বলছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ওকে আমি চিনি না,' বলল ও। 'শিবানী আমাকে ঘৃণা করে, তাই বিপদে ফেলতে চাইছে। ওর কথায় কান দিয়ে নিজেদেরকে হাস্যকর করে তুলছ তোমরা।'

রানার পকেটে হাত ভরে দিল বোরহান। অটোমেটিকটা বের করে নিল সে। পিছিয়ে গেল দু'পা। 'যতক্ষণ না আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি, আমার কাছে থাকুক এটা।' রানাকে পাশ কাটিয়ে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল সে। 'এখন দেখব কিভাবে কথা না বলে থাকে রূপা!' ডেস্কের সামনে থেমে একটা সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। কলিংবেলের একটা বোতামে চাপ দিয়ে ফিরল রানার দিকে। 'টেস্টটা হবে পানির মত সহজ। একমিনিটও লাগবে না। ইলেকট্রিক কাঁকড়ার সাথে নিশ্চয়ই পরিচয় আছে তোমার? আমার কাঁকড়াগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, হাড় পর্যন্ত কেটে ফেলে। রূপা যদি তোমার পরিচয় বলতে না পারে, আমি সন্তুষ্ট হব।'

'তোমাকে তো বলবেই!' অনুনয়ের সুরে আবেদন জানাল শিবানী। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও!'

'শাট আপ!' শিবানীর দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল বোরহান।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নঈম।

'এই মেয়েটাকে টরচার রূমে নিয়ে যাও,' হুকুম করল বোরহান। 'বেসমেন্টে যাবার পথে আর কাউকে ডেকে নাও। একে চেয়ারে বেঁধে রেখে এক সেট ইলেকট্রিক কাঁকড়া বের করে রাখো। আমরা আসছি।'

'না!' নঈমকে এগিয়ে আসতে দেখে দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ জানাল রূপা। 'খবরদার! আমার গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না।'

হাতটা বিদ্যুৎগতিতে লম্বা করে দিয়ে রূপার মাথার চুল মুঠো করে ধরে ফেলল বোরহান। ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল রূপা, বোরহান তাকে চুলের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে। 'শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল বোরহান, 'রানাকে চেনো? রানা শফির লোক?'

'জানি না!' বলল রূপা। বোরহানের হাতে ধরা চুলের ওপর প্রায় গোটা শরীরটা ঝুলছে ওর। অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে ও, মনে হচ্ছে চুলের সাথে উঠে আসছে খুলির ওপরের চামড়া। 'ওকে আমি চিনি না!'

'নঈম!' হুংকার ছাড়ল বোরহান। 'নিয়ে যাও একে।'

আবার এগিয়ে এল নঈম।

'দাঁড়াও,' বলল রানা। বুঝতে পারছে, রূপাকে এখান থেকে একবার নিয়ে যাওয়া হলে আর হয়তো তাকে দেখতে পাবে না ও। কিভাবে টরচার করতে হয় জানে বোরহান, নিজের অজান্তে মুখ খুলবে রূপা। আর মুখ খুললে বোরহান তাকে ওখানেই খুন করবে। তারপর ফিরে আসবে ওর ব্যবস্থা করার জন্যে। কিংবা বোরহান হয়তো ওকেও সাথে করে নিয়ে যাবে টরচার রূমে। কিন্তু পালের গোদাকে এখানে রেখে কোথাও যেতে চায় না ও। এটাই সম্ভবত নাটকের শেষ দৃশ্য, তাই মঞ্চ ছেড়ে যাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

কিন্তু রানার কথায় কান না দিয়ে রূপাকে টেনে হিঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে নঈম।

হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রূপা। 'ছাড়ো! ছেড়ে দাও আমাকে! বলছি ওকে আমি চিনি না...'

'দাঁড়াও,' দরাজ গলায় বলল গোলাম রসুল। 'আমাদের নতুন সদস্য মাসুদ রানা সম্ভবত কিছু একটা বলতে চায়। ওর কথা শুনলে হত না, বোরহান?'

ঝট করে রানার দিকে ফিরল বোরহান। 'কি বলার আছে তোমার?'

নঈমের দিকে তাকাল রানা। 'ছেড়ে দাও ওকে।'

'মানে?' জানতে চাইল বোরহান। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে সে রানার দিকে।

বোরহানের দিকে ফিরল রানা। 'নঈমকে বলো রূপাকে ছেড়ে দিক। কোথাও নিয়ে যাবার দরকার নেই ওকে।' জোর করে একটু হাসল সে। 'অবশ্যই রূপা চেনে আমাকে। প্রথম থেকেই আমি কর্নেল শফির লোক। শিবানীর কথাই সত্যি। তোমাদেরকে আমি বোকা বানিয়েছি।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বোরহান।

হো হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল লীডার। যেমন হঠাৎ শুরু করল সে, তেমনি হঠাৎ থামল।

'এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি,' জলদগম্ভীর গলায় বলল গোলাম রসুল। 'তোমার আসল পরিচয় জানার পরপরই ফোন করি এখানে আমি, রানা। দেখছিলাম এতক্ষণ, বোরহানের জেরার মুখে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারো তুমি।' হাসল লীডার। 'পরিচয়টা সম্পূর্ণ করো—আসলে তুমি কে?'

'গোলাম রসুল,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা, 'তোমাকে আপনি বলে সম্বোধন করতে ঘৃণা হচ্ছে আমার। আমার পরিচয়? বলছ জানো, তাহলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'তুমি শালা আমাকে বোকা বানিয়েছ?' এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরে ছিল বোরহান, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বাঘের মত গর্জন ছাড়ল সে।

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'তুমি নিশ্চয়ই আশা করো না তোমাদের মত একদল ফ্যানাটিক আর ক্রিমিনালের খাতায় নাম লেখাব আমি? দুঃখ এই যে রূপা বোকার মত এখানে এসে সব ভণ্ডুল করে দিল। তা নাহলে আর দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাদের সবাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে পারতাম। তাতে কিছু এসে

যায় না অবশ্য। ভাগ্য এখন তোমাদেরকে ফেভার করছে, কিন্তু খুব বেশি দিনের জন্যে নয়।'

'শালা বেঈমান!' বিদ্যুৎগতিতে প্রচণ্ড এক চড় তুলল বোরহান।

দশ

বোরহানের কব্জি ধরে ফেলল রানা। প্রচণ্ড এক মোচড় দিতেই ঘুরে গেল শরীরটা। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত তার শিরদাঁড়ায় গুঁতো মারল রানার ভাঁজ করা একটা হাঁটু। ছিটকে পড়ল সে শিবানীর দিকে।

রানাকে বোরহানের কব্জি ধরে ফেলতে দেখেই গুলি করেছে শিবানী। সোজা রানার দিকে ছুটে এল বুলেটটা, কিন্তু মাঝপথে সেটাকে দুই ভুরুর মাঝখানে বরণ করল বোরহান। থমকে গেল বোরহান বুলেটের ধাক্কায়, তারপর সটান পড়ে গেল শিবানীর ওপর। এরই মধ্যে মারা গেছে সে, লাশটা গায়ে নিয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল শিবানী।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল, হতভম্ব নঈমের পা যেন আটকে গেছে মেঝের সাথে। সুযোগটা নিয়ে শিবানীর দিকে লাফ দিল রানা। পড়ে যাওয়া মাউজারটা কুড়িয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে শিবানী, ধরেও ফেলেছে সেটাকে, বিদ্যুৎবেগে তার কব্জির ওপর নেমে এল রানার একটা পা। মট্ করে ভেঙে গেল কব্জিটা, পরমুহূর্তে তার মাথার মাঝখানে ভাঁজ করা হাতের কনুই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল রানা। সাথে সাথে জ্ঞান হারাল শিবানী। স্যাঁৎ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, দেখল খেপা ষাঁড়ের মত তার দিকে ছুটে আসছে নঈম। ভয়ঙ্কর একটা ঘুষি আসছে দেখে মাথা নিচু করে নিয়ে নঈমের বুকের সাথে সেঁটে গেল রানা, সিধে হলো, ধাঁই করে বসিয়ে দিল তার চিবুকে প্রচণ্ড এক আপার কাট। যেন বিস্ফোরণের ধাক্কা খেয়েছে নঈম, ছিটকে প্রায় উড়ন্ত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল সে। সেখান থেকে মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

'রানা!'

লীডারের দিকে ফিরতে যাবে রানা, চমকে উঠল রূপার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল পিঠে, একই সাথে শুনতে পেল রিভলভারের বিস্ফোরণ। গুপ্ত রানার দিকে গুলি করছে দেখে রানার ওপর ডাইভ দিয়ে পড়েছে রূপা।

ধাক্কা খেয়ে গুপ্তের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। রিভলভারের নলটা রানার মাথার দিকে নামিয়ে আনছে গুপ্ত, তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। ধপ্ করে বসে পড়ল গুপ্ত, তার হাত থেকে ছোঁ মেরে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে এক গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেস্কের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। খালি রিভলভিং চেয়ারটা দুলছে। কামরার কোথাও দেখা যাচ্ছে না গোলাম রসুলকে।

ঠিক এমনি সময়ে বাইরে কট-কট কট-কট শব্দে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। কাছেই স্কিড করে থামল গাড়ি।

শিবানীর মাউজারটা তুলে নিয়েছে রূপা, সেটা দিয়ে সমুদ্র গুপ্তকে কাভার দিচ্ছে সে। 'ওদিকে!' ডেস্কের পিছনের একটা খোলা দরজা দেখিয়ে চিৎকার করে বলল সে, 'বেশি দূর যেতে পারেনি গোলাম রসুল।'

খোলা দরজা দিয়ে রকেটের বেগে বেরিয়ে এল রানা। মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল যেন কার সাথে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তাল সামলাল দু'জনেই। চিনতে পেরে বলল রানা, 'পথ ছাড়ুন! লীডার...'

'ধরা পড়েছে, মি. রানা,' হাঁপাচ্ছে তোয়াব খান। 'মিস রূপা কোথায়? তার ফোন পেয়েই রওনা হয়ে গেছি আমরা, দেরি করে ফেলিনি তো?'

করিডর ধরে ছুটে আসছে কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস অফিসার। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল।

পথ ছেড়ে দিয়ে খোলা দরজাটা তাদেরকে দেখিয়ে দিল রানা। গতি মন্থর না করে সমুদ্র গুপ্তের কামরায় ঢুকে গেল তারা।

'ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাবার আরও অনেক পথ আছে,' বলল রানা। 'এখানে যারা কাজ করে, বিশেষ করে যত বিদেশী আছে তারা প্রায় সবাই...'

'গোটা ফার্ম ঘিরে ফেলা হয়েছে, মিস্টার রানা,' সহাস্যে বলল তোয়াব খান। 'একটা পিঁপড়ে গলবার উপায় নেই। কর্নেলের নির্দেশ, চারপায়ে হাঁটে যারা তাদেরকে বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে অ্যারেস্ট করতে হবে। পিছন দিক থেকে ঢুকেছি আমরা। এতক্ষণে আমার লোকেরা সামনের দরজা দিয়েও ঢুকতে শুরু করেছে।'

'শ্যেন কাপালাকে বাগানে কোথাও পাওয়া যাবে,' বলল রানা। 'আর বন্দীরা আছে বেসমেন্টে।'

'আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কর্নেলের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে। কেমন আছেন তিনি?'

'শেষ দেখে এসেছি নিজের স্টাডিরূমে, নার্সের সাথে তর্ক করছেন,' হাসল তোয়াব খান। 'দেখে মনে হলো, নার্সকেই পরাজয় স্বীকার করতে হবে, শোবেন না তিনি।'

কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রূপা। 'ইন্সপেক্টর, কর্নেল কেমন আছেন?'

একগাল হাসল তোয়াব খান। 'ভাল আছেন...'

'লীডার ধরা পড়েছে, তাই না? কোথায় সে?'

গম্ভীর হলো ইন্সপেক্টর। বলল, 'থানার পথে গাড়িতে রয়েছে সে।'

মাথা ঝাঁকাল রূপা। 'এখানে আমার আর কোন কাজ নেই, কর্নেলের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমি। আপনি, মি. রানা?'

'আপনাদের দু'জনের জন্যেই গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি,' বলল

তোয়াব খান। 'কর্নেল আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে বলে দিয়েছেন, এখানের কাজ শেষ হলেই আপনারা যেন তাঁর সাথে দেখা করেন।'

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর রূপা।

গোলাপ কুঁড়ি লেন থেকে বাঁক নিয়ে শশীভূষণ লেনে ঢুকল পুলিস কারটা। কর্নেল শফিকুর রহমানের বাড়ির সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটল রূপা। কিন্তু রানা নামল ধীরে সুস্থে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে একটা সিগারেট ধরাল।

ওপর তলার স্টাডিতে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে আছেন কর্নেল, নাগালের মধ্যে ধূমায়িত কফির কাপ, হাতে জ্বলন্ত চুরুট। একটা হাত ঝুলছে গলায় বাঁধা স্লিঙে। আর্ম চেয়ারের হাতলে বসে রয়েছে রূপা, রানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'এসো, রানা,' উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। 'তোমার জন্যে রাত জেগে বসে আছি আমি। রূপা বলছিল, তুমি নাকি ওকে যমের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রানা। 'লীডারের শেষ খবর কি?'

'পুলিসের ইন্টারোগেশনের সামনে ঝেড়ে গান গাইছে,' বললেন কর্নেল। 'ওয়েল ডান, মাই বয়। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি আমার সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছ। প্রশংসা করছি না, তুমি ছাড়া আর কারও পক্ষে এত তাড়াতাড়ি এই রকম একটা সংগঠনের জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা সম্ভব হত না। শুনলাম, তুমি নাকি রূপাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছিলে। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা, প্রশংসা শুনতে কোনদিনই ভাল লাগে না ওর। 'রূপা আপনাকে বাড়িয়ে বলেছে। আপনি আহত হয়েছেন সেজন্যে আমি দুঃখিত। শিরানী যে আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি করবে তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

'তুমি আমাকে সতর্ক করে দেবার পরও আমি গুলি খেলাম, আমার জন্যে ব্যাপারটা লজ্জাস্কর। দু'এক হপ্তার জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে, এই আর কি।' হাত বাড়িয়ে কফির পটটা দেখিয়ে বললেন, 'কফি নাও না!' নিজের ধূমায়িত পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন তিনি। তাকিয়ে আছেন রানার চোখের দিকে। 'তোমাকে আমার দরকার, রানা। কাজ চালিয়ে নেয়া যায় এমন লোক প্রচুর আছে আমার, কিন্তু সত্যিকার প্রতিভার কিন্তু বড় অভাব। তোমার বেতন, খরচপাতি, স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমার ঠিক নিচের পদটা খালি রয়েছে, সেটা আমি পূরণ করতে চাই। তুমি কি বলো?'

'প্রস্তাবটা তো ভালই,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার অন্য রকম প্ল্যান রয়েছে, কর্নেল। তাছাড়া, চাকরি করার ধাত নয় আমার। বাঁধাধরা জীবন আমার পোষাবে না। দুঃখিত, কর্নেল। তাছাড়া, আপনি তো জানেন, সরকারকে পছন্দ করার খুব

একটা জোরাল তাগিদ বোধ করি না আমি। বিশেষ করে রানা এজেন্সী বন্ধ করে দেয়ার পর…'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর কাজ এটা,' বিশেষ আশা নেই বুঝতে পেরেও হাল ছাড়ছেন না কর্নেল। 'তাছাড়া, জীবনে স্থিতিশীলতারও দরকার আছে, রানা। বিয়ে-থা করার কথা ভাবছ না কেন?'

'আমি? বিয়ে?' আঁতকে উঠল রানা। 'অসম্ভব, কর্নেল। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে যে বিয়ে করবে তার জীবনে দুঃখের আর সীমা থাকবে না।'

'তা নির্ভর করে মেয়েটার ওপর,' বললেন কর্নেল। 'আমার ভাগ্নী, রূপা…'

এবার সত্যি ভয় পেয়ে গেল রানা। 'আপনার ভাগ্নীর অনুমতি না নিয়ে এসব বিষয়ে আমার সাথে আপনার আলাপ করা উচিত হচ্ছে না, কর্নেল। তাঁর কানে এসব কথা গেলে আপনাকে তো কিছু বলতে পারবেন না, আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বেন।'

'আমি যা বলব তার ওপর কথা বলার মেয়ে…' শুরু করলেন কর্নেল।

হাত নেড়ে আপত্তি প্রকাশ করল রানা, বলল, 'উঁহুঁ, এসব আমি শুনতে পর্যন্ত চাই না। প্লীজ!'

রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল। বুঝতে পারলেন, বৃথা চেষ্টা করছেন তিনি। মৃদু হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'তোমার ইচ্ছের ওপর জোর নেই। কিন্তু তবু আমি বলব, ছন্নছাড়ার মত ঘুরে না বেড়িয়ে এবার একটু ঘরমুখো হও। উপদেশ নয়, এটা আমার অনুরোধ। দেশের একটা তরুণ প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাক তা আমি চাই না।'

হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন কর্নেল।

ইন্সপেক্টর তোয়াব খানের ফোন। মাঝেমধ্যে হুঁ হাঁ করছেন কর্নেল, বেশিরভাগ সময় নিঃশব্দে শুনলেন। মিনিট দুই পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'ড. সমুদ্র গুপ্ত খুব সাহায্য করছে,' রানাকে বললেন কর্নেল। 'কয়েকজন পাতি নেতার নাম বলেছে সে, এরাও নাকি সংগঠনের সাথে জড়িত। এরই মধ্যে মোট একশো বাহান্ন জনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিস, আরও পঞ্চাশ জনকে অ্যারেস্ট করার আশায় আছে। অন্যান্য জেলায় সংগঠনের শাখা আছে, সেগুলোর ঠিকানা, স্থানীয় কর্মকর্তাদের নাম ইত্যাদি আদায় করা গেছে গুপ্তের কাছ থেকে। সব জায়গায় খবর পাঠানো হচ্ছে অয়্যারলেসে।'

'তার মানে এদের বংশ ধ্বংস করা গেছে।'

'তা কখনও যায় না, রানা,' ম্লান হেসে বললেন কর্নেল। 'কোথাও না কোথাও একটু বীজ থেকেই যায়, আবার তা থেকে চারা গজায়। বলতে পারো কিছুদিনের জন্যে ধ্বংস হলো। আবার এরা মাথা চাড়া দেবে।'

'তখন যদি আবার দরকার পড়ে আমাকে,' বলল রানা। 'তোয়াব খানকে দিয়ে খবর পাঠাবেন, আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করব।'

'ধন্যবাদ,' বললেন কর্নেল। 'কথাটা মনে থাকবে আমার।

'আর কোনও খবর দেয়নি তোয়াব খান?' জানতে চাইল রানা

'দিয়েছে,' বললেন কর্নেল। 'শর্মিলী ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে। সেক্রেটারিকে খুন করার কথা স্বীকার গেছে সে। তার মানে পুলিস আর তোমাকে খুঁজবে না।'

'গুড,' বলল রানা। 'আফরোজার খবর কি?'

'তাকে আমরা ছেড়ে দেব। তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। নাকি আছে?'

'নেই,' বলল রানা। 'সংগঠনের ব্যাপারে তেমন কিছু জানত না সে। জড়িতও ছিল না।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার আমাকে যেতে হয়। যাবার আগে আরেকটা কথা। আমার বাকি অর্ধেক পেমেন্ট?'

হাসলেন কর্নেল। 'তোমার ঠিকানা তো জানাই আছে রূপার,' বললেন তিনি, 'কাল কোন এক সময় চেকটা দিয়ে আসবে তোমাকে ও। ঠিক আছে?'

'কাল কখন জানতে পারলে ভাল হয়,' বলল রানা।

'এই ধরো সন্ধ্যায়।'

'আমি তখন বাড়িতে থাকব না।'

'কোথায় থাকবে বলো।'

'ঠিক নেই,' বলল রানা।

হঠাৎ হাসলেন কর্নেল। 'ঠিক আছে, সেটা কোন সমস্যা নয়,' বললেন তিনি। 'রূপা তোমাকে খুঁজে বের করে নেবে।'

'ঠিক আছে, খোদা হাফেজ,' বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। বেরিয়ে আসছে কামরা থেকে।

'আবার দেখা হবে,' পিছন থেকে বললেন কর্নেল শফিকুর রহমান।

মগবাজার। অভিজাত এক রেস্তোরাঁ। সন্ধ্যা লেগেছে মাত্র।

গ্লাসের সাথে বোতলের মৃদু ঠোকাঠুকি। চাপা গুঞ্জন। হঠাৎ একটু জোরে, ওহ্ ডিয়ার,' 'ফর গডস্ সেক,' বা 'যাহ দুষ্টু'। চুড়ির টুংটাং। শিফনের কোমল খসখস। রিনিঝিনি হাসি। খুট্ করে লাইটার জ্বালার শব্দ। সিগারেটের ধোঁয়া। বয়-বেয়ারাদের দ্রুত পদচারণা। গিটারের সুরের তালে তাল মিলিয়ে টেবিলে আঙুল ঠুকে কে যেন তবলা বাজাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল সে।

ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। খুলে গেছে দরজা।

দৃঢ় পায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল এক যুবক। সুদর্শন, সুপুরুষ। দেখলেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড শক্তি রাখে গায়ে। ধীরে ধীরে উঠে এসে কোমরে ঠেকল আস্তিন গুটানো দুই হাত। চোখে তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী, সতর্ক দৃষ্টি।

ঢাকার কুখ্যাত এক গুণ্ডা। এই এলাকার নতুন মস্তান।

ডিউক।

***

মাসুদ রানা

বিষ নিঃশ্বাস

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রানা এজেন্সী, সরকারী আদেশ। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার গুণ্ডা মহলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে নতুন এক মস্তান—ডিউক। কে সে?
কোত্থেকে জুটল এসে?
তারই সাহায্য চাইছেন কেন এন.এস.আই-চীফ কর্নেল (অব.) শফিকুর রহমান? বাংলাদেশের সর্বনাশ চায় একদল রাজনৈতিক সন্ত্রাসী, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, পরিণত করতে চায় দেউলিয়া রাষ্ট্রে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ওদের বিষ নিঃশ্বাসে। ওদিকে খুনের দায়ে জড়িয়ে গেছে রানা। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে পুলিস। শত্রুশিবিরে আশ্রয় নিল ও। কর্নেল শফিককে মারার ভার চাপানো হলো ওর ওপর। পরিচয় হলো আশ্চর্য এক নির্লজ্জ সিঙ্গাপুরী যুবতীর সঙ্গে। শিবানী ওর নাম।
যেমন সুন্দরী, তেমনি ভয়ঙ্কর।
দেখা যাক কী হয়।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০